

মধুরে মধুর

*　　*　　*

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

*　　*　　*

এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং (প্রাইভেট) লিঃ



প্রকাশক
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ : শ্রাবণ, ১৩৬৫
মূল্য টা. ৫'৫০ ন. প. (পাঁচ টাকা পঞ্চাশ ন. প.) মাত্র

প্রচ্ছদপট : সূর্য রায়

মুদ্রাকর
শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯

'যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি,
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা'—

নিবেদন

শারদীয়া 'সুন্দরম্' (১৩৬৪) সংখ্যায় 'রাস' নামে যে গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল, 'মধুরে মধুর' তারই উপন্যাস রূপ। বক্তব্যের পক্ষে গল্পটির পরিসর ছিল সীমিত। সেইজন্যই এই উপন্যাস রচনার দায়িত্ব অনুভব করি।

অতৃপ্তি-বোধই সকল শিল্পীর প্রেরণার উৎস। যে সব সাংস্কৃতিক কর্মী বাধাবন্ধ ঠেলে শিল্প সৃজনের চেষ্টা করছেন, তাঁদের সেই মহান্ পিপাসা-ই এই উপন্যাসের উপজীব্য। প্রকাশক শ্রীঅমিয় মুখোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য
৩২এ পদ্মপুকুর রোড
কলিকাতা-২০

১

প্রভাতের মধুকুঞ্জ, বসন্তের মধুচক্রের মতোই কর্ম-কোলাহলে গুঞ্জরিত। নাম মধুকুঞ্জ। আসলে কিন্তু আশ্রম। আশ্রমের অধিকর্তা হলেন কণ্ঠমণি বড়ঠাকুর। তিনি বলেন—কালাঠাকুর ও রাইকিশোরীর আশ্রম। আমি তাঁদের সেবায়েত মাত্র।

কথার অনেকটা সত্যি। আবার সত্যি নয়-ও। কেননা মধুকুঞ্জ আর যা-ই হোক সন্ন্যাসীর আশ্রম নয়। নৃত্যগুরু কণ্ঠমণি বড়ঠাকুর যতদিন রাজপরিবারের সঙ্গে ছিলেন, পাটরানী মুক্তেশ্বরীর তাঁর প্রতি ভক্তির শেষ ছিল না। সে ভক্তির বহিঃপ্রকাশে হয় তো বাড়াবাড়ি ছিল। তবু কথা বলবার সাহস ছিলনা কারো। আসামের সুপ্রাচীন এক রাজবংশের শেষ ঐতিহ্যের বাহক মুক্তেশ্বরীর পতিকুল। মুষ্টিমেয় প্রজাবর্গের ওপর সেদিনও তাঁদের দোর্দণ্ড-প্রতাপ, অব্যাহত শাসন। মুক্তেশ্বরী কণ্ঠমণিকে গুরুদক্ষিণা দিলেন স্ত্রী-ধন উজাড় করে। তাঁরই আনুকূল্যে নির্মিত হলো মধুকুঞ্জ। মণিপুরের উপান্তে এক সুন্দর আশ্রম। কণ্ঠমণি বড়ঠাকুরের শিষ্য-শিষ্যারা এলো দূর-দূরান্ত থেকে।

সদর আর অন্দর। মধুকুঞ্জ দুই মহলে ভাগ করা।

ছেঁচা বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা সুপ্রশস্ত আঙিনার দুই পাশে দু'খানি চালাঘর। একটিতে থাকে শিক্ষার্থী ছেলেরা। অপরটিতে থাকেন কণ্ঠমণির ছোটভাই নীলমণি। মাঝখানের বৃহৎ ঘরটিতে তাঁত চলে। রংবেরঙের মেখলা, রিয়া ও উত্তরী বোনে মেয়েরা। অন্দরের আঙিনার একপাশে মেয়েদের ঘর। একপাশে রান্নাঘর। শেষের বৃহৎ ঘরখানি একাধারে কালাঠাকুরের মন্দির ও কণ্ঠমণির

বাসস্থান। তারও পিছনে সুবৃহৎ বাগান। দুইপাশে দুটি পুকুর। বাগানের শেষপ্রান্তে একটি নিরালা ছোট ঘর।

প্রত্যহের মন্ত্রোচ্চারের মতো মধুকুঞ্জের জীবন প্রবাহ সুসম সুছন্দ অভ্যস্ত গতিতে চলে। ষাট বছর বয়স হয়েছে কণ্ঠমণির। নাতিক্ষুদ্র গৌরবর্ণ ছিপছিপে শরীরে আজও বার্ধক্যের কোন রেখা পড়েনি। শুচিশুভ্র চেহারা। পরিধানে থান ধুতি। গায়ে উত্তরীয়। পায়ে হরিণের চামড়ার চটি। মাথার চুল খাটো, তবু সুবিন্যস্ত। দেখলে মনে হয় সুন্দর ও পরিচ্ছন্ন থাকবার কোন মন্ত্র তাঁর জানা আছে। তাঁর চলা, বলা, হাঁটা সবই সুসম, কিছুটা মন্থর। কথা বলবার ভঙ্গীও আতিশয্য-বর্জিত। বয়সের রেখাচিহ্ন যা একটু পড়েছে তা একমাত্র মুখেই। ছোট ছোট বুদ্ধিদীপ্ত দুটি সন্ধানী চোখ সব সময় আহরণে ব্যস্ত। কি যেন দেখছে, কি যেন শুনছে।

আসল মানুষটির চরিত্রের কিছুটা আভাস পাওয়া যায় তাতে। ক্ষুরধার হলেও ক্ষমাশীল সেই দৃষ্টি। দৃঢ়তার আভাসও তাতে আছে। মাঝে মাঝে জ্বলে ওঠে প্রয়োজনে। কণ্ঠমণিকে তাই ভয়ও করে সকলে। মধুকুঞ্জে শৃঙ্খল নেই কোনো, কিন্তু শৃঙ্খলা সর্বত্র।

প্রভাতে কণ্ঠমণি জপজাপ-পূজায় ব্যস্ত থাকেন। বিনোদিনী, সুনলিনী, শচী—তিনটি মণিপুরী মেয়ে তাঁকে সাহায্য করে। নাট-ঘরে যেতে বেলা বাজে আটটা। তখন খোলন্দাজ শ্যাম ও মথুর জোড়া খোল নিয়ে বসে। ছেলে-মেয়েরা উপস্থিত। নীলমণি-ই শেখান। তবে পরিচালনা করেন স্বয়ং কণ্ঠমণি। বজ্রাসনে বোঁজা চোখ খুলে গেলেই বুঝতে হবে ফিরে ফিরতি শুরু করতে হবে নাচ।

দুপুরে আহার বিশ্রাম বিরতি। সান্ধ্য আরতির পর পুনর্বার শুরু হয় নাচের মহড়া।

বিদ্যা উপযুক্ত পাত্রে দান করবার বস্তু। বিক্রী করবার নয়। এই সব ধারণা ছিল কণ্ঠমণির। কিন্তু দল নিয়ে কলকাতা ও বোম্বাই

ঘুরে আসবার পর তাঁকে সে ধারণা আপাততঃ পরিহার করতে হয়েছে। তাঁর শিষ্য-শিষ্যাদের মধ্যে অনেকেই বহিরাগত।

নাচ শিখতে আসে যারা, তারা অনেকেই বিত্তবান। টাকা খরচ করবার সঙ্গে বিদ্যা আয়ত্ত করবার কোন যোগাযোগই যে নেই, তা বুঝতে চায় না সবাই। অনেকেই চায়, তিনমাসে কয়েকটা বোল আয়ত্ত করে মণিপুরী নাচের পোশাক খরিদ করে নিয়ে চলে যাবে। এই ব্যবসাদারী কেনা-বেচার পদ্ধতিতে বিশ্বাসী নন কণ্ঠমণি। তাঁর ভাই নীলমণি রাগ করেন। অনেক তর্ক-বিতর্ক তোলেন। কণ্ঠমণি মৃদু হেসে চুপ করে থাকেন। বলেন—গুরু মিলে লাখে লাখ শিষ্য মিলে এক। দিবার লোক আছে তো নিবার লোক নাই। যার মধ্যে প্রকৃত আগ্রহ আছে, তাকে কিছুতেই নিবৃত্ত করা যাবেনা। তেমন মানুষ কচিৎ জন্মায়। তাদের জাত-ই আলাদা। তাদের আগ্রহ আলেয়ার আলোর মতো নিভে যায় না, জ্বলে ওঠে আর সেই আগুন দিয়ে আকর্ষণ করে গুরুকে। তখনই গুরুর মনে-ও বিদ্যাদান করবার প্রকৃত আগ্রহ সঞ্চারিত হয়। এসব শুধু শাস্ত্রবাক্য-ই নয়। বাল্যকালে কণ্ঠমণি-ও ভাবতেন, এসব সাজানো কথা। তাঁকে তাঁর গুরু বলতেন—'বুঝবি, বুঝবি, যখন বড় হবি তখন বুঝবি।' এখন তিনি বোঝেন সে কথার দাম কতখানি।

আন্তরিকতার হাজারো অঙ্গীকার অবশ্য অনেকের কণ্ঠে-ই সোচ্চার হয়েছে। রাজস্থানের যশবন্ত সিং-ও এসে অনেক কথা বলেছিল। প্রথম দিন-ই তাকে বলেছিলেন কণ্ঠমণি—'তুমি নিজের ঘরে যাও বাপু, এ তোমার আসবে না।' শুনে রাগ না করে হেসে ফেলল যশবন্ত। বলল—তা বললে-ও আমি যাব না এখান থেকে।

বেঁটে চৌকো মানুষটা, ঘাড় মোটা, লাল মুখ—হাসি, কথা, চলা বলা সবই উচ্চগ্রামে বাঁধা। তা ছাড়া অপটুর চূড়ান্ত। তাকে নাচতে দেখে মেয়েরা হেসে গড়িয়ে গেল। নাচা তার পক্ষে বিড়ম্বনা-ও। কিন্তু এমনিতে যশবন্তকে ভাল না বেসে উপায় নেই।

কণ্ঠমণিও তাকে স্নেহ করেন। যশবন্ত সোজাসুজিই বলেছে—বাপের সঙ্গে আমার পুরোন ঝগড়া। বিয়েসাদী নিয়ে ঝগড়াটা বেশ জমে উঠেছে আমার শ্বশুরের সঙ্গে। কাজে কাজেই আমি গা ঢাকা দিয়ে আছি।

শ্বশুরের মেয়ের জন্যেও যে যশবন্তের কিছুমাত্র ভাবনা আছে তা মনে হয় না। নিরাসক্ত কণ্ঠে বলে—ছোক্‌রী একেবারে বারো বছরের। বড় হোক—তার জন্যে টান হোক, তখন ফিরব ঘরে।

ততদিন অবধি যশবন্ত এখানেই থাকবে না। নীলমণিকে আশ্বস্ত করে বলেছে—দেখবেন যে-কোন দিন আমি পালিয়েছি। ঐ রকম ছট্‌ফটে মানুষ আমি।

কণ্ঠমণির নিরাসক্তিতে অনেকটা চিড় ধরিয়েছে রাধা। কুড়ি বছরের মেয়েটি যেদিন তাঁকে সন্ধান ক'রে ক'রে এলো এখানে—বড় বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি। বোম্বাই-এ তাঁর শো দেখে মুগ্ধ হয়েছে রাধা। তাঁকে খোঁজ ক'রে ক'রে তাই এসেছে সে। রাধার পোশাক পরিচ্ছদ দেখে তিনি বলেন—'তুমি সুখে লালিত। এ পরিবেশ তোমার ভাল লাগবে না বেশী দিন।' তাঁর অবিশ্বাস দেখে বেশী কথা বলেনি রাধা। তবে তার নিষ্ঠা, কঠোর শ্রম করবার ক্ষমতা, নীলমণির নির্দেশ মেনে চলবার চেষ্টা—এই সব দেখে ভালো লেগেছে কণ্ঠমণির। যেমন সুকুমার চেহারা রাধার, তেমন-ই নম্র স্বভাব। সে যে সুন্দরী, দেহে যে তার যৌবন এসেছে, সে কথা যেন সে সবে জানল। শৈশব ও যৌবন সবে মিলেছে রাধার দেহে। চরণের চপলতা নয়নে এসে থমকে গিয়েছে সলাজ বিস্ময়ে। যৌবন যে এমন হয় তা যেন জানত না রাধা। সচেতন যদি হতো তার যৌবন, তাহ'লেই বলা চলতো—'কুটিল কটাক্ষ ছটা পড়ি গেল', অথবা 'নয়ন নলিনী দউ অঞ্জনে রঙ্গই ভাব-বিভঙ্গি-বিলাস'। পদাবলীর ভাষা ছাড়া উপমা জানেন না কণ্ঠমণি। কিন্তু রাধার নয়নে সত্যিই এখনো সেই ভ্রূভঙ্গ-বিলাস নেই। 'ঈষৎ হাসনি সনে—মুঝে হানল

নয়ন বাণে—' সে হাসি যে কেমন হয় তা রাধা জানে না। আজও চাহনি তার সরল। এ যেন সবে উন্মেষের সময়।

সেই জন্যে তার সম্পর্কে কণ্ঠমণির একটা সুকঠোর দায়িত্ব-বোধ আছে। বড় গুণবতী মেয়ে রাধা। নৃত্য-ছন্দ সহজেই সঞ্চারিত হয় তার চরণে। তার এই মৃদু সুকুমার ব্যক্তিত্ব, দেহমনের এই শুচিতা মণিপুরী নৃত্যশিল্পীর পক্ষে বড় প্রয়োজন। তাই রাধার প্রতি তাঁর একটা সস্নেহ সতর্ক ভাব আছে। যে মেয়ে দেশ ঘর ছেড়ে এত দূরে শুধু শিখতে এসেছে তাঁর কাছে, তার সম্বন্ধে তাঁর দায়িত্ব আছে বৈ কি। অন্ততঃ তাঁর কাছে থাকার সময়ে তাঁর জ্ঞাতসারে যেন কোন অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে রাধাকে নিয়ে। আশ্রম জীবনের শুচিতার দিকে কণ্ঠমণির তীক্ষ্ণ সজাগ দৃষ্টি। নিজে তিনি শিল্পী। হৃদয়-মনের আবেগ-অনুভূতির বহিঃপ্রকাশে কোন উদ্দামতা, অস্থিরতা বা অসংযম সহ্য করতে পারেন না কণ্ঠমণি। তাই তাঁর আশ্রমের জীবন প্রবাহ-ও চলে শান্ত, স্থির ও সু-সম গতিতে।

এই শান্ত বৈচিত্র্যহীন আশ্রমিক জীবনে হঠাৎ একদিন আন্দোলন জাগল। খেয়াল খুসীর হাজারটা পাগলামি নিয়ে দমকা বাতাসের মতো এসে পড়ল সাধন। কণ্ঠমণি সচকিত হলেন। তারপরেই তাঁর নির্বেদ ভাঙল। অন্তরে কোথায় অনুভব করলেন অস্থিরতা। এমন অস্থিরতা তিনি যৌবনেও জানেননি। এ অস্থিরতার জাত অন্য। প্রস্তুত ছিলেন না বলেই আরও বিভ্রান্ত হলেন বেশী। অন্যের মধ্যে জাত শিল্পী দেখলে মর্যাদা দেবার আগে যাচাই করতে চায় মন। কণ্ঠমণি আশ্চর্য হলেও স্বীকার করলেন—হ্যাঁ, এ সাঁচ্চা হীরে। পালিশ থাক আর নাই থাক।

কণ্ঠমণি বড়ঠাকুরের নামটুকু সম্বল ক'রে এসে পৌঁছল সাধন সন্ধ্যেবেলা। ঠাকুর এখন কারো সঙ্গে দেখা করেন না—এ কথা শুনে সে বলে—'তাঁকে দেখব বলে আমি আসছি সেই কতদূর থেকে।

তোমাদের সঙ্গে কথা বলব না, তাঁকে ডাকো।' সাধনের কথা শুনে বিস্ময়ে চোখ বড় বড় করল শচী। কৌতূহলী নীলমণি এগিয়ে এলেন। সাধনের সেই একই কথা—সে কণ্ঠমণির সঙ্গে দেখা করবে।

কালাচাঁদ ও রাইকিশোরীর বিগ্রহ রূপোর তৈরী। ধাতুবিগ্রহের নিষ্প্রাণ মুখচোখে কি খোঁজেন কণ্ঠমণি কে জানে। ধূপ-ধূনোর গন্ধে ঘর আচ্ছন্ন। ছোট ছোট জাফরী-কাটা জানালা দিয়ে ঘরের গন্ধ-ভারাতুর বাতাস বেরোতে পথ পায় না। দোপাটি রঙ্গনের মালার তলায় বিগ্রহের মুখ ঢেকে যায়। সেদিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে যখন আরতি করেন কণ্ঠমণি তখন তাঁকে বিরক্ত করতে ভয় পায় সবাই। তবু এই নতুন আগন্তুকের হাঁক ডাক সে ঘরে গিয়েও পৌঁছল। বেরিয়ে এলেন কণ্ঠমণি। নীলমণি উত্তেজিত হয়েছেন দেখে অসন্তুষ্ট হলেন। বললেন—আমার কাছে নিয়ে এসো তাঁকে। সামান্য ব্যাপারকে তোমরা এত বড়ো করে তোল যে দেখে আমি অবাক হয়ে যাই।

সকলকে বিস্মিত করে আগন্তুককে নিজের ঘরে ডাকেন কণ্ঠমণি। বলেন—বল তোমার কি বলবার আছে। কে বলেছে তোমাকে আমার কাছে আসতে?

—চন্দ্রনাথের সনাতন দাস।

—তাঁকে তুমি জান?

—আমি তাঁর দেশের মানুষ।

—সনাতন দাস কেমন আছেন?

—তিনি দেহ রেখেছেন একমাস আগে।

কণ্ঠমণিকে অনেক কথা বলবার সুযোগ না দিয়েই নিজের কথা বলে সাধন। বলে সে নাচ শিখতে এসেছে। বলে তার পিতার অবস্থা যে শুধু সচ্ছল তা নয়—তাঁকে বেশ অবস্থাপন্ন বলা চলে। চট্টগ্রামে তাঁর নাম সকলেই জানে। বাড়ীতে কেউ নেই তার? উত্তরে সাধন জানায়—হ্যাঁ, সকলেই আছেন। মা, বাবা, ভাই,

বোন। তবু কেন যে সে এল এই পথে তার জবাব হচ্ছে অন্য উপায় নেই। ছোটবেলা থেকে কতবার যে সে যাত্রা আর পালা কীর্তনের দলের সঙ্গে পালিয়েছে তার সীমা সংখ্যা নেই। আগে আগে নিজেকেই নিজের ভয় করতো তার। মনে হতো বুঝি কোন সর্বনাশা নেশায় পেয়েছে তাকে। বাপের হাতের কাঁচা কঞ্চির দাগ আজও তার শরীরে দু'একটা মেলে। কিন্তু নাচের ওপর তার টান যে রক্তের ভেতর আছে তাতে সন্দেহ কি? নেশা কখনো এমন ধারা হয়? তাই সাধনের পড়াশুনো হলো না, ব্যবসাবাণিজ্য পোষাল না—ঘরছাড়া করলো তাকে এই নেশা। কণ্ঠমণির কাছে না এসে তার উপায় কি?

তার কথা শুনে কতখানি বিশ্বাস করেন কণ্ঠমণি চট করে বোঝা যায়না। বলেন—এ কথা সকলেই বলে। বাইরে থেকে দেখা এক জিনিষ আর কঠোর পরিশ্রমে শিক্ষা করা আর এক কথা। তোমার কষ্টিপাথর তুমি-ই। বেশ থাকো, শেখো, কষ্ট করো—আপনা থেকেই তোমার কথার যাচাই হয়ে যাবে।

নিশ্চিন্ত হয় সাধন।

কথাবার্তায় দেখা যায় নিজের সুবিধে অসুবিধের কথা জানান দেওয়াও তার অভ্যাস আছে। বলে—একখানা আলাদা ঘর চাই আমার। সকলের সঙ্গে আমি থাকতে পারবো না।

তারপর পকেট থেকে একটা থলি বের করে দেয় কণ্ঠমণিকে। বলে—প্রায় ষোল শ' টাকা আছে। আপনি রাখুন। কাছে টাকা রাখা আমার অভ্যেস নেই।

টাকার থলিটা হাতছাড়া করে যেন মুক্তির নিশ্বাস ছাড়ে সাধন। চোখ টিপে লক্ষ্য করেন কণ্ঠমণি। একটু অবাকও হন।

বাগানের ছোট ঘরখানা সাধনকে নির্দিষ্ট ক'রে দেন কণ্ঠমণি। নীলমণি না বলে পারেন না—'কোথাকার কে, চেনেন না, জানেন না—'

কণ্ঠমণির কণ্ঠে কিছু ক্লান্তি, কিছু বিরক্তি ফুটে ওঠে। বলেন—মেপে মেপে ত' এতদিন চললাম! দেখা যাক বে-হিসেবী হয়ে—ঝুঁকি নিয়ে—

কণ্ঠমণির এই স্বভাব-বিরোধী উক্তি শুনে অবাক হয়ে চলে যান নীলমণি। মুখে তাঁর কথা জোগায় না। অন্যরাও কৌতূহলী হয়ে ওঠে সাধন সম্পর্কে। যশবন্ত খুব খুসী হয়। লণ্ঠন হাতে সাধনের সঙ্গে তার ঘরে যায়। গোছগাছে সাহায্য করে। শক্ত পাহাড়ী বাঁশের নিচু মাচার ওপর বিছানাটা পেতে ফেলে হাতে হাতে। বলে—এতদিনে মনের মতো একটা মানুষ পেলাম বোধ হচ্ছে। কথা কয়ে বাঁচব এবার।

আম গাছে বোল এসেছে। তার গন্ধ বয়ে এক ঝলক বাতাস এসে ঘরখানা ভরে দেয়। বিছানার ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে সাধন। বেশ পরিবেশটি। মনে হয় ভালই লাগবে তার। স্বল্প সময়ের পরিচয়েই আশ্রম সম্পর্কে যতখানি সম্ভব খবরাখবর জোগান দেয় যশবন্ত সাধনকে। নিজের কথা সাত কাহন বলে। বলে—এখানকার সব ভাল। শুধু শান্তি বড় বেশী। এত ঠাণ্ডা জীবন আমার ভাল লাগে না।

যশবন্ত বিদায় নিলে ঘুমোতে চেষ্টা করে সাধন। কিন্তু ঘুম আসতে চায় না। এই জীবনই তো সে চেয়েছে,—তাই সে এসেছে এখানে। আশা করা যায় এবার তার ভালো লাগবে। অন্ততঃ সেই যে অদ্ভুত অশান্তির একটা দাহন—যা তাকে কোথাও স্থির থাকতে দেয় না, গতানুগতিক জীবনের কক্ষপথ থেকে তাকে বারবার ছিনিয়ে এনে ঠেলে দেয় একবার সনাতন দাসের আখড়ায়, জলবেদেদের ভরার নৌকোয়, যাত্রাদলের সঙ্গে এখানে সেখানে—এবার সেই অশান্তির হাত থেকে সে ঠিক নিস্তার পাবে। তার বাপ-মা বলতেন সে অবাধ্য। কিন্তু সাধন মর্মে জানে সে অবাধ্য নয়। সে চেয়েছিল বাধ্য হতে। বাবার নির্দেশ মেনে লেখাপড়া করতে।

ব্যবসা চালাতে সে-ও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু পারল কই? কি যে এক তীব্র পিপাসার বোধ তার মনে—তাকে তাড়া করে নিয়ে বেড়াল সেই বোধ সমস্ত জীবন।

আর সত্যি বলতে কি তাতেই সাধন বেঁচে গেল। তাকে যে শেষ অবধি ছেড়ে দিলে সবাই, এতে সে খুব খুসী।

নিরাশ্রয়ের অবস্থাটাই হলো এক মহা আশ্রয়স্থল। নইলে কণ্ঠমণির মধুকুঞ্জের সন্ধানে তাকে হয়তো আজও ঘুরে বেড়াতে হতো। হয়তো বা সে শুধু ঘুরেই বেড়াতো, সন্ধান পেতো না কোনদিন।

২

জন্মস্থানেই গ্রহনক্ষত্রের বিবাদ ছিল। অন্ততঃ বাবা সীতানাথ রুদ্রের তাই বিশ্বাস। এক ছেলে রেখে যখন সাধনের মা মারা গেলেন, তখন সাধনের বয়স আট বছর। ছেলে মানুষ করবার ভাবনা ছিল না। কেননা বাড়ীভরা আত্মীয় পরিজন। তবু পাটের কারবারী মানুষ সীতানাথ। ধান, চাল, হাঁস, গরু, ছাগল নিয়ে তাঁর জমজমাট সংসার। হাল ধরতে মানুষ চাই। তাই বিয়ে করে আনলেন সুহাস-কে। গরীব বাপের বিয়ে না হওয়া বয়স্থা মেয়ে। এরই ত' থাকবে ঘর সংসারের কামনা। সংসার বাঁধতে হলে তেমন মানুষ দিয়েই দিতে হয় বেড়ী, যার নিজের আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে বলে-ই সংসারটাকে বাঁধবে, চৌকি খবরদারী করবে সীতানাথের সংসারের ওপর। সীতানাথকে অবসর সময়ে শাসন করলে-ও আপত্তি করবেন না তিনি।

সুহাস কিন্তু সে মেয়ে নয়। সে প্রথম থেকেই এল এমন মুখ ক'রে যেন বর্তে গিয়েছে সে! এমন সৌভাগ্য সে যেন ভাবতে-ও

পারেনি। দুটি বড় বড় চোখে করুণ মিনতি নিয়ে এল সুহাস এ বাড়ীতে।

তার মায়ের ঠাঁই অন্য মানুষকে দিয়ে দিচ্ছেন বাবা এ জেনে সাধনের মনে দুঃখের অবধি ছিল না। নতুন বৌয়ের ওপর তার রাগ হলো। সুহাসের কথা শোনে না সে। নাওয়া খাওয়া বিষয়ে কথা মানে না। চলে নিজের মতে। তুচ্ছ কথা সাতখানা হয়ে ওঠে সীতানাথের কানে।

—আর কিছু নয়, ছেলেটাকে ত' বশ করতে পার! ছোট ছেলে—তাকে জোর করে হ'ক, আদর ক'রে হ'ক··· !

জোর করতে যে জানে না সুহাস। স্বামীর শাসনে সে আরো ভয় পায়। সাধনকে লুকিয়ে কাঁদে। দেখে শুনে সাধনের মনে করুণা হলো। না—এ মেয়ে তার শত্রু নয়! এ-ই ত' দেখি অসহায়। তবে এর ওপর রাগ করে কি হবে? কথাটা ভেবে বুঝে সাধনের পাগলামিগুলো কিছু শান্ত হলো। বিদ্বেষ ভাবটা কিছুটা কাটল। সুহাসের মনে একটু শান্তি এলো। আর দশজন বলল, নতুন বৌ সাধনকে বশ করেছে।

তারপরে সুহাসের একটির পর একটি সন্তান হলো। জড়িয়ে পড়ল সুহাস। মাঝখান থেকে সাধন হয়ে উঠল অত্যন্ত স্বাধীনচেতা।

ছেলেটার পড়ালেখায় মতি নেই দেখে সীতানাথের মনে দুঃখ। মা-মরা ছেলে। তার ওপর অন্যায় যেন না হয় সেদিকে তাঁর নজর খুব সজাগ। কিন্তু সঙ্গ দেবার সময় কোথায় তাঁর? খাওয়া দাওয়া দেখে বটে সুহাস, কিন্তু কোলে পিঠে ছোট ছোট ছেলে নিয়ে তার দিন যায় কেটে। মাঝখান থেকে ছেলেটা পড়ে একলা। স্নেহ-মমতার কাঙাল সাধন—এখানে ওখানে ক্ষেপ দিয়ে ফেরে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে।

বড় নদীর খাঁড়ি কেটে খাল বেরিয়েছে। সে খালে জলের রং কালো। শ্যাওলা আর ঝাঁজিদামের নিচে গভীর জল। এই গভীর

কালো জলের মধ্যে কি যেন মায়া আছে—উপুড় হয়ে পড়ে দেখতে বড় ভালো লাগে সাধনের। জলেডোবা ধানক্ষেতের ওপাশ দিয়ে রেললাইন চলে গেছে কতদূরে। এই দূর-দূরান্তের রেললাইন দেখে মন কেমন করে সাধনের। মনে হয় চলে যাই এখনি।

কখনো বটগাছের ঝুরি ধরে দোল খেয়ে জলের মধ্যে পড়ে। ঝাঁপিয়ে সাঁতার কেটে উঠে আসে চোখ লাল করে।

এমনি করে জীবন কাটালেও সীতানাথের আপত্তি ছিল না। কিন্তু ছেলেটার মধ্যে যে ঘর ছেড়ে পালাবার সর্বনেশে নেশা আছে তা কে জানতো? এই ছেলে আছে, এই ছেলে ঘরে নেই। সে এক দারুণ দুশ্চিন্তা সীতানাথের।

সহরে এল যাত্রা-গানের দল। মোটা টাকা দিয়ে পাড়ায় সে দল আনলেন সীতানাথ। তিনদিনে গোষ্ঠবিহার থেকে নৌকাবিলাস অবধি পালা গেয়ে ভাত কাপড় পান তামাকের ফলাও ব্যবস্থায় খুসী হয়ে গরুর গাড়ীতে উঠল যাত্রাদল। ইতিমধ্যে সুবলসখার সঙ্গে বড় ভাব হয়ে গিয়েছে সাধনের। কলাবাগানের নিভৃত অন্ধকারের রং-ও আবছা সবুজ। সবুজ কলাপাতাগুলি মৃদু বাতাসে কেঁপে কেঁপে সূর্যের আলো চমকায়। নীচের নরম মাটি ঘন ঘাসে সবুজ। অপরাজিতার লতা ঢেকে ফেলেছে ঘন বেড়া। এখানে বসে সাধন সুবলসখার কাছে নেচে নেচে গাইতে শেখে। স্বয়ং কৃষ্ণ এসে সুবল ও গোপী বালকদের সঙ্গে বসে দেখে রায় দেয়, যাত্রাপার্টিতে গেলে সাধনের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। সাধনের নাচ দেখলে যে অধিকারী মুগ্ধ হবে তাতে সন্দেহ কি!

গরুর গাড়ীগুলো সারি সারি বেরিয়ে গেল সকালে। তার অনেক পরে বেলা তিনটেয় খোঁজ পড়ল সাধনের। সাধন বাড়ী নেই জেনেও কেউ চিন্তা করেনি প্রথমটা। সন্ধ্যের দিকে খোঁজ খোঁজ সাড়া পড়ল। সারারাত দুশ্চিন্তার পর সকালে যখন পুকুরে জাল ফেলা হবে কি না হবে সেই জল্পনা চলছে, যাত্রার অধিকারী

উপস্থিত হলো সাধনকে নিয়ে। তার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছিল সাধন। এ কথা জানাজানি হলে তারই হাতে কড়া পড়বার সম্ভাবনা বেশী। নিজে যে সে নির্দোষ সে কথাই বারবার বলল অধিকারী।

সীতানাথ মারলেন সাধনকে। মেরে রক্তারক্তি করলেন। একটা কথা-ও বলল না সাধন। পরাজয়ের বোধটা এমন আচ্ছন্ন করল সীতানাথকে, যে হতাশ হয়ে গেলেন তিনি।

সেদিন থেকে সাধন বাপের সম্পর্কে শ্রদ্ধাভক্তি হারাল।

পূর্ববাংলার নদীবহুল অঞ্চল। শরতের ভরা নদীতে ভাসমান একখানা গ্রাম নিয়ে আসে ভরার নৌকো। জলবেদেদের দল। নৌকোয় তাদের বাস। নৌকোই তাদের বাড়ীঘর। ভরার মেয়েদের মুখে দেওয়ানা মদিনার গান শুনে সাধন আবার অস্থির হলো। পনেরো-বছরের শামলা ছেলে। ছিপছিপে শরীর—খেয়ালী স্বভাব। উদাস ভাব। পকেটে তার রূপোর টাকা দেখে সাধনকে ঠারেঠোরে কি বুদ্ধি দিল তারা কে জানে। তাদের পুরুষরা মেয়েরা গান গায় নাচে—সেই জীবনই ভাল লাগল সাধনের। ভরার দল চলে গেলে পরে সে-ও বন্ধু প্রভাতের সঙ্গে রওনা হলো ডিঙি নিয়ে। সে না কি বুড়ীকে টাকা এনে দিয়েছে তিরিশটা। নবীগঞ্জের বন্দরের আগেই তারা রাখবে তাদের নৌকো। সাধন এসে উঠবে, তারপর নিয়ে যাবে তাকে। কত দেশে যায় তারা—বরিশাল, খুলনা, সুন্দরবন। কিন্তু কোথায় কার নৌকো? সাধনকে ফাঁকি দিয়ে তারা আগেই পালিয়েছে।

তারপরে সাধন নামে যশেই ছেড়ে দিল ইস্কুল। অনেক বলে কয়ে বাপও হাল ছেড়ে দেন। বন্ধুদের সঙ্গে নেশা করে সাধন—হৈ হুল্লোড় করে।

বয়ঃসন্ধির সময়। এসময়ই না মন ওঠে কাঙাল হয়ে। স্নেহ মমতা চায়। চায় একটু বাঁধন। কাঙাল চোখে দেখে মানুষ জন পৃথিবীকে। যেখানে ভালবাসা পায় সেখানেই ধরা দেয় নিজেকে।

নানা ভাবের অঙ্কুর জাগে সাধনের মনে। অনেক নতুন অনুভূতি আসে।

মনের ছট্‌ফটানির নিশানা জানে না সাধন। এখানে ওখানে ঘুরে বেড়ায়।

এমনি করে একদিন খেয়ালের বশেই গিয়ে উপস্থিত হলো সনাতন দাসের আখড়ায়। সনাতন দাস বৃদ্ধ বৈষ্ণব। মাঘ মাসে যুগীপাড়ায় তাঁর দল এল সংকীর্তন গাইতে। যুগী বৈরাগীরা পাড়া থেকে চাঁদা তুলল। ঠাকুরতলায় বসল কীর্তন। নতুন মালসা ভ'রে ফলমূল মিছরী পাটালির ভোগ পড়ল। নাম গান হলো রাত জাগিয়ে।

বুড়ো মানুষ। তামাটে গায়ের রং। পাতলা ফুরফুরে পাকা চুল-দাড়ি—সনাতন দাসের গলার গান শুনে মুগ্ধ হলো সাধন। আমি কৃষ্ণ চিনি না রাধা চিনি না—এক গৌরাঙ্গের মধ্যেই আমি সকল রূপ প্রত্যক্ষ করলাম—যে জনায় গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে—এ গানের মধ্যে কত প্রেম যে ঢেলে দিলেন সনাতন দাস—শ্রোতারা হায় হায় করে উঠল। রাত ভোরের সময়ে সনাতন দাস একলা গাইলেন শচীমাতার খেদ—

'বল দেখি তাই বাপরে নিতাই
নিমাই আমার কোথা গেল ॥
এক আমার নিমাই বিনে
দিনে নদে আঁধার হলো ॥
সেদিন গত নিশি ভরে
ছিলাম আমি ঘুমের ঘোরে ॥
যাবার কালে মা মা বলে
বুঝি নিমাই ডেকেছিল ॥
সোনার শয্যা আছে পড়ে
নিমাই আমার গেছে ফেলে ॥

আমার গলে ছুরি মেরে

কোন চোরে ধন হরে নিল ॥

গান শুনে আর সকলের সঙ্গে সাধনও কাঁদল। তারপর সনাতন দাসের সঙ্গ ধরে উঠল গিয়ে তাঁর আখড়ায়।

সেখানে তুদিন কাটিয়ে ফিরল সাধন। বাপের অভিযোগের জবাবে সে বলল—আমায় কিছু টাকা দিয়ে দাও, আমি চলে যাই।

ব্যবসা করবে না—দোকানপাট দেবে না—একি তুর্জয় রোখ সাধনের। শেষ অবধি গদী থেকে তু' হাজার টাকা নিল সাধন। বলল, দেশ ঘুরতে চললাম। পরে ফিরি ত' ফিরলাম—নয় তো জেন এ টাকা তুমি আমায় দিয়েছ।

এ টাকা কেন, অনেক টাকা দিতেই প্রস্তুত ছিলেন সীতানাথ। একবার ঘর ছেড়ে গেলে আবার ফিরে আসবে সাধন? তাঁর মনে বিশ্বাস হয় না। বাপের সাধ্য-সাধনায় সাধন কথা দিল যে হ্যাঁ, ফিরে আসবে।

বাবার সঙ্গে আর দেখা হয়নি সাধনের। বছর তুয়েক বাদে সীতানাথ মারা গেলেন। খবর পেয়ে একবার এল সাধন। বিষয় সম্পত্তির কথা তার মাথায় নেই। বাবা যে তার জন্যে বিশেষ ক'রে কিছু টাকা রেখে গেছেন, তার বাইরে সে আর কিছু চাইল না। মনের যোগ অনেকদিনই কেটেছিল, তাই নিঃসম্পর্ক হয়ে বেরিয়ে আসতে এতটুকু লাগল না তার। বরং মনে মনে একটা মুক্তির আস্বাদ অনুভব করল সে।

এই খাপছাড়া স্বভাবের ছেলেটার প্রতি সনাতন দাসের স্নেহটা আন্তরিক। তিনিই তাকে সন্ধান দিলেন কণ্ঠমণির আশ্রমের।

৩

মধুকুঞ্জের মালিনী হলো রাধা। সে কথা রাধা জানে কি জানে না বোঝা যায় না। সাধনের নজর সেদিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা করে যশবন্ত একনিষ্ঠভাবে। বলে—দাদা, তোমার দিকে চাইলে ওর চোখের চেহারা বদলে যায়—দেখেছ ?

তুমি ছ্যাখো। ব'লে সাধন উড়িয়ে দেয় কথাটা। কিন্তু যশবন্ত মানে না। বলে—আমার একদম ভালো লাগছে না দাদা। মোটে লাইফ নেই। এই এক-দুই-তিন-চার করা কি আমার পোষায় ?

—তবে এলে কেন ?

—খেয়াল! এবার কিন্তু চলে যাবো। তোমাকেও নিয়ে যাব। আমার গ্রাম দেখলে তোমার খুব ভালো লাগবে সাধন। চারিদিকে রুক্ষ বালি, পাথর আর কাঁকরের রাজত্ব। তারই মাঝখানে আমাদের গঢ়িয়া সীতমপুর। বাংলাদেশের ছেলে তুমি, জলের দাম জানোনা। আমাদের সীতম নদীতে জল আসে যখন, তখন জল নিয়ে কি রকম কাড়াকাড়ি মারামারি লেগে যায় দেখলে অবাক হয়ে যাবে। জল বড়ো মহার্ঘ জিনিষ আমাদের দেশে।

—যাবো একবার তোমার দেশে।

—রাজস্থানের কোথাও কোথাও মেঘ জল ঢালে। সেই মেঘের পথ ধ'রে ঘোরে রাজস্থানের বাঞ্জারা, লম্বাডিরা দল বেঁধে। দেখলে তোমার ভালো লাগবে।

—নিশ্চয় যাবো তোমার সঙ্গে।

—তোমার মনেও ছট্ফটানি লাগল বলে। আমি ত জানি এখানে বেশীদিন ভালো লাগতে পারে না তোমার।

এ কথাটা শুনতে চায় না সাধন। নিজের মনের নিরন্তর অস্থিরতা দেখে তার নিজেকেই ভয় করে এক এক সময়। এই তো বেশ আছি এখানে। শান্ত পরিবেশ। কোন গোলমাল নেই। এখানে আমার নিশ্চয় ভালো লাগবে। নিজেকেই ভোলায় সাধন।

বাগানের পেছনের ছোট্ট কুঠরীটা তার। ঠিক টাকার বিনিময়ে যে সে এই সুবিধেটা পেয়েছে তা নয়। টাকার কথাটা মোটে আমলই দেননি কণ্ঠমণি। মনে হয়েছে দুটো কথা বললে বুঝবে সাধন। কিছু কিছু দুঃখের কথা বলেছেন তিনি। বলেছেন—

দুঃখের কথা বলব কি। এ পথে কোন পুরস্কার মিলবে না তোমার। যাঁরা এ শিল্পের গুণগ্রাহী ছিলেন বাঁচিয়ে রাখতেন। অন্ততঃ কিছু কিছু রাজা জমিদারের কথা আমি জানি, যাঁরা সত্যিই শিল্পীদের দুঃখ অনুভব করতেন। কলকাতায় ঘুরে এসেছি আমি। আগরতলাতেও ছিলাম। সেখানে-ও দেখেছি দরদী মানুষ। কি জানো, গান বাজনায় মানুষ যেমন উৎসাহ দেখায়—নাচের সম্বন্ধে ঠিক সে উৎসাহ দেখা যায় না। প্রথমতঃ শিক্ষিত লোকের ধারণা —পুরুষদের নাচবার কোন মানে হয় না। ভদ্রঘরের ছেলেরা যে এই শিল্পকে বাঁচাতে পারে, উন্নত করতে পারে—একথা বলতে গেলে মানুষ হাসবে। বড় অদ্ভুত কথা। কেন না আমাদের শাস্ত্র তো সেকথা বলে না। সৃষ্টির প্রথমে শিব নাচলেন প্রলয় নৃত্য। তাঁর সেই নৃত্যের তালে তালে জন্ম নিল সৃষ্টি। দক্ষিণ ভারতে সে নটরাজ মূর্তি আজও পূজা পায়। আমাদের দেশে কতো ছাঁদের নৃত্য যে প্রচলিত আছে সাধন—যদি সুযোগ পেতাম ঘুরে ঘুরে শুধু দেখতাম। আজ যদি বলো সে সব কথা এ যুগে বাতিল হয়ে গেছে—তবে আমার মন মানবে কেন? এ হলো বিদ্যার অহঙ্কার। যা তোমাদের শিক্ষিত সমাজ জানে না, তাই হলো খারাপ।

এসব কথা বলবার সময় বড়ই ক্লান্ত দেখায় কণ্ঠমণিকে। বাইরের

বাতাস আসতে পথ পায় না বন্ধ ঘরে। ধূপের ধোঁয়ার সঙ্গে বেলফুলের গন্ধ ঘুরে ঘুরে মরে। কিছুক্ষণ বাদে তিনি বলেন—

শুনলাম তুমি টাকা দিতে চেয়েছ। টাকা আমি নিই। তবে প্রয়োজনের বেশী নয়। আহার, বাস ও খরচ-খরচার জন্য কিছু তুমি নীলমণিকে দিও। একটা কথা বলতে পারি—যদি প্রাণ দিয়ে শেখো, তবে অধীত বিদ্যাই তোমার মনে এনে দেবে এক অভূতপূর্ব আনন্দ যা অন্য কেউ দিতে পারে না। শিক্ষা সম্পূর্ণ হ'লে শিল্পী যে আনন্দ পায় তার তুলনীয় আর কি আছে বলো ?

—আপনিই জানেন মহারাজ।

—তুমিও জানবে। কিন্তু আমার একটা ভয়—

—কি ?

—বড় অস্থির তুমি—বড় চঞ্চল !

—তাতে আপনার ভয় কেন ?

—অমন অস্থির হতে নেই।

নির্বাক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে যে ধাতু-প্রতিমা সেই কি এই শান্তির মন্ত্র শিখিয়েছে কণ্ঠমণিকে ? মানুষের ভুল-ভ্রান্তি ছট্‌ফটানিকে এত ভয় পান কেন কণ্ঠমণি ? অনেক প্রশ্নের জবাবই মিলবে না তা জানে সে। তাই উঠে পড়ে সাধন।

নীলমণির দেহখানির বাঁধুনি সুন্দর। এক-দুই-তিন-চার ! যান্ত্রিক ছন্দে পায়ের তাল নিখুঁত করতে চেষ্টা করে সাধন। রাধার সকৌতুক দৃষ্টিপাত বুঝেই হয়তো পায়ের তাল কাটে তার। বড় অসন্তুষ্ট হন নীলমণি। হলো না, হলো না, বারবার বলেন।

নাচের তাল যদি কাটে বারবার তবে গান হয় কি করে ? খোলন্দাজ শ্যামের চিবুকটি ছোট—রং কালো। শান্ত স্বভাবের মানুষ। খোলের গায়ে চাঁটি মেরে বোল তুলতে গিয়ে থেমে যায় সে।

নীলমণি কতখানি চট্‌লেন না বুঝে গলার ধুকধুকিটা তার থরথর করে কাঁপে। গায়েনরা

"শ্রী-ই-ই মনো মধু বৃন্‌-দা বনো—" টানতে গিয়ে আবেগটি দেবার প্রাক্‌মুহূর্তে গান ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। একবার নীলমণির দিকে একবার সাধনের দিকে তাকায় সভয়ে।

পুনর্বার সুরু করতে গিয়ে সুরুতেই পা ফেলতে ভুল করে সাধন। চটে যান নীলমণি। বলেন—আপনি কি পরিহাস করেন ? এ্যাঁ ? আমি পরিহাসের পাত্র ? হেসে ফেলে সাধন। হাসি দেখে আরো চটেন নীলমণি। তখন সাধন আপনা থেকেই সংশোধন করে ভুল। নিখুঁত পদক্ষেপে পুরো চালটি সম্পূর্ণ করে ললিত কটিভঙ্গিমায় বৃত্ত করে ঘিরে আসে গুরুকে। এমন চমৎকার হয়, যে উৎসাহে শ্যাম বাজিয়ে ওঠে খোল। সাধনের মনে হয় পায়ে তার বিনা আয়াসেই নাচ আসছে। এ নাচ সে নীলমণির কাছে শিখেছে কিনা সে খেয়াল তার থাকে না। পুজোর পর এক পায়ে ঘুঙুর বেঁধে জারি নাচতে এসেছিল চরের বাগ্‌দীরা। সেই সারি-বাঁধা সুঠাম দেহের ছন্দোবদ্ধ পদক্ষেপ তার মনে পড়ল। মনে হলো তাদের দেহ-তরঙ্গে যেন নদীর ঢেউয়ের দোলা দেখেছিল সেদিন। আজও সেই কথাই মনে হলো তার। কি আশ্চর্য, সেই ছন্দ যে তারও পায়ে উঠে আসবে তা ত' ভাবেনি সাধন। কি যে মনে হলো তার, ষোল মাত্রার চাল অক্ষুণ্ন রেখেই পায়ের তালে তালে জারির ছাঁদে ঘুরে ঘুরে এক নতুন ভঙ্গিমা সৃষ্টি করে নেচে চলল সে। নিজের সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠেছে সাধন। মুগ্ধ শ্যাম খোলের ঠেকায় ধরল এই নতুন তাল। ব্রজবাঁশী আর মথুর গান ছেড়ে দিয়ে দেখে নিল একবার। এমন সংক্রামক এই ছন্দ, যে তাদের গানেও লাগল সেই মাতন—'মণি মন্দিরে শোভন—মণি মন্দিরে শোভন—!'

অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন নীলমণি। সকলেই মুগ্ধ হয়ে দেখল সাধনকে। নেচে নেচে ক্লান্ত হয়ে যখন থামল সাধন, তখনও তার

চোখ মুখে সেই অবাক বিস্ময়। এমন যে হবে, তা সে ভাবতেও পারেনি। প্রথমেই তার চোখ পড়ল রাধার দিকে। রাধার মুগ্ধ চোখ তার চোখে বাঁধা পড়ল। দুজনেই কিছুটা সম্বিৎহারা। নাচের উত্তেজনায় ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে সাধনের। না নেচেই উত্তাল রাধার বুক। সকলে অবাক হয়ে তাদের দেখছে। অপ্রস্তুত অবস্থাটা বুঝে সাধন বেরিয়ে এল। নীলমণির কাছে অনুমতি নিয়ে চলে এলো নিজের ঘরে।

রাতের খাওয়া দাওয়া মিটে গেছে। যে যার ঘরে গেছে। নিজের ঘরে চলেছে সাধন—রাধা তাকে ডাকল মৃদু কণ্ঠে। বলল—সাধন!

সাধন বলল—বলো।

সারা আকাশে ঝুরো শাদা মেঘ। শুক্লা একাদশীর ঘুমহারা চাঁদের আলোয় আবছা জ্যোৎস্না। সন্ধ্যাবেলার নাটঘরের চেয়ে এখন রাধাকে আরো ভালো লাগছে। রাধা বলল—বড় সুন্দর দেখলাম সাধন—খুব ভালো লাগল।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই দ্রুত চলে গেল রাধা। যেতে যেতে একবার ফিরে হাসলো রাধা। হেসে খোঁপাটা হাতে জড়িয়ে নিল। সাধন চলে এল তার নিজের ঘরে।

জানালার ফাঁকে দেখা যায় জ্যোৎস্না-ধোওয়া আকাশ। মেঘ আর চাঁদের নিলাজ লুকোচুরি চলেছে সেখানে। ক্লান্ত চোখ। ঘুম আসে ধীরে সাধনের। রাধার কমনীয় মুখের মিষ্টি হাসিটুকু ঘুমন্ত চোখের পাতায় লেগে থাকে।

আশ্রমের অনেক কাজই মেয়েদের হাতে। অনেক কাজের ফাঁকেও সাধনের পরিচর্যার জন্যে একটু সময় করে নিয়েছে রাধা। মেয়েদের হাতের একটু স্নেহমমতার ছোঁয়াচ জীবনেও জানেনি সাধন। সেবা যত্নের সামান্য নিদর্শন পেয়েই রাধার কাছে কৃতজ্ঞ

হয়েছে সাধন। সাধনের সব কথা বোঝে না রাধা। তবু শুনতে চায়। বড় বড় কালো চোখ তুলে চুপ করে ব'সে থাকে। যা মনে হয় বলে যায় সাধন। শুনতে শুনতে রাধা ভাবে—যা সকলে বোঝে, তেমন সহজ কথা কেন বলে না সাধন? একটা কথা বলার মানুষ পেয়েছে বলেই যেন অনেক বক্তব্য জমে গিয়েছে সাধনের। নতুন নতুন বক্তব্যও খুঁজে পাচ্ছে সে।

দুপুরে যখন সবাই সাময়িক বিশ্রামে ঝিমিয়ে পড়েছে ঘরে, তখন চুল বাঁধবার বেণী বিনোতে বিনোতে সাধনের ঘরে আসে রাধা। কণ্ঠমণির ঘর আর সাধনের ঘরের মাঝের জমিটি গাছের ছায়ায় সবুজ। আতা, পেয়ারা, কাঁঠাল, আমলকী পরস্পরকে জড়িয়ে উঠেছে। নিচে দোপাটি, রঙ্গন, টগর, সন্ধ্যামালতীর মেলা। কণ্ঠমণির নিজের শখে বোনা একজোড়া চাঁপাগাছ কয়বছরে-ই ডালপালা মেলে সতেজ হয়ে উঠেছে। নিমগাছে যখন ফুল ফোটে বড় সুন্দর গন্ধ ভেসে আসে বাতাসে। দুইদিকে দুটি পুকুর—তার পাড়ে তরকারির ক্ষেত। শুকনো পাতায় সরু পথটি ঢাকা। দুপুরে সেই পথ দিয়ে আসে রাধা। পাতলা ছাপা শাড়ীর আঁচল ছড়িয়ে বসে পড়ে নিচু মোড়ায়। নানারঙের সুতো দিয়ে কালো সুতোর গুছি বিনোতে থাকে পাতলা আঙুলে। বলে—কথা বল সাধন। তোমার কথা শুনতে আমার এত ভালো লাগে।

কখনও কৌতুক করে হাসে সাধন। বলে—

এমন সুন্দর বাংলা তুমি কোথায় শিখলে রাধা?

শিখলাম!—কথাটার শেষে একটা অসম্পূর্ণ সুর টেনে তাকায় রাধা। শান্ত অচঞ্চল সরল তার দৃষ্টি। বলে—আমি বাঙালী সাধন। না হয় বাংলা দেশেই থাকিনি।

কত দূর থেকে এসেছ রাধা—বাড়ীর জন্যে খারাপ লাগে না?

চুপ করে থাকে রাধা। কি যেন ভেবে নেয়। তারপর বলে—বাড়ীতে আমার কে আছেন বলো। মা যখন মারা গেলেন তখন

আমার বয়স চোদ্দ বছর। বাবা ব্যবসা করেন ইষ্ট আফ্রিকায়—বছরে একবার আসেন।

তারপর বলে—বাবা চলে আসবেন তিনবছর বাদে। তখন খুব মজা হবে। একসঙ্গে থাকব আমরা।

কোনদিন এ সব কোন কথাই ভালো লাগেনা রাধার। বলে—তুমি কথা বলো সাধন।

রাধা শুনতে জানে। চোখে তার পলকে পড়েনা। ঘাড় একটু কাত করে চেয়ে থাকে। সুন্দর তার চুল বাঁধা। কপালে ছোট কুঙ্কুমের টিপ—কানে দুটি মুক্তা। শরীরটি বড় সুন্দর রাধার। ছিপছিপে, একহারা ছোট খাটো। রাধার ভেতরেও কোথাও একটা লুকোন ছন্দ আছে। মনে হয় যেন ঘুমিয়ে আছে সেই ছন্দ। নাচের সময় অতি সহজে বাম থেকে দক্ষিণে হেলে তার তনু। সেই অনায়াস লীলায়িত ভঙ্গী দেখে সাধনের মনে হয় পুষ্পিত কদম গাছের ডাল কে যেন ধনুকের মতো বাঁকাল। আবার সেই ছবি ভেঙে গিয়ে সুরে মিলিয়ে যায় তার উপমা। তার দেশের মানুষের রচা গানের সুর ও কথা মনে আসে—

"অরণ ভরণ কুলোখানি লো বকুল ফুলের মালা
বেউলো সতী বরণ বরে বামে হেলে মাঞ্জা রে"—

বরণ ডালা হাতে কোনো পল্লীবধূ সলজ্জ ঠাটে দাঁড়াল যখন, তখন কোমর বাঁ দিকে হেলে পড়ল—এই ছবিখানির তুলনা কোথায়। এ গানের ছন্দেরই বা তুলনা কোথায়। এমনি সব তুলনা ছাড়া জানে না সাধন—তাই তার মনে হয় রাধার অনায়াস নৃত্য-ভঙ্গিমার মধ্যে সেইসব ছন্দ ঘুমিয়ে আছে। এমনি সব ঐশ্বর্য যে আছে, তা যেন এখনো রাধা ঠিক জানেনা। সে যেন নিরাভরণা গৌরী।

এই সব ছন্দ তার মধ্যে রয়ে গেছে বলেই হয়তো রাধা সাধনের কথা এমন চমৎকার করে শুনতে পারে। একনিবিষ্ট অভিনিবেশ

ছড়িয়ে পড়ে তার সমস্ত শরীরটিতে। শুনতে শুনতে ছবিখানির মতোই স্থির হয়ে যায় রাধা।

এতোখানি অভিনিবেশ পেলে তবে সাধনের মুখ খোলে। বলে—

কতো যে স্বপ্ন দেখি আমি কি বলবো রাধা। ভগবানের লীলাখেলা নিয়ে এই যে ছকবন্দী নাচ, এটাই শেষ কথা? আরো কত যে বিষয় আছে? গ্রামের মেয়েরা এসে এই যে কেমন সুন্দর ধুয়ে মেলে দিয়ে ভেঙে দিয়ে যায় পার্বণের ধান? কতো মানুষ কাজ করে—কেমন সুন্দর ছন্দ বলো তো এর মধ্যে? নাচ তো মানুষকে নিয়ে? যেখানে মানুষ আছে, প্রাণ আছে, সেখানেই আছে নাচের বিষয়। কত ছন্দ, কত ভঙ্গী, কত গতি যে আমার চোখে ভাসে তা যদি তোমাকে বলতে পারতাম রাধা!

এত কথার সবই যে রাধা বোঝে, তা নয়। তবু তার আন্তরিকতার উত্তাপ ভালো লাগে সাধনের।

মণিপুরের মানুষের চেহারাতে-ই নয় ব্যঞ্জনা কম। তাই বলে তারা যে সব কথা বোঝে না তা ত' নয়। বিকেল হ'লে চায়ের ডাক পড়ে রান্নাঘরে। বিনোদিনী আর শচীর মধ্যে সহজ কৌতুকপ্রিয়তা বেশী। তারা বলে—রাধা, সাধন তোমাকে জাদু করেছে।

শচী বলে—রাধা যাদের নাম হয়, তারা চিরদিন শুনতে-ই আসে—তা জানো?

রাধা মাথা নাড়ে। না। সে অত কথা জানে না। শচী বলে—রাধা শুধু বাঁশীই শোনে জানতাম। বলো, সাধনের কথা কি বাঁশীর চেয়েও মধুর?

একটু অবাক হয়ে চেয়ে থাকে রাধা। বলে—জানি না ত'।

কিন্তু আঠারো বছরের মন। বন্ধুদের কথা তার অবসর সময়ে-ও মনে আসে। এক মনে চুল বাঁধবার সময়ে, অথবা সকলের মধ্যে বসে-ও আনমনা হয়ে গিয়ে সে কথা মনে হয় রাধার।

অপরিচিত ছেলের সঙ্গে মিশতে কোনো সঙ্কোচ নেই রাধার। তবু আনমনা হয়ে যেতে ভালো লাগে। অনেকের মধ্যে থেকে-ও আনমনা হয়ে যাবার একটা মজা আছে। তাই রাধা ঈষৎ উদাস হয়ে গৌর কপাল কুঁচকে ভাবে, সাধনকে কি তার বিশেষ ভালো লাগে?

সুনলিনী সুগায়িকা বলে নাম আছে। এই সব একান্ত মুহূর্তে রাধার মুখের সামনে হাত-আয়নাখানি ধরে সুনলিনী। সুস্বরে গেয়ে ওঠে—

"রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা?"

মেয়েরা যদি বা অবিমিশ্র কৌতুক করে-ই ছেড়ে দেয়—নীলমণির মুখে কোন বাক্য ফোটে না। তিনি শুধু লক্ষ্য করেন। তিনি যে সব দেখছেন সেটা বোঝা যায় যখন হঠাৎ দৈনন্দিন কর্মসূচীতে চাপ পড়ে। সময় পাওয়া যায় না। কাজের ঘণ্টা বারোটা ছেড়ে একটায় গড়িয়ে আসে। সামান্য বিশ্রামের বিরতি দিয়েই বিকেল থেকে আবার তাড়াহুড়ো লেগে যায়। কথা বলবার অবসর পাওয়া যায় না। তারই ফাঁকে, রিহার্স্যাল বা অন্য সময়ে যেতে আসতে দেখা। রাধা বিব্রত হয়ে হাসে। সাধন বলে—এমন কি কাজের মানুষ হয়েছ রাধা? কি জবাব দেবে রাধা? যশবন্ত বলে—মধুচক্রের মালিনীটিকে হাত করছিলে তুমি—জানতে পেরেই সব হুঁসিয়ার হয়ে গিয়েছে।

রাধা বলে: কি বললে?

সাধন কাছে যায়। বলে—যশবন্ত বলছে তুমি মধুচক্রের মধুমালিনী। ছোট কর্তার হিংসে হয়েছে। তোমার সঙ্গে আমাদের মিশতে মানা।

রাধা চলে যায়। যেতে যেতে বলে যায়—'পরে জবাব দেব।' গান গায় সাধন গুণগুণিয়ে—

"রাধা যদি বিরূপ হলো—
বৃন্দাবনে রইব কেন ?"

ঝগড়া করবে বলেই হয়তো দুপুরে বেশ একটু জানান্ দিয়ে আসে রাধা। আকাশ-নীল শাড়ীতে অভ্রের কুচি ছেটানো। তার সঙ্গে ঘননীল চোলি। চুলের লম্বা বেণীর প্রান্তে লাল সুতোর কদম ফুল দোলে। রাধা এসে সাধনের মুখোমুখি মোড়া টেনে বসে। বলে—কি বলছিলে তখন ?

ভাল মানুষের মতো সাধন বলে—কিছু বলিনি তো, গান গাইছিলাম—

"রাধা যদি বিরূপ হলো—
বৃন্দাবনে রইব কেন ?"

গান শুনে হাসে রাধা। সাধন বলে—কিছু বুঝলেনা ত' তাই হাসছ। এত সেজেছ কেন রাধা ?

—বেশ করেছি।

—রাধা নাম নিলে নীল শাড়ী পরতে নেই জানো ত' ? 'হাসির ঠমকে চপলা চমকে নীলশাড়ী শোভে গায়'

—তারপর ?

—তাই নীলশাড়ী পরলে অভিসারে যেতে হয়—জানো ত' ?

কপট রাগ ক'রে উঠে দাঁড়াল রাধা। বলল—যশবন্তের সঙ্গে মিশে মিশে তোমার-ও মাথা খারাপ হয়েছে। যা তা বলছ তুমি। তোমার কাছে আমি নীলশাড়ীর গল্প শুনতে এলাম, তাই না ?

—শুনতে নয়, দেখাতে এসেছ।

—সাধন, ভাল হচ্ছে না।

—নয়তো দুপুর বেলা দুটো কথা কইতে মানুষ এমন সেজে আসে ? তোমার নিন্দে হবে রাধা। সত্যি সত্যিই রেগে যায় রাধা। সাধন হাসে। তারপর একটু অনুশোচনা-ও হয়। ছেলেমানুষ মেয়ে। তাকে চটিয়ে দিলাম ত'। বলে—আচ্ছা সব কথা ফিরিয়ে

নিলাম। বসো। সত্যিই খুব ভালো দেখাচ্ছে। বলো—বাড়ীর চিঠি পেয়েছ ?

এতক্ষণে বেশ সহজ হয় রাধা। বলে—তোমার বন্ধু যশবন্ত কি রকম মানুষ, ওর নাচ শিখতে আসার কোন মানে হয় ?

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে উঠে দাঁড়ায় রাধা। বলে—চলি সাধন। কেন আসি না আমি, তাই বলছিলে না ? তাই একটু ঘুরে গেলাম।

রাধাকে অবশ্য পরে—নীলমণি নয়, কণ্ঠমণি-ই জিজ্ঞাসা করেন। বলেন—রাধা, এখানে ত' অনেকে-ই আছে। মেলামেশাতে-ও কোন বাধা নেই—। তবু সাধন—ওকে ত' তুমি বেশী জাননা।

অকুণ্ঠ দৃষ্টিতে তাকায় রাধা। বলে—মহারাজ, এসব ছোট কথা নিয়ে আপনি আমাকে কিছু বললে আপনার মর্যাদাহানি হয়। পরস্পর মেলামেশা করবার অধিকার সকলেরই আছে।

কার্ত্তিকের পূর্ণিমায় মধুকুঞ্জে হবে কার্ত্তিক রাস। রাস উৎসবের প্রস্তুতিতে সাড়া লাগে আশ্রমে।

আশ্বিন শেষ হয়ে এল। সাধনের ঘরের পাশের নিচু শিউলী গাছে অজস্র ফুল ফোটে। তার গন্ধের সঙ্গে শরতের উথাল পাথাল বাতাস মিশে পুজোর পরিবেশ তৈরী করে। বড় অস্থির হয়েছে সাধনের মন। কোন কাজে মন বসেনা। বর্ষার পরে শরৎ এসেছে, তাই উন্মনা হয়েছে পৃথিবী। সে-ও কি সেই একই মাটিতে গড়া, যে তার মন-ও অমনি শরতের প্রকৃতির মতোই এলোমেলো ? এই সমস্ত চঞ্চলতার কারণ যদি হতো রাধা—তবে ভালো লাগতো সাধনের। কিন্তু নিজেকে ঠকাতে পারেনা সাধন। সে ভালো করেই জানে এই অশান্ত অস্থিরতার অঙ্কুর আছে তার নিজের ভেতরে। অনেক ভেতরে, অনেক গহীনে, সে কোন্ নিভৃতে এই অশান্তির বোধটা তার জেগে আছে রাত্রিদিন। এই অতৃপ্তির বোধ

সে হয়তো নিয়েই জন্মেছিল। থেকেথেকেই ভালো লাগেনা, কিছুতেই শান্তি আসেনা—তার কারণ সেই বোধ। মর্মের এত গভীরে তার বাসা, যে সেখানে প্রবেশের পথ জানেনা রাধা। এমন সুন্দর সাজ়তে জানে রাধা, এমন সুন্দর নাচতে জানে। ফর্সা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচের ক্লান্তিতে আরক্ত মুখে ঘাম মুছতে মুছতে এমন সুন্দর করে হাসতে জানে—কিন্তু এই সব জেনে-ও সাধনকে সে একটুকু সাহায্য করতে পারে না।

রাধা যে এখন প্রসাধনে মনোযোগী হয়েছে সাধনের মুখ চেয়ে, তা-ও সাধন জানে। এ-ও বোঝে যে রাধার ক্রমবিকাশোন্মুখ যৌবন-সূর্যমুখীর সূর্য সে নিজেই। তবু তার কিছু করবার নেই। রাধা হয়তো জানলে দুঃখ পাবে, তবু সাধন তার কথা আজ-ও তেমন বিশেষ করে ভাবে না। অন্ততঃ রাধার ভাবনাতেই তার চোখ সময়ে সময়ে স্বপ্নধূসর হয়ে ওঠেনা।

তার কারণ হচ্ছে সেই কথা। সাধনের অন্তরের অশান্তির সেই অঙ্কুরটাকে গোড়াশুদ্ধ উপড়ে ফেলে দিতে পারে না রাধা। সাহায্য করতে পারে না সাধনকে।

যে পারবে সে-ই হবে সাধনের প্রকৃত বন্ধু। সেই মানুষকেই অন্তরে বসাবে এনে সাধন। তার অন্তরের সিংহাসনে সেইজনকে বসিয়ে সমাদর করবে সাধন। তার নিজের যতো ঐশ্বর্য আছে, উজাড় করে ঢেলে দেবে তার পায়। তারপর তার বাঁশীতে মুখ রেখে নিজের সুর বাজাবে। শুনবে দু-জনে।

এ হলো সাধকামনার কথা। এ সাধ সকলেই করে। কতজন আর পায়। পায়না বলেই না মানুষ চায়। চেয়ে এত গান গাথা কাব্য কথা রচনা করে। তাই সাধন-ও চায়। তার কোন দোষ নেই।

এসব কথা কইবার মানুষই বা কোথায়? সেই যে মানুষ গান রচেছে—

"কি হৈল কি হৈল আমার সই
ও প্রাণ কইতে কথা—
কথা কইতে পারলাম কই ॥"

এ গান-ও সে বড় দুঃখে রচেছে। সত্যিই সব কথা কইবার মানুষ পাওয়া যায়না। রাধা বড় সুন্দর করে শুনতে জানে। শুনতে শুনতে ছবিখানি হয়ে যায়। তবু তাকে এসব কথা বলা চলে না।

তবে এক কারণে রাধার কাছে সাধন কৃতজ্ঞ। রাধা নাচে বড় ভালো। প্রথমে পূর্ণতার অভাব ছিল। রাধার মনে সেই পূর্ণতা ছিল না, যা নাচে অনূদিত হ'লে তবে ব্যঞ্জনা আসে। তবু তার আছে ঐকান্তিক চেষ্টা। একনিষ্ঠ ভাবে সে বুঝতে চেষ্টা করেছে নীলমণির নির্দেশ। প্রাণপণ পরিশ্রম করেছে। শুধু প্রতিভাই সব নয়। পরিশ্রমের দ্বারা, সাধনার দ্বারা তবে সেই প্রতিভার পরিপূর্ণ প্রসাদ পাওয়া যায়। রাধার মধ্যে যা আছে, তাকে ঠিক প্রতিভা বলা চলে না। নৃত্যের প্রতি তার একটা স্বাভাবিক ঝোঁক আছে। তা ছাড়া আছে পরিশ্রম করবার ক্ষমতা। যতক্ষণ না একটি চাল আয়ত্ত হচ্ছে, ততক্ষণ সে বিরত হয়না।

এখন সত্যিই ছন্দ এসেছে তার মধ্যে। রাধার নাচ দেখে নয়ন সত্যিই তৃপ্ত হয়। ভালো লাগে সাধনের। রাধার সঙ্গে নাচতে তার ভালো লাগে। সে অবকাশ খুব বেশী হয়নি। রাধা নেচেছে, আর সে দেখেছে দাঁড়িয়ে। ভালো লেগেছে তার। নাচতে নাচতে, নাচবার আনন্দের কাছে কেমন আত্মসমর্পণ করে রাধা, দেখে-ও আনন্দ দর্শকজনের। রাধার সে আনন্দানুভূতির স্বাদ সাধন-ও জানে। তাই তার ভালো লাগে।

তার পরেই আবার সেই মন উন্মনা—হৃদয় উদাসী—শরতের উথাল পাতাল বাতাস।

"সজনী মন মানে না।
যে আগুনে জ্বলে হৃদি

পুড়ে মরি নিরবধি
হৃৎকমলের কমলিনী তার শাসন জানে না ॥"

এবারকার রাসনৃত্যে, রাধিকা সাজবে রাধা। মধুকুঞ্জ গুঞ্জরিত রাস উৎসবের আয়োজনে। মণিপুরী নাচের পোশাক তৈরী হয়ে এল রাধার জন্যে। এখন রাত করে-ও আলো জ্বলে তাঁত ঘরে। আলোর নিচে চৌকি পেতে বসে শচী, বিনোদিনী, সুনলিনী ওড়নায় কাঁচের টুকরো বসায়।

রাধার কাজ-ও নেই, ঘুম-ও নেই। মনের খুশীতে অনেক কিছু-ই কিনেছে রাধা। ওড়না কিনেছে একরাশি। সবুজ, লাল, বাসন্তী রঙে ওড়না রঙিয়ে তাতে অভ্রের গুঁড়ো ছিটিয়ে দিয়েছে। মোম দিয়ে পালিশ করে কুঁচিয়ে রেখেছে ওড়নাগুলি। আলনায় সারি সারি সুন্দর করে কুঁচোনো ওড়না চাদরগুলি সাজিয়ে রেখেছে। মেয়েদের নাচের পোশাক প্রস্থে প্রস্থে সাজিয়ে রেখেছে আলমারীতে। এখন আর তার কোন কাজ নেই।

অনেক রাতে ঘুম ভেঙে দেখেছে সাধনের ঘরে-ও বাতি জ্বলে। তার চোখে-ও ঘুম নেই।

উৎসবের দিন যখন কাছে এল, তখন কণ্ঠমণি ডেকে পাঠালেন সাধনকে। তাঁর কথা শুনে অবাক হয়ে গেল সাধন। এবারকার রাসনৃত্যে তাকে সাজতে হবে কৃষ্ণ। নীলমণি অবতীর্ণ হবেন না। যশবন্ত তাকে খবর দিতে এল ঘরে। বলল—নাচতে গিয়ে কেবলই তাল কাটে রাধার, নীলমণির সঙ্গে ও কিছুতে-ই সহজ বোধ করে না। তাই মহারাজের কাছে দরবার করতে এসেছিল। বলছিল তার চেয়ে রাধা সাজুক অন্য মানুষ। তার মুখের দিকে চেয়ে মনের কথাটি বুঝে মহারাজ তোমার নামটি তুললেন। বলিনি তোমায় যে রাস এবার জমবে ভালো ?

মনের খুশীতে সাধনের পায়ে-ই চাপড় মেরে চেঁচিয়ে উঠল যশবন্ত —দাদা রে!

যশবন্তের আনন্দ-উল্লাসগুলো সব সময়েই জান্তব। নিজেই এক পাক নেচে নিল ঘরে। বলল—নেচে নে দাদা প্রাণভরে। তারপর নিয়ে যাব আমার দেশে। দল বানাব।

—ট্রুপ মাষ্টার কে?

—স্বয়ং আমি যশবন্ত হারাবংশী। দিদিকে-ও নিয়ে যাব। বড় মজা হবে।

সুনলিনীর সঙ্গে আজ রাধা-ও এসেছিল বাগানে ফুল তুলতে। যশবন্তের চীৎকার শুনে তাকায়। দুজনেই হেসে চলে যায়।

৪

কার্ত্তিক পূর্ণিমায় মধুকুঞ্জের অঙ্গন উৎসব-সজ্জায় সেজে ওঠে। বিশাল কারুকার্য-খচিত পিতলের রাসছত্রকে সাজিয়েছে ছেলেরা শোলার কদমফুল, শোলার ফুলের মালা, ও চাঁদমালায়। তার নিচে রূপোর রাসমঞ্চে বসেছেন কালাচাঁদ ও রাইকিশোরী। ফুলের মালায় বিগ্রহ ঢেকে গিয়েছে। চক্রাকার এক মণ্ডলী জুড়ে আলপনা ও প্রদীপ।

সুশোভিত এই রাসমণ্ডলীর একপাশে বসেছেন কণ্ঠমণি, নীলমণি, খোলন্দাজ কীর্তনিয়ারা। সাদা কাপড় চাদর, সাদা ফুলের মালা গলায়, কপালে চন্দন।

খোল বোল করতাল সহকারে কণ্ঠমণি সুরু করেন রাসবন্দনার প্রথম গীত—

"শ্রীমন মধু বৃন্দাবন মণিমন্দিরে শোভন
যাঁহা রতন সিংহাসন

তাঁহাপর দুইজন
ললিতাদি সখী সঙ্গে
নানালীলা করি রঙ্গে ॥"

কণ্ঠস্বরে জরার লেশমাত্র নেই। ঈষৎ তীক্ষ্ণ সুরেলা কণ্ঠ। দক্ষ কণ্ঠে সুরটিকে মুঠো করে রেখেছেন। একটু একটু করে খেলাচ্ছেন।

তারপর মাথা নিচু করে মাটিতে স্পর্শ করে সবাই। সমবেত কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয়ে ওঠে :

—জয় বৃন্দাবন দরশন পরশন ধ্যান ধারণ ধন বৃন্দাবন।

কোমল নৃত্যচ্ছন্দে অপরূপ সুষমা বিস্তার করে একঝলক আলোর মতো সহসা প্রবেশ করে রাধা। রাধা নয়—বৃকভানুপুরনন্দিনী শ্রীরাধা। মাথার ওপরে চূড়া-বাঁধা চুল ঘিরে সাদা মসলিনের ওড়না ছড়িয়ে পড়েছে। চূড়া ঘিরে রূপোর গহনা ঝলমল করছে। গলায় শাদা ফুলের মালা। কোমরে রূপোর গহনার বাঁধনের পর নেমেছে সাদায় সবুজে কাজকরা ঘাঘরা। সখীরা শ্রীরাধার পথ করে দেয়। বলে—

"হংস গমনে চলিল কনকবরণী গোরী—
আহা দিব্যরূপে পথ উজলিল
মর্তে এ কি শোভা মরি মরি!"

কৃষ্ণের দিকে চেয়ে ঝিলিক দিয়ে হাসেন শ্রীমতী। সব বিভ্রম হয়ে যায় সাধনের। তারপর ঈষৎ হেসে সে-ও নতজানু হয়। সখীদের হাত থেকে ফুল নিয়ে ছড়িয়ে দেয়। বলে—

"কঠিন পথে কোমল চরণ রাখলে ব্যথা পাব
কুসুম দিয়ে এ পথ আমি কোমল করে যাব।
রাধে ক্ষণিক দাঁড়াও।"

কপালে চন্দন, গলায় ফুল্লমালা, কে এই নওল কিশোর? পরিচয় জানতে চান রাধিকা। গুণ্ঠন আড়াল করে সখীদের বলেন—

"কোন গ্রামে বসতিরে কোন গ্রামে ঘর
আমার কুঞ্জেতে কেন হরিষ অন্তর ॥
কাহার নন্দন তোরা সত্য করি বল
মুখে হেসে বাক্য কহে অন্তরে বিভোল ॥"

সখীরা সাবধান করে শ্রীমতীকে। বলে
"এ সেই নন্দের নন্দন মুরলী বাদন রসরাজ গিরিধারী—"
এর বাঁশীর কথা সখীরা শতমুখে-ও বলতে পারেনা—

"বিষম বাঁশীর কথা কহন না যায়।
ডাক দিয়া কুলবতী বাহির করয় ॥"

তখন কৃষ্ণকে মিনতি করেন শ্রীমতী। তুমি সেই নাচ দেখাও যা দেখে ব্রজের মেয়েরা মুগ্ধ হলো।—

"নাচরে রসিক শ্যামরায়
দেখিতে না পরাণ জুড়ায় ॥
কি মধুর ভঙ্গে মৃদু হাস
যুবতী ধৈরজ ধর্ম নাশ
তা থৈ তা থৈ থৈ থৈয়া
কি মধুর বোল রইয়া রইয়া ॥"

অমনই নেচে ওঠেন কৃষ্ণ।—তাকে দেখে বিভ্রম হয় রাধার—আর সব ভুলে যায় সাধন। দেহমন মাতাল করে জেগে ওঠে ছন্দ। কি শিখেছিল সাধন নীলমণির কাছে? সব ভুলে যায়। নিজেই নিজের নাচের ছন্দ সৃজন করে। স্ব-পরিচয় ভুলে যায় রাধা। ক্ষণকাল দুজনে দুজনের দিকে আত্মবিস্মৃত হয়ে চেয়ে থাকে। বিভ্রম হয়। মনে হয় এ যেন সেই বৃন্দাবন। তারা দুজন রাধা আর কৃষ্ণ। এমনি করে মুখোমুখি তারা অনেক দিন দাঁড়িয়েছে।

গান থেমে গেছে। ঈষৎ হেসে সাধন হাতের মুদ্রায় বলে—

এসো।—দুজনে দুজনকে ঘিরে নাচি। বর্ষাসমাগমে ময়ূর ময়ূরী পরস্পরকে ঘিরে কেমন করে নাচে, দর্শকজন তা দেখেনি।

তবু এই দুজনের যুগল নৃত্যের মধ্যে সেই আনন্দের কিছুটা আভাস পায়। রাধাকে মনে হয় একখানি সাদা মেঘ কিছু তারা জড়িয়ে নেমে এসেছে—এমনই লঘু ও সুকোমল তার পদক্ষেপ। রাধাকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকারে ঘুরে আসে সাধন। প্রত্যেকটি চক্র সম্পূর্ণ হলে পরস্পরকে প্রণতি জানায়। সখীজন মহানন্দে মণ্ডলাকারে ঘিরে ঘিরে নাচে। যুগ্মহৃদয়ের উচ্ছল আনন্দ বুঝি বা সকলকেই স্পর্শ করে। মহাউৎসাহে খোল বাজায় খোলন্দাজ। কীর্তনিয়ারা এই যুগলরূপ বন্দনা করে গায় পূর্ণ আনন্দের গান—

"কালিন্দী পুলিনবনে কুঞ্জবন সাজে
ভাগ্যবতী শ্রীযমুনা॥
পুলিন বন ঝলমল করে॥
কি বা নব রে—নব রে—নব রে—নব রে!
নব বৃন্দাবনে সব নব রে॥"

নব বৃন্দাবন। নব তার রূপ। চিরনবীন প্রেমের এই বন্দনা-গীতি সাধনের মনে এক অপূর্ব আনন্দের উচ্ছ্বাস জাগালো। মনোলোকে উদ্ভাসিত হলো এক নব বৃন্দাবন। মনে হলো যমুনার সেই কল্লোলগীতি সে যেন চিরদিন শুনেছে। যুগল প্রেমের এই অভিষেক গীতি বুঝি সে অনেক আগেও শুনেছিল। নাচতে নাচতে অদ্ভুত কোন নেশা আচ্ছন্ন করলো সাধনকে। মনে হলো সে যেন নাচছে ঢেউয়ের মাথার ফেনার মতো, বাতাসের মুখে ফুলের মতো। তার শরীরে কোন ওজন নেই।

এই গানের ঢেউ কণ্ঠমণির অন্তরকেও প্লাবিত করলো। খোল গলায় ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। চমৎকার সুস্বরে গেয়ে উঠলেন—

"কত চতুরানন মরি মরি জাওত
ন তুয়া আদি অবসানা॥

তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা ॥”

কীর্তনিয়ারা গেয়ে উঠল—‘ন তুয়া আদি অবসানা—ন তুয়া আদি অবসানা—ন তুয়া আদি অবসানা ॥’

রাত দ্বিপ্রহর প্রায়। শরতের মেঘমুক্ত আকাশ উদ্‌ভাসিত করে উঠেছে মস্তো একটা চাঁদ।

ঘরের পাশে দিঘির পাড়ে বসে অপেক্ষা করে সাধন। রাধা আসবে।

গৃহীদের ঘরেও আজ রাসউৎসব। দূর থেকে কীর্তনের বোল নিশীথ নীরবতায় স্পষ্ট শোনা যায়।—কি বা আনন্দ—আনন্দ—আনন্দ রে! কি বা আনন্দ!

মধুকুঞ্জে রাস অঙ্গনে এখন পরিপূর্ণ সভা। দর্শক ও শ্রোতায় ভরে গিয়েছে অঙ্গন। কণ্ঠমণির কণ্ঠ আজ নীরব হতে চাইছে না। প্রেম ও মিলন অধ্যায় শেষ করে ভাবসম্মিলনে পৌঁছে তিনি তালকাণা হয়ে গেছেন। মধুবনে মত্ত ভ্রমরের মতোই পদাবলী-নিকুঞ্জে ঘুরে ঘুরে মরছেন। তাঁর কণ্ঠের বোলটি শুনে শেষ ছত্র ধরে দল গেয়ে উঠছে—

“নয়ন না তিরপিত ভেল ॥
শ্রুতিপথে পরশ না গেল ॥”

এমন একটি রাত—স্বপ্নে তার বাসা। এমন নিবিড় করে তাকে বাস্তবে পাওয়া যায় না। তাই এমন উৎকর্ণ হয়ে বসে আছে সাধন যে, শিশিরটুকু পড়ার শব্দও যেন তার শ্রবণ অতিক্রম করে না যায়।

কি ভাবছ?

চমকে ওঠে সাধন। রাধা এসে বসে পড়ে তার পায়ের কাছে। নতজানু হয়ে ব’সে পদ্মফুলের মতো মুখখানি তুলে ধ’রে আবার প্রশ্ন করে—

কি ভাবছ?

চন্দনের সুন্দর গন্ধ। রাধার পোশাকটি তেমনই আছে। শুধু নতুন মুগার একখানি গরদ পরেছে। মুগ্ধ হয়ে দেখে সাধন। বলে—

—ভাবছি না তো। দেখছি।

কি দেখছ?

রাধার প্রশ্নে প্রণয় প্রকাশ সুস্পষ্ট। সাধন বলে—

—দেখছি—সন্ধেবেলা দেখলাম যাকে তুমিই কি সে? অথবা অন্য কোন মানুষ? নয় তো আমার চেনা পুরোণ মানুষ? রাধা একটু হাসে। বলে—কি রকম লাগল? সাধন গান গেয়ে ওঠে—

—ও মুখ পঙ্কজের মায়ায় গোকুলে পড়েছি বাঁধা—বলো প্রেমের কোন পরিচয় নতুন করে দেবো রাধা! সাধনের হাঁটুতে মাথা রাখে রাধা। বলে—

—আমার এত ভয় করে। কেন বলো ত?

—এত চুপি চুপি লুকোচুরি করে দেখা করা—এ আমার ভালো লাগে না রাধা। কি করেছি বলো? দোষ ত' করিনি কিছু।

—কি করতে চাও?

—চলো চলে যাই কোথাও।

—কোথায়?

—চলো মহারাজকে গিয়ে দুজনে বলি।

—তারপর?

—চলে যাবো যশোবন্তদের দেশ—রাজস্থানে।

—ভয় করে।

—আমার কাছে থেকে-ও? দেখ রাধা, তাকাও।

সাধনের চোখের দিকে চেয়ে ভয় হারায় রাধা। তপ্ত হয়ে ওঠে নিঃশ্বাস। উত্তেজনায় আরক্ত মুখ। সাধনের মনও দুর্বার আকর্ষণে সাড়া দেয়। রাধাকে কাছে টেনে নেয় সে পরুষ বাহুতে। বলে—ভয় পেও না রাধা, ভয় নেই।

ছোট পাখীটির মতোই কাঁপতে কাঁপতে জড়িয়ে আসে রাধা। এতখানি সৌরভ সৌন্দর্য নিয়ে কেউ সাধনের এত কাছে আসেনি। মাতাল হয়ে যায় সে। রাধার চুলে, মুখে হাত বুলিয়ে দিয়ে সে অস্থির হয়ে ওঠে।

—রাধা!

কার ডাকে সেই চমক ভাঙে। সরে আসে রাধা। তাকে খুঁজে বুঝি এখানেই এসে পড়ে সখীরা। সাধন বলে—দাঁড়াও রাধা, ভয় কি! অপরাধ ত' করোনি।

—না, সাধন—না—! ছুটে পালায় রাধা। বাগানের আলো আঁধারির ভেতর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। রসঘন একটি সুন্দর মুহূর্ত রচনা করছিল দু'জন মিলে। রাধা সেটাকে এমন ক'রে ভেঙে দিয়ে গেল? শিল্পীজনোচিত বিরক্তি বোধ করে সাধন। মেয়েদের শিল্পবোধ বড় অ-গভীর মনে হয় তার।

কয়েকদিন কেটে যায় অমনই। একটা ভূতুড়ে অতৃপ্তিতে পেয়েছে সাধনকে। সেই সঙ্গে আলস্যও আছে। যশবন্ত তাকে নিজের দেশে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করছে খুব। সে সব কথাও ভাবছে সাধন। তার এই অন্যমনস্কতা আর খানিকটা আত্মগত ভাবকে রাধা মনে করেছে প্রেম। মনে করে ভালো লেগেছে তার। আবার মানুষটি যে খায়না ভালো করে, সর্বদা-ই ডুবে আছে গোছের ভাব, কথা কইলে চটে উঠছে—তা দেখেও বিব্রত রাধা। ভাবে ভঙ্গীতে কথায় বার্তায় রাধা সাধনকে বুঝতে দিয়েছে, যে সাধনের মনোভাব খুব বুঝতে পারছে রাধা—তবু তার করার কিছু নেই।

প্রেমে পড়েছি, এখন সামনে আমার অনেক বাধা, এমনিভাবে ভাবতে ভালোবাসে মেয়েরা।

"নাই দরশসুখ বিধি কৈলে বাদ
অঙ্কুরে ভাঙল বিনি অপরাধ—"

এ সব কথা নইলে বলা কওয়া যায় না।

সাধন তখন আর যা-ই হোক রাধার কথা ভাবছে না। অন্তুতঃ একান্ত করে তা-ই শুধু ভাবছে না। অন্য হাজারটা কথা ভাবছে, আর সে-ই সঙ্গে মনে হচ্ছে বড় বালিকা রাধা, বড় অপরিণত।

এদিকে রাধা বুঝল রাগ করেছে সাধন। তাই দুপুরবেলা এল কাঁচের চুড়ি বাজাতে বাজাতে—চুল খুলে দিয়ে। কালো পাড়ের শাড়ী পরে। বলল—কার কথা ভাবছ সাধন?

উঠল না সাধন। বিছানায় শুয়ে শুয়েই পাশ ফিরে তাকাল। কথা কইল না।

অস্বস্তি বোধ ক'রে মোড়া টেনে বসল রাধা। সাধন বলল—

—এসেছ যে? কেউ যদি জানতে পারে?

—জানলে-ই বা—

—না রাধা তোমার অত সাহস দেখিয়ে কাজ নেই।

খুব রাগ হলো রাধার। বললো—তুমি ভাবছ আমি একেবারে ছেলেমানুষ, তাই না? ভয় পাবার কথা বলছো কেন?

সাধন বলল—বসো। চটে যেও না। মন মেজাজ ভাল নেই রাধা। কিছু ভাল লাগছে না।

—কি করতে পারি বল?

—কিছুই করতে পারো না। সেই তো আমার দুঃখ।

রাধা একটু আহত হলো বুঝি। তারপর বললো—যদি সুযোগ দিতে তাহ'লে হয়তো কিছু করতাম সাধন। কিন্তু তুমি এমন করো!

—কি করি?

—নিজেকে তুমি বড্ড ভালবাসো সাধন। আর কারুকে দেখতে পাওনা চোখে।

সাধন বুঝল মনঃক্ষুণ্ন হয়েছে রাধা। বলল—রাগ করোনা রাধা। তোমাকে আমি মোটেই আঘাত করতে চাইনি। এমনিই বলেছিলাম;

—সাধন তুমি আমায় আঘাত করো না।

—তোমার খারাপ লাগে রাধা? দুঃখ হয়?

—সাধন কিছু বোঝনা।

চলে গেল রাধা। যেতে যেতে আঁচলের প্রান্তে চোখ একটু মুছে নিল। অবাক হয়ে রইল সাধন। তার রূঢ় কথায় যে রাধার মনে লাগে এ যেন একটা নতুন কথা। এ কথা সে জানত না।

সেদিন অনেক রাতে। চারিপাশ নিশুতি। হিম হিম বাতাস। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচাঁদ। স্বল্প জ্যোৎস্না। এমন চাঁদ যেন আঁধার বাড়াবার জন্যেই ওঠে। অভ্যাস মতো দোর খুলে ঘুমোচ্ছিল সাধন। ঘুম ভাঙে কার লঘু উষ্ণ করস্পর্শে। সাধন!—সাধন! তাকে চাপা গলায় ডাকছে রাধা। চমকে উঠে বসে সাধন। রাধা তাকে ডাকছে? উত্তেজনায় স্বেদাক্ত কপাল রাধার। চুলগুলি কপালে লেপটে আছে। ঘনঘন নিশ্বাস। এ কি দুঃসাহস রাধার?

রাধার মুখের দিকে চেয়ে সাধনের বুঝতে বাকি থাকেনা কিছু বুঝে বা ভেবে দেখবার শক্তি তখন রাধার নেই। বড় মমতা হয় তার তখন। একান্ত করে তারই জন্যে রাধা লাজলজ্জার কথা ভুলে এমন করে এসে দাঁড়িয়েছে। বলে—রাধা!

রাধা নিচু হয়ে দুই হাতে সাধনের হাত চেপে ধরে। বলে—সাধন! কেউ যেন জানেনা আমি এসেছি।

—ঘরে চলে যাও রাধা।

—তুমি তাড়িয়ে দিচ্ছ আমাকে?

—তোমাকে বাঁচিয়ে দিচ্ছি রাধা। কেউ জানেনা এখনো—চলে যাও তুমি। ছি, রাধা—এমন পাগলামি কখনো করে?

—সে কি কথা সাধন?

—আমি চোর নই রাধা—এমন লুকোচুরি করতে আমার রুচিতে বাধে। তা ছাড়া—

—তা ছাড়া কি ?—যন্ত্রণার সুর রাধার গলায়। রাধার চোখের দিকে চেয়ে সাধন অনায়াসে মিথ্যা কথা বলে—তোমাকে ত' আমি ভালবাসিনি রাধা! তোমার নাচটাকে ভালোবেসেছি কিন্তু তাই বলে তোমাকে—

—আমাকে তুমি নিয়ে চলো সাধন।

—আমার সঙ্গে কোথায় যাবে তুমি ? বে-পরোয়া বিশ্রী যাযাবর জীবন আমার—তার মধ্যে তুমি কি করবে ?

—পারব আমি সাধন—পারব।

—আমার ভালো লাগবেনা। আমি সহ্য করতে পারব না। তুমি আমাকে চেন না রাধা—

—তখন আমাকে সহ্য করতে পারবেনা তুমি ?

—সংসারের কিছু জানোনা তুমি রাধা—চলে যাও।

—রাধা কাঁদে। সান্ত্বনা দেয় সাধন। বলে—

—আমি এমনিতে-ই চলে যাব ঠিক করেছিলাম। তা-ই যাব। দেখো তখন আপনা থেকেই বুঝবে তুমি। যে উৎপাত করে গেলাম তোমার জীবনে তা-ও তুমি ভুলে যাবে রাধা।

—সে কথা থাক সাধন!

বেদনাহত রাধার কণ্ঠ। তবু তার কথা গায়ে মাখেনা সাধন। গভীর স্নেহে বলে—রাধা কত সুন্দর তুমি, কত ভালো। কত গুণ আছে তোমার—কেন তুমি এমন করে আমার মতো একটা হতভাগার সঙ্গে জীবন জড়াবে ? কি ভাগ্য করে এসেছি আমি বলো যে তোমাকে পাব ? আমার আছে-ই বা কি ?

চোখের কাজল কলঙ্করেখায় গলে নামে দুগাল বয়ে রাধার। সাধন বলে—নাচকে ভালবাসো রাধা। নাচটাকে ভালবাসলে কত আনন্দ পাওয়া যায়। মানুষ কি তা দিতে পারে ?

উঠে দাঁড়ায় রাধা। সাধন বলে—

—কেউ জানবে না। ভয় পেয়োনা—চলে যাও।

—তুমি বড় নিষ্ঠুর সাধন !—এই শেষ কথা বলে চলে যায় রাধা।

এতক্ষণে দেশলাইটা খুঁজে ল্যাম্পটা জ্বালে সাধন। বিছানায় বসেই সিগারেট ধরায় একটা। ঘেমে গেছে সে-ও। উত্তেজনা তার-ও কম হয়নি।

ঘরে ঢোকেন কণ্ঠমণি বড়ঠাকুর স্বয়ং।

এ রাত বুঝি শুধু অবাক হবার রাত। সাধন তবু ভয় পায় না। বিস্মিত হয়। বলে—আপনি !

কণ্ঠমণির চোখে সমবেদনা। ল্যাম্পের আলোতে মুখের রেখাগুলো ধরা পড়ে। বুড়ো হয়ে গেছেন তিনি। অসহায় দেখাচ্ছে তাঁকে। বলেন—

—কথা আছে সাধন।

সাধনের মুখে বিচিত্র একটা হাসি ফুটে ওঠে। এক কথায় সে পরিষ্কার করে দিতে পারে কণ্ঠমণির মনের মেঘ। কণ্ঠমণি যে তাকে ভুল বুঝবেন না সে বিশ্বাস তার আছে। মানুষটা যে সাঁচ্চা তাতে তার এতটুকু সন্দেহ নেই। তবু কিছু বলে না সাধন। রাধাকে কলঙ্কিনী করে না। বলে—

—বলুন

—আমার আশ্রমের একটা শুচিতা আছে সাধন।

—আমি তা নষ্ট করবো না মহারাজ। আমি চলে যাচ্ছি।

—চলে যাচ্ছো ?

—হ্যাঁ। একলাই যাচ্ছি।

সাধনের নির্ভীক দৃষ্টির সামনে কেমন যেন ছোট হয়ে যান কণ্ঠমণি। তারপর বন্ধুর মতো পাশে বসেন। বলেন—তা-ই ভাল সাধন। এ রকম যে হবেই তা আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল। তোমাকে কি দোষ দেব বল ?

অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে সাধন। বলে—অনেক কথা বলবার কিছু

নেই। দোষগুণের কথা নয়। আমার ভালো লাগছেনা এখানে। আর আমি চলে গেলে আপনার পক্ষেও সুবিধে হবে।

—তাই ভাল সাধন, তাই ভাল।—খুব যেন আশ্বস্ত হয়েছেন কণ্ঠমণি এমনই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। বলেন—আমার বয়স হয়েছে, ভরসা পাইনা। দুর্বল বোধ করি। মানুষের কাছে অনেক কথা বলার দায় থেকে তুমি আমায় বাঁচিয়ে দিলে। তাই ভাল সাধন!

তারপর তার কাঁধে হাত রেখে বলেন—কি জান সাধন, বিশ্বাস করবে কি না জানি না—তোমাকে দেখে আমার হিংসে হলো। বড্ড হিংসে হলো। তুমি তরুণ, তুমি ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে পারো। তোমার গায়ে লাগেনা। আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি সাধন—এখন ত' আর বে-হিসেবী হতে পারবনা ভাই। তোমাকে দেখে আমার হিংসে হলো।

মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল সাধন। মানুষটার অন্তরের পরিচয় পেয়ে ভালো লাগল তার। এতটুকু শত্রু মনে হলো না কণ্ঠমণিকে।

ক্ষণিকের আত্মবিস্মরণ সামলে নিলেন কণ্ঠমণি। আবার সহজ ও স্বাভাবিক কণ্ঠে ঈষৎ হেসে বললেন—বয়স হলে নিজের অমূল্য অভিজ্ঞতাগুলো অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে বড়ই ভালো লাগে সাধন—হয়তো সেই জন্যই বলছি—আত্মকণ্ডূয়ন ছাড়া কিছুই নয়। তবু—!

—বলুন!

—কি জানো—একথা একদিন আমার গুরু বলেছিলেন—আমি তখন বুঝিনি, আজ বুঝি। এই যে তুমি এসেছিলে। এই যে আবার চলে যাচ্ছো! কোথায় যাবে, কি করবে, জানিনে ত'। এই যে মানুষ আসে যায়, অস্থির হয়ে বেরিয়ে পড়ে, এটা কি! এখন হয় তো মনে করছো যে তোমার এই অস্থিরতার কারণ হচ্ছে কোন বিশেষ মানুষ। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক তা নয় সাধন। এ হচ্ছে একটা মহা পিপাসা—যার তৃপ্তি নেই। এ পিপাসার স্বাদ যে

জেনেছে সে মহাভাগ্যবান মানুষ সাধন, এ আমি তোমায় হলফ ক'রে বলতে পারি। এ পিপাসার নিবৃত্তি নেই। নিবৃত্তি নেই বলে-ই খোঁজার-ও শেষ নেই। কোথায় পাব, কোথায় শান্তি আছে, এ-ই মনে করে মানুষ ছুটে বেড়াচ্ছে। তাই তুমি জানবে—এ বড় দামী কথা সাধন,—

"কত চতুরানন মরি মরি জাওত
ন তুয়া আদি অবসানা
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা॥"

…ঐ আদি অবসান না থাকবার কথাটা বড় দামী সাধন।

কথা বলতে বলতে চোখে জল এসে পড়ে কণ্ঠমণির। ভুরু কুঁচকে গলা পরিষ্কার ক'রে একটু কেসে উঠে পড়েন। চলে যান দোর খুলে।

আর একটা সিগারেট ধরায় সাধন। ঘুমের দফাটি ঠাণ্ডা করে দিয়ে গেলেন মহারাজ। মেজাজ ক্ষেপিয়ে দিয়ে গেলেন। এখন মেজাজের গোড়ায় ধোঁয়া লাগানো ছাড়া গত্যন্তর কি।

যশবন্তের সঙ্গে যাবার আয়োজন করতে একটা দিন কেটে গেল। একদিন বাদ দিয়ে পরদিন সকালে রওনা হলো সাধন। যাবার আগে কতবার যে উৎসুক নয়ন খুঁজল রাধাকে। রাধার দেখা পেলনা। নিজেকে লুকিয়ে নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে রাধা। যাবার সময় বন্ধ দরজার কাছ থেকে ফিরে গেল সাধন নিরাশ হয়ে। দেখা হলো না।

দরজার অন্যদিকে মেঝের ওপর বসে আকুল হয়ে কাঁদছে তখন রাধা। যৌবনের প্রথম উন্মেষের সময়ে মনে জেগেছিল নিষ্পাপ একটি প্রেমের অংকুর। সেখানেই ঘা খেয়েছে রাধা। সাধনকে মুখ দেখাতে চায়না সে। তবু মন তার কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে। এ কথা কেমন করে সে অস্বীকার করে যে সাধন বন্ধুর মতোই কাজ করেছে?

সে যে উপযাচিকা হয়ে গিয়েছিল—সে কথা কারুকে বলেনি সাধন। রাধার সবটুকু কলঙ্ক নিজের মাথায় তুলে নিয়ে চলে গিয়েছে সাধন, এ কথা রাধা কেমন করে ভোলে ?

রাধা ভুলতে চায় না। যদি সে খাঁটি হয়ে থাকে, তার মধ্যে কোন পাপ না থাকে, তবে রাধা-ও শিল্পী হয়ে উঠতে চেষ্টা করবে। সেখানে সে যদি নিজের সার্থকতা খুঁজে পায়, তবে একদিন সে খুঁজে বের করবে-ই সাধনকে। বন্ধুর মতো ধন্যবাদ জানাতে যাবে। শিল্পীর মতো দোসর প্রাণের সন্ধানে যাবে। নতুন করে আলাপ পরিচয় হবে তাদের।

সেদিন এখনো দূরে। তাই এখন কাঁদুক রাধা। একলা ঘরে দোর বন্ধ করে। বিনা সান্ত্বনায়। এ কান্নারও মূল্য আছে। দুঃখের দাম না দিলে কি করে হৃদয় গভীর হবে ?—অনেক গভীর হবে হৃদয়, অনেক দুঃখ সইবে, সে জন্যে প্রয়োজন আছে এই অশ্রুপাতের।



যশবন্তের গ্রাম গঢ়িয়া সীতমপুর, জয়পুরের উত্তরে। একদা সুদূর মধ্যযুগে মানুষ বাস কোরত গ্রামের চারদিকে পাঁচিল তুলে। কালের প্রকোপে মরুভূমি থেকে বালি উড়িয়ে আনল ঝড়। সেই বালিতে গ্রাস কোরল গ্রাম। গ্রামের ধ্বংসস্তূপ হচ্ছে গঢ়িয়া। গঢ়িয়া-সীতমপুর কথার মানে হলো একদিনের সমৃদ্ধ গ্রাম সীতমপুর গঢ়িয়ায় পর্যবসিত হয়েছে। নতুন গ্রাম গড়ে উঠেছে সেদিনের ধ্বংসস্তূপের পাশ দিয়ে।

মরুর দেশ রাজস্থান। জল এখানে একটা দুর্লভ জিনিষ। তবু সীতমনদীর জন্যে এ গ্রামে কিছুটা শ্যামলের আভাস মেলে। গঢ়িয়া

ঘিরে উঠেছে সুবৃহৎ কয়েকটা নিমগাছ। বালির বিস্তীর্ণ চড়ার বুকে সীতম নদীর ক্ষীণ ধারা বয়ে গিয়েছে। শীত গ্রীষ্মের টানের সময়েও সে নদীতে কিছু জল থাকে। সামান্য হলেও জল। তৃষ্ণার শান্তি। ভেজাবালি খুঁড়লে-ও যে জল ওঠে তাতে কলসী ভরা চলে।

সেই জল নিয়েই রাজস্থানের ভ্রাম্যমাণ উপজাতির মেয়েগুলির মাতামাতির শেষ নেই। ঠিক দুপুরবেলা তারা মুখ-লম্বা কুঁজো নিয়ে জল ভরতে আসবে। নিত্যস্নানে তারা অনভ্যস্ত। তবু পরস্পরের গায়ে জল ছিটিয়ে খেলা করতে ক্লান্তি নেই।

বৃষ্টির অভাবে মরু হয়েছে রাজস্থান। তাই রাজস্থানের অনেক মানুষই যুগযুগ ধরে ভ্রাম্যমাণের জীবন যাপন কোরছে। নৃত্যগীত কুশল নিপুণশিল্পী বাঞ্জারা, লম্বাডি, গাঢ়িয়া, সোনার, লোহার, ছুতার এমনি আরো কত জাতি। উটের পিঠে বা উটের গাড়ী চড়ে তারা এখান থেকে ওখানে ফেরে। চূড়ান্ত অনাবৃষ্টির সময়ে কখনো হায়দ্রাবাদ বা গুজরাটেও চলে যায়। বড় বন্ধনমুক্ত এদের জীবন। আজ যেখানে রান্না করল, খেল, রাত কাটাল, কাল সকালে সে জায়গা অনায়াসে ছেড়ে তারা চলে যেতে পারে অন্যত্র। এদের সংসার আছে, সংসারের সব কাজই আছে। শুধু যাযাবর বলে গৃহীর সংসার যাপনের গ্লানি ও অভ্যাস এদের স্পর্শ করেনি। পথের পাশে বসে পড়ে স্বচ্ছন্দে এরা রান্না চাপিয়ে দিয়ে উকুন বাছতে বসে। ছেলেকে দুধ খাওয়াতে খাওয়াতে মা পথচারীর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। কলস্বরে সুখদুঃখের কথা কয়ে নেয়।

এদের ধরণধারণ দেখে সাধনের মনে হয় তার স্বদেশের জলবেদের কথা। এরাও তাদের মতোই ছড়িয়ে পড়ে গ্রামের মধ্যে। পুরুষরা এদের দেখে চ্যাঁচামেচি করে। সাবধান না হলে এরা গেরস্তকে লুঠ করে সব নিয়ে তুলবে তাঁবুতে। বাজরার আটা, কাপড়, লবণ, দড়ি রশী থেকে শুরু করে দই মথবার ঘোলকাঠিখানা পর্যন্ত এদের দরকার।

তবু অন্দরে ডাক পড়ে এদের। গিন্নী ঘান্নীরা দরদস্তুর করে কারুকাজ করিয়ে নেন জামা, কাপড়, চাদরে। রঙীন দড়ির শিকে বুনিয়ে নেন বছরের মতো। বিয়ের কনের জামাকাপড়ে এরা রঙীন সুতোয় ফুল ফুটিয়ে দিয়ে যায়।

লোহারদের কথা স্বতন্ত্র। তাদের ছাড়া গ্রামবাসীর চলে না। দরজা জানলার শিকল কড়া থেকে শুরু করে ঘোড়ার পায়ের নাল, ঘরসংসারের জিনিষ লোহারকে ডেকে সব বুঝিয়ে দেয়। তামাক পোড়ে দিনরাত। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে কথাবার্তা চলে জোর গলায়।

বাঞ্জারা ও লম্বাডিরা জাতবেদে। বাঁধাকাজ, জমিচাষ এসব ওদের ভালো লাগে না।

তাদের যাযাবর জীবনে রয়েছে অসাধারণ বর্ণ ও বৈচিত্র্য। উষর মরুর দেশের মানুষ তারা। রঙের যতটুকু অভাব দৃশ্যমান প্রকৃতির মধ্যে আছে, সবটুকু তারা পুরিয়ে নিয়েছে তাদের পোষাকে। রঙের কোন অভাব নেই। তামাটে লাল, নীল বা গাঢ় লাল ঘাগরার প্রান্তে হলুদ, জর্দা, সবুজ ও কালো রঙের পাখী বসানো। পুরোহাতা জামার গলা ও পিঠে নানা রঙের বাহার। জামার হাতার ওপর দিয়ে কনুয়ের উপর ঠেলে তুলে বসানো রূপোর গহনা। গলায় রঙীন কাঠের পুঁতির মালার মাঝে মাঝে পিতল রূপোর চাকতি। কত মন্ত্রই না লেখা আছে এই চাকতিতে তার ঠিক ঠিকানা নেই। পায়ে কাঁসার মল ও নাগরা। কানে টানা দেওয়া ঢেঁড়ি ও আংটা।

এই ভ্রাম্যমাণ দলটি শীতের মুখে তাঁবু ফেলেছে এখানে। সেই থেকে এদের আকর্ষণে বাঁধা পড়েছে সাধন।

যশবন্ত তাকে দেখে আর হাসে। তার সুবিস্তীর্ণ ক্ষেতী, অনেক মোষ—সম্পন্ন অবস্থা। শ্বশুরের যতো টাকা সে-ই পাবে। এখানে আসবার পর তার মাথায় চেপেছে ক্ষেতী করবার নেশা। তার ক্ষেতীতে চাষ করিয়ে তরি তরকারী পাঠাবে জয়পুরের বাজারে।

সুবিধে হ'লে দুধ চালান দেবে শহরে। যশবন্তের বাবা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন জয়পুর এমন কি বড় বাজার, যে তার ভরসায় এমনি ধারা ব্যবসা ফেঁদে বসবে যশবন্ত? কিন্তু যশবন্তকে নিবৃত্ত করা সোজা নয়। আজকে হয়তো মার্কেট নেই। কিন্তু কালই যে হবেনা মার্কেট, কে তা বলতে পারে। যশবন্তের বাবা ভেবেছেন—যা হয় করুক গে। খারাপ ত কিছু করছে না। ঘর ছেড়ে সেই কোন সুদূর বাংলাদেশে গিয়ে কাটিয়ে এল কটা বছর। তারচেয়ে নিজের খেয়াল খুসী নিয়ে ঘরেই থাকুক যশবন্ত। তিনি তাতেই খুসী।

বেশী কিছু বললে যশবন্ত চ্যাঁচাতে শুরু করে। দেখে আর হাসে সাধন।

তিড়বিড়ে মানুষ যশবন্ত। খাকী সার্ট প্যাণ্ট পরে নিজের সাতকেলে পুরোন ভাঙা একটা ফোর্ড চড়ে বেড়ায়। সে গাড়ীটা স্টার্ট দিলে মোষগুলো ক্ষেপে ওঠে, ক্ষেতী কাজের বেতো ঘোড়াগুলো খট্‌মট্ করে ছুটে বেড়ায়—এমনই তর্জন গর্জন গাড়ীটার। সাধন তার নাম দিয়েছে—পক্ষীরাজ। সম্প্রতি মালচালান দেবার লরী কিনবে বলে যশবন্ত ক্ষেপে উঠেছে।

সাধনকে যশবন্ত কিন্তু সত্যিই ভালোবাসে। বৌ শ্বশুর বাড়ীতে বড় হচ্ছে। তাই সাধনের প্রতি এখনও সে অখণ্ড মনোযোগ দিতে পারছে। সারাদিন বাদে উঠোনে চারপাই ফেলে দুজনের গল্পসল্প হয়। যশবন্ত বারবার প্রতিশ্রুতি আদায় করে কখনো ছেড়ে যাবে না সাধন। চাষবাস ক্ষেত সম্বলিত গতানুগতিক জীবন যাত্রার কোন মানেই খুঁজে পায় না সাধন। সেখানে সে কোন আকর্ষণ পায়নি। তার আকর্ষণের উৎস যে অন্যত্র, সেকথা বলে ঠাট্টা তামাসা করে বটে যশবন্ত, কিন্তু সে কথা মিথ্যে। বাঞ্জারাদের মেয়ে রুক্মিণীর প্রতি তার সত্যিই কোন আকর্ষণ নেই। দুটো সহজ সরল মানুষের মধ্যে যে রকম সহজ বন্ধুত্বের ভাব থাকতে পারে তার বেশী কিছু নয়। প্রতিবাদ করেনা সাধন। প্রতিবাদ করতে হলে যশবন্তের চেয়ে অনেক

জোর গলায় করতে হয়—অতখানি হৈ চৈ করা সাধনের স্বভাব বিরুদ্ধ।

রুক্মিণীর দীর্ঘদেহে যে ছন্দটা আছে তার উৎস শক্তি। রোদে পোড়া তামাটে দেহ। ঘন কালো ভুরু আর চোখ। রুক্মিণীর বাপ তাকে বারবার শাসিয়েছে—সাধনের মৎলব খারাপ। ওরা কখনো আমাদের সঙ্গে মেশে না। এখন যখন এত ঘোরাফেরা করছে—রুক্মিণী যেন সাবধান থাকে।

বাপের কথা শুনে রুক্মিণী হেসে-ই খুন। সাধনের সম্পর্কে সে সাবধান হবে? তার হাতে শক্তি নেই?

উটের গাড়ীর ছাউনি বাঁধছিল রুক্মিণী। সাধনকে বলল—মিছেই তুমি বাবাকে বিড়ি সিগারেট খাওয়াচ্ছ। বাবা বড় টেটিহা। তোমাকে বাজিয়ে নিচ্ছে। তোমার মৎলব ফিকির জানতে চাচ্ছে।

—কি মৎলব?

—যদি মেয়ের সঙ্গে কিছু লাগ্‌ভাগ্‌ করো।

—তোমার সঙ্গে?

রশির পাক দিতে দিতে হেসে গড়িয়ে গেল রুক্মিণী। বলল—ভয় পেয়ে গেলে শহরওয়ালা বাবু?

আসলে সাধন-ও সতর্ক আছে। এদের মধ্যে চোরাই মদ চোলাইয়ের কারবার খুব চলে। খুনজখম বিষয়ে-ও এরা উদার। প্রতিহিংসা নেবার জন্যে বা সামান্য অপরাধের শাস্তি বিধান করবার জন্যে এরা সহজেই খুন করে বসে। পুলিশের সামনে সমস্ত দলটাই বেয়াড়া রকম চুপচাপ থাকে। স্বভাবতঃই বাইরের মানুষ সম্পর্কে এরা অত্যন্ত সতর্ক। এদের সঙ্গে মেলামেশার সময়ে অদৃশ্য একটা সীমারেখা সর্বদাই মেনে চলে সাধন।

একদিন রুক্মিণী খবর নিয়ে এল। যশবন্তের বাবার ভয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে নয়। বেশ জানান দিয়ে। হৈ চৈ করে সাধনের ঘরে উঠে এল। মুখ আধ ঘোমটায় ঢেকে বসল মেঝেতে। বলল—

—বাবুজী, আমাদের নাচগান দেখতে ভারী শখ হয়েছিল তোমার? বাবা ডেকেছে আজ রাতে। মদ খেতে হবে কিন্তু, পারবে ত?

—কেন পারব না?

—দেখা যাবে। বলে রুক্মিণী উঠে গেল।

পুরোন গড়িয়ার নিচে বয়ে গিয়েছে সীতম। সীতমের তীরে পাথরের বেলাভূমি। ওপাশে তার মস্তো নিমগাছ উঠেছে। সেখানে উটগুলো ছাড়া রয়েছে। ছাউনী নামানো। সেখানে-ই বসে সাধন। মাঝখানে আগুনের ধুনী জ্বালিয়ে বসেছে বাঞ্জারা মেয়ে ও পুরুষ। ফেনিল মদ ফিরছে হাতে হাতে, কাঠের বাটিতে। আগুনের ধিকি ধিকি শিখায় কালো কালো চোখগুলি অদ্ভুত দেখাচ্ছে। সাধনের হাতে-ও একটা বাটি পৌছলো। এক চুমুকে তীব্র টক ও ঝাঁজালো পানীয়টা পেটের মধ্যে চালান করে দিয়ে সোজা হয়ে বসল সে। শরীরটা জ্বলে গেল। জ্বালার সঙ্গে সঙ্গে এল উত্তেজনা। তাকে চোখ কুঁচকে দেখে পুরুষরা। —কি বাবুজী লট্‌কে গেলে? ব'লে হাসে রুক্মিণী। পূর্ণিমার চাঁদ উঠছে সবে। তাকে পেছনে রেখে দাঁড়িয়ে রুক্মিণীর বাবা দুই হাতে তুলে ধরে এক চুমুকে বাটির পর বাটি মদ খায়। জোয়ানদের দেখেশুনে তাক লেগে যায়। তারিফ ওঠে।

এবার মেয়েরা গিয়ে দাঁড়ায়। অর্ধচন্দ্রাকারে একসার মেয়ে দাঁড়ায়। তাদের সামনে দাঁড়ায় একসার ছেলে। বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়। শুরু হয় নাচ।

মদ খেয়ে চোখে নেমেছে আবেশ। সেই চোখে দেখছে সাধন। দিনের বেলা যে সব মেয়ে বৌদের দেখেছে সাধন গাঁয়ের পথে পথে ঘুরতে, বা ধূলি ধূসর পোষাক পরে বসে অলস জটলা করতে, এখন তারাই চাঁদের আলোয় বয়স, কাল, সময় হারিয়ে হয়েছে 'ব্রিজ্‌ললনা'। ছোট ছোট গালার কাজ করা রঙিন লাঠির আগায় জরির থোপ্‌না

বাঁধা। তা-ই হাতে ধরে মেয়েরা ব্রজের পুরুষদের মনে মোহবিস্তার করে দেমাক দেখিয়ে একপাক নেচে আসে। পুরুষরা অবিচলিত দাঁড়িয়ে থাকে। তখন দাঁড়িয়ে মেয়েরা টিট্‌কিরী দেয় ছেলেদের—

"কদম কি ছৈয়াঁ
গাগর ভরণ কো জয়োঁ"—

কদমের ছায়াতেই গাগরী ভরতে যাব। ব্রজে কৃষ্ণ বিনা পুরুষ নেই। পুরুষরা মেয়েদের টিট্‌কিরী শুনে পরস্পরের কাঁধে হাত দিয়ে হেসে লুটিয়ে পড়ে। বলে—

"কদম কি ছৈয়াঁ
গাব চরবন জয়েঁ
ন ব্রিজ নার বিন রাধা ॥"

কদমের ছায়াতেই গাই চরাতে গেলে পারতাম। ব্রজে রাধা বিনা মেয়ে নেই!

মেয়েরা বলে—চল সখী চলে যাই। ময়ূরের মতো কর্কশ ধ্বনিতে কথা বলছে এরা। কিন্তু পুরুষরা তাদের পথ বন্ধ করে দাঁড়ায়। বলে—কোথায় যাবে গোরী? পথ নেই।

পথ বন্ধ দেখে মেয়েরা প্রথমে রাগ করে। পরে মিনতি করে বলে—সন্ধ্যা হলো। চাঁদ উঠেছে। এবার পথ ছেড়ে দাও। ছেলেরা বলে—তবে একবার একসাথে নেচে যাও।

মিলন ও আনন্দের নৃত্য কলরোল ওঠে সমবেত সংগীতে সবাই বলে—ওঠো ওঠো চাঁদ তুমি অভিমান ত্যাগ করে ভাল করে ওঠো। তুমি এমন করে ওঠ, যে দেখে যেন পাপিয়া মাতাল হয়

"উজো রী চন্দোলিয়া উজো রী ॥"

গানের বোল ধরে মেয়েরা মাতাল হয়ে নাচে। নাচের তালে তালে গুণ্ঠন এসে পড়ে মুখে। কৌতুকে পুরুষরা খুলে ধরে গুণ্ঠন। বলে,—'দেখ চাঁদ ভালো করে দেখ।'

নাচের তালে তালে গতি হয় দ্রুত। ঢোল নিয়ে বৃত্তের পাশে

পাশে নাচে বাদক। পুরুষদের কোমরের রঙিন মোটা সুতোর থোপনা উড়ে পড়ে। মেয়েদের ওড়না ফুলে ফুলে ওঠে। কারো বেণী ঘুরে ঘুরে যায়। পরিবেশ দেখে মেতে ওঠে সাধন-ও। খুব ভালো লাগে তার।

নাচের ঘূর্ণি ও গানের তাল ধীরে ধীরে কমে আসে। হাসতে হাসতে স্বেদাক্ত ললাট ও কপোলে ছেলে মেয়েরা এসে বসে। ক্লান্ত হয়েছে তারা। মদ চাই।

এতক্ষণে মনে পড়ে। সাধন পকেট থেকে পনেরোটা সিগারেটের প্যাকেট বের করে মাঝখানে রাখে। রসিয়ে রসিয়ে ধোঁয়া টানে সবাই। রুক্মিণীর বাবা বলে—বাবু!

—আমি তোমার গোলাম উধবজী—যা দেখালে আর শোনালে।

হেসে গড়িয়ে পড়ে রুক্মিণী। বলে,—

—বাবুর নেশা হয়েছে। আমার বাবা সহরওয়ালা বাবু দিয়ে কি করবে?

সকলেই হাসে। দুই হাতে কাঠের গামলা বয়ে আনে দুই জোয়ান। তাতে ডুবিয়ে তুলে ধরে কাঠের পেয়ালা।

অপেক্ষা করবার সময় নেই বাঞ্জারাদের। তারা ডেরা তুলে রওয়ানা দেবে। খবর দিতে আসে রুক্মিণী। যশবন্তদের বাড়ীর বাইরে একটা বৃহৎ ইঁদারা আছে। উটের সাহায্যে তা থেকে জল তুলে ক্ষেতে ঢালা হয়। ইঁদারার জল গড়িয়ে পড়ে মাটি সেখানে ভিজে। সেই মাটিতে যে নিমগাছটা উঠেছে, এখন প্রথম ফাল্গুনের উত্তাপে তাতে ফুল এসেছে। সাদা ফুলের গন্ধ ছড়াচ্ছে তপ্ত বাতাসে। রুক্ষ বাতাসের দিন। বালির ওপর রোদের বেলায় তাতপ্রহরে বাতাস কাঁপার দিন। রক্তে দোলা লেগে মন বিবাগী হবার দিন।

নিমগাছের তলায় ছায়াখানি যেন শ্যামল সৌরভ মাখা। সেখানে পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে সাধনকে রুক্মিণী বলে,—

—আমরা কাল চলে যাচ্ছি।

—কোথায়?

—এখান থেকে দশমাইল দূরে। সীতম সেখানে জল দেয় বেশী। গ্রামও ভালো। খরার সময়ে আমরা সেখানেই থাকি। তুমি আসবে বাবুজী? আমাদের মতো অন্ততঃ দশটা দল সেখানে আছে।

মরুভূমির বেদেনী। তবু সে মেয়ে। রুক্মিণীর চোখে ফুটে ওঠে অনুনয়। তারা দুজনে ছাড়া এতখানি ধূ ধূ বিস্তৃতিতে আর কেউ নেই। মুখে অবাধ্য হাসি অথচ চোখে অনুনয় নিয়ে রুক্মিণী এগিয়ে এল। বলল,—

—বাবুজী যেয়ো। ভুল না।

এমনি অনুনয় তাকে আরো কেউ করেছিল নাকি? অন্য ভাষায়, অন্য দেশে, অন্য মেয়ে? রাধার অশ্রুলাঞ্ছিত মুখখানি মনে পড়লো সাধনের। এ-ও এক অদ্ভুত বিধান, যে এতটুকু সাড়া দেবার অধিকারী নয় সাধন। রুক্মিণীর চোখের দিকে তাকিয়ে সে বল্‌ল,—

—রুক্মিণী তামার দেরী হয়ে যাচ্ছে। যাব আমি। কথা দিচ্ছি। তুমি এখন যাও।

চোখের কূলে কূলে বন্যকৌতুকের নিঃশব্দ হাসি আবার ভাঙতে লাগল। রুক্মিণী বললে,—

—যেয়ো। ভুল না কিন্তু।

ছুটে পালাল রুক্মিণী। রাধার কথা আজই সাধনের হঠাৎ আবার মনে হলো। একবছর হলো ছেড়ে এসেছে কণ্ঠমণির আশ্রম। কোথায় আছে রাধা,—এখনো সেখানেই আছে নাকি—আজ এসব কথা জানতে হঠাৎ ইচ্ছে হলো তার। মনে পড়লো রাধার সুন্দর নৃত্যছন্দ। বড় সুন্দর নেচেছিল রাধা সেই রাস উৎসবের

সন্ধ্যায়। আজ কাছে যদি থাকতো রাধা। বৃথা কল্পনা। রাধা অনেক দূরে। আবার মনে পড়লো সাধনের—আসবার সময় দেখা করেনি রাধা। কেন করেনি? সাধন ত' রাধার ওপর কোন রাগ রাখেনি মনে। বড় অবুঝ রাধা।

রুক্মিণীরা চলে যাবার ক-দিন বাদে সাধনও রওনা হলো তাদের ডেরায়। গড়িয়াসীতমপুর হয়েছে তার ঘাঁটি। যশবন্তকে কথা দেয় সাধন যে সে ফিরবে এখানে। এখন যশবন্তের অনেক কাজ। তবু সে তার ঝড়ঝড়ে গাড়ীটায় পৌঁছে দিতে চলে সাধনকে। কলকজার শব্দে রাস্তা মুখরিত হয়, ধূলো উড়ে চারিদিক আঁধার করে, হর্ণের অভাবে সাধনকে একটা ভেঁপু বাজাতে হয়। মানুষজন, ছাগল আর মোষ যে চাপা পড়ে না, সে শুধু তাদের ভাগ্যগুণে। গাড়ীটার ভেতরে সীটের বালাই নেই। তরকারী ঢালবার সুবিধার জন্যে ভাঙা গদীটা তুলে নেওয়া হয়েছে। সাধনকে বকতে বকতে চলে যশবন্ত। বাঙালী মাত্রই না কি এরকম পাগলা হয়।

পথে বেরিয়ে পড়ে আরাবল্লীর নগ্ন চূড়াগুলো দেখতে দেখতে আশ্চর্য একটা বন্ধনমুক্তির স্বাদ অনুভব করে সাধন। সীতমপুরের ঘরদোর মনে হয় বড় সংকীর্ণ।

যশবন্ত বলে—আখের মাটি করছো। আর কখনো ফিরে পাবে এ বয়সটা?

জবাব নেই সাধনের। আসলে যাযাবর জীবনে তার নেশা লেগেছে। তা ছাড়া জন্ম, মৃত্যু, নবান্ন, বিবাহ, হোলি, বৈশাখী, এই সব নিয়ে রাজস্থানের ভ্রাম্যমাণ জাতিগুলির মধ্যে বিভিন্নরূপের ঠাটবাটের বৈচিত্র্য সে দেখেছে। তার মধ্যে এক নতুন জগতের খোঁজ পেয়েছে। এর মধ্যে সে ডুবে যেতে চায়। ডুবে গিয়ে আহরণ করতে চায়। আহরণ করে নিজেকে করতে চায় ঐশ্বর্যবান। এই সব লোকনৃত্যের মধ্যে জীবন স্বতঃস্ফূর্ত ও সুন্দর ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। কণ্ঠমণি তাকে শুনিয়েছিলেন—নয়ন না তিরপিত ভেল।

সাধন-ও যত দেখছে, ততই বুঝছে যে তৃপ্তি নেই। তার বিশাল মাতৃভূমির এই সব জাতি-উপজাতির মধ্যে কত জিনিষই না লুকিয়ে আছে। আহরণ করবার মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দ আছে। সে কথা যশবন্তকে বোঝাবে কে?

তা ছাড়া ভ্রাম্যমাণ জীবনের আনন্দ? এই সুবিস্তীর্ণ পাহাড় প্রান্তর আকাশ বাতাসকে নিজের উত্তরাধিকার বলে জানবার আনন্দ? না। যশবন্তকে সব কথা বলা চলে না।

এদের ডেরায় সবাই সাদর অভ্যর্থনা জানাল সাধনকে। কয়েক শো' তাঁবু পড়েছে প্রায়। রামছাগল উট ও মোষ ঘুরছে স্বচ্ছন্দে। সাধনকে দেখে হাসল রুক্মিণী।

অনেক রাত হয়েছে। কাছেই কেউ তারের যন্ত্র বাজাচ্ছে। একটানা সুর। সাধন উঠে বসে। তাঁবুর পরদা সরিয়ে বাইরে আসে। মরা চাঁদের ভাঙাজ্যোৎস্না। সাদা সাদা তাঁবুগুলো যেন ঢেউয়ের মাথায় স্তব্ধ ফেনা। সমুদ্রের মতো সোঁ সোঁ ডাক কোথায় এই বালির দেশে? বেরিয়ে এসে চলে সাধন। তাঁবুর সীমানা ছাড়িয়ে এসে দাঁড়ায়। চাঁদের আলোয় ভেসে যাচ্ছে চারিদিক। শাদাবালির ওপর ফণিমনসার আঁকাবাঁকা গাছগুলো চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। বালির ওপর দিয়ে রাতের বাতাস ছুটে আসছে। তার ফলেই সৃষ্ট হয়েছে এই সাগর-সঙ্গীত। রাত্রিটা যেন কথা কয়ে ওঠে। সে কথা শুনতে খুব ভালো লাগে সাধনের। রাত্রির এমন জীবন্ত, এমন বিশাল রূপ সে আর কখনো দেখেনি। অনেকটা মনে হয়, আজ এই রাতে যেন বিশ্বপ্রকৃতির অন্তরের কথাটি তাকে বলা হবে। তাই এই গোপন আমন্ত্রণ। তাই তার এই প্রতীক্ষা।

দো-তারার মতো একটা যন্ত্র বাজিয়ে চলেছিল যে-জন, সে-ও থামল। এই সুবিশাল নিস্তব্ধতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে রইল সাধন অনেকক্ষণ। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে নিচু হয়ে ভেঙে পড়ে বালির

ওপর গালটা রাখল সাধন। শীতল, হিমশীতল। তবু সূচীমুখ বেঁধে গালে। ভালো লাগে। ভালো লাগার অনুভূতিটা বাড়তে থাকে। কোনো ভয় হয় না। মনে হয় সে-ও এই মাটির তৈরী। একই উপাদান তাদের রক্তমাংসে। নিবিড় বন্ধন কোথাও না কোথাও আছেই। নইলে এমন আশ্বাস পাচ্ছে সে কোথা থেকে ?

এই রাতে ঘুমহারা সাধন কোনো কুহক আকর্ষণ অনুভব করলো না। প্রকৃতি শুধু মাতালই করে তোলে না, শান্ত করতেও জানে। আজকে সাধনের মনে হলো প্রকৃতি বড় শান্ত, বড় মায়াময়।

সেই নিরাপত্তা পেলো বলেই স্বচ্ছন্দে বালির ওপর ঘুমিয়ে পড়তে পারলো সাধন।

* * *

সাধন যখন এলো, তখন শুধু রুক্মিণী নয়, তার বাবা নয়, অন্যরা-ও ভেবেছিল সাধন এলো রুক্মিণীর টানে। এরকম ঘটে থাকে ক্বচিৎ কখনো। ঘটলে পরে গল্পকথা হয়। সে গল্পকথা আবার মানুষের মুখে মুখে বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে আর বাড়তে থাকে। কে কোথায় মেলায় কাকে দেখেছিল—তারপরে কি হলো, সেই সব! হাকিমবাবুরা ঘুরে ঘুরে তাঁবু ফেলে বিচার ব্যবস্থা করে বেড়ান। এদের মেয়েরা মন ভোলাতে চায় তাঁদের। সে সব ঘটনা কখনো ডাল লক্‌লকিয়ে বেড়ে উঠে ফুল পাতায় বিকশিত হয়। আবার কখনো ছুরি ঝল্‌কে চোরা খুন হয়ে যায়। সাধন যদি রুক্মিণীর টানে এসে কোন বে-চাল্ করতো তবে ছুরি চালিয়ে তাকে নিকেশ করে দেবার জন্যে অনেকেই তৈরী ছিল। কিন্তু কারো কোন হিসাবই সাধন সম্পর্কে মিলল না। বাপ্পারা বুড়োরা মাটিতে থুতু ফেলে বলল—আজব চীজ! মানুষের পেটে পয়দা হয়নি।

জোয়ানরা কিন্তু দলে এসে গেল। অপর্যাপ্ত বিড়ি সিগারেট দিয়ে সাধন তাদের বশ করলো। প্রথম চোটেই তার জামা কাপড় বিছানা সব চুরি করে নিয়ে গেল এরা। এটা এদের ধর্ম। এদের

কাছে চুরি করার বিদ্যাটা শিল্পের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছিয়েছে। সুদক্ষ নৈপুণ্যে এরা সব চুরি করে নিল। সাধন কিন্তু চটলো না। কোন হাঙ্গামা করলো না। নির্বিকার ভাবে তাদেরই জাফরানী পাজামা আর নীলকুর্তা পরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ভেড়ার পশমের কম্বল পেতে শুল। স্নান পরিত্যাগ করলো এবং ছাগলের দুধের দুর্গন্ধ দই খেয়ে শরীর থেকে ভদ্রলোকের গন্ধটুকু তাড়ালো। তাকে দেখে, পাশে বসিয়ে, শুঁকে, সবরকমে এদের তৃপ্তি হলো যে এ তাদেরই একজন। হপ্তা শেষে যশবন্ত এসে সাধনকে দেখে যখন অবাক হলো, তখন সাধন তাকে বোঝালো। বললো,—

—'তুমি ত' লেখাপড়া কোনকালেও করোনি। এর নাম হচ্ছে যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ।'

যশবন্তকে টাকা দিতেও মানা করলো সাধন। কেননা এর ওপর যদি টাকার গন্ধ পায় ওরা, তবে স্বচ্ছন্দে সাধনকে খুন করবে। বুঝে শুনে যশবন্ত তার ক্ষেতের মূলো আর বেগুন একরাশ ঢেলে দিয়ে গেল। খুসী হলো সবাই।

রুক্মিণীর ওপরে সাধনের কোন টান আছে বলে বোঝা গেলনা। নাচ শিখে আর নাচ দেখে তার ক্লান্তি নেই। চমৎকার নাচে বলে লাখ্পতিয়াকে তার পছন্দ বেশী। রুক্মিণী একদিন রেগে তার কাছে এল। বলল,—

—তোমার কোন দেমাক ঠিক নেই বাবুজী। আমার মুখ হাসাচ্ছ তুমি। ছেলেগুলো আমাকে নিয়ে হাসছে।

সাধন বললো,—

—আয়। কাছে বোস।

চোখ কুঁচকে সাধনের মৎলব ঠাওর করতে করতে পাশে বসলো রুক্মিণী। সাধন বললো—

—দেখ রুকিয়া, আমি তোদের এখানে থাকতে আসিনি। আর তোকে আমার দোস্ত মনে হয়। তোরা সকলেই আমার বন্ধু।

আর কিছু নয়। বুঝলি? কি করবো বল্? চলে যাবো? সে জন্য তাড়িয়ে দিবি?

ব্যাপারটা বুঝে তখন হাসতে সুরু করলো রুক্মিণী। সাধন তার পিঠ চাপড়ে দিল। বল্লো,—

—এই যে ঠাট্টা বুঝিস্ সেইজন্যে ভালো লাগে তোকে। জানলি?

যা হোক, রুক্মিণীর সঙ্গেও একটা বোঝা পড়া হল। রুক্মিণীর বাবা যখন বুঝল যে সাধন তার তাঁবুতে রুক্মিণীকে মাঝরাতে ডাকবে না,—কোন সম্ভাবনা নেই,—তখন খুবই রেগে গেল মেয়ের ব্যবহারে। তারপরে-ও মেয়েটা মানুষটাকে আদর যত্ন করে কি ক'রে? রুক্মিণী বাপকে তিন ধমকে ঠাণ্ডা করে দিল। বলল—

—এ কি দারোগা, না হাকিম? এর সঙ্গে মিশে কি লাভ হবে? আর তুমিই বা বোকার মতো চট্‌ছো কেন?

বাপ বিভ্রান্ত হলো। তারপর সামলে গেল। রুক্মিণী আরো বললো—

—হসরৎ বিয়ে করবে আমাকে। তোমার চোখ গাঁজা খেয়ে কানা হয়েছে তাই দেখতে পাওনা। নইলে আর সবাই জানে। বুদ্ধি থাকে তার বাপের সঙ্গে কথা বোল।

বুড়োগুলো দেখে শুনে অবাক মানল। নিঃসন্দেহে সব কিছু বদলে যাচ্ছে। এখনকার ছোকরাদের চরিত্র বদলে গিয়েছে।

গরম পড়েছে দুরন্ত। সকাল থেকে বাতাসে আগুন ছোটে। বেলা যত বাড়ে তত বাড়ে আগুনের তেজ। দিনভোর কাজকর্ম কমিয়ে দিয়ে নাক কান মুখ ঢেকে ভেতরে থাকে সবাই। বিকেলে আগুনের শেষ হল্‌কা ঢেলে দিয়ে সূর্য যখন পশ্চিমে নামে তখন আবার কাজকর্ম শুরু হয়। সীতমের স্বল্পজলে সানন্দে স্নান করে সাধন।

এরই মধ্যে একদিন এলো ভ্রাম্যমাণ পুতুলনাচের দল। তাদের বাজনা বাজল যখন ছুটে গেল সবাই। একহাত উঁচু পুতুল নাচিয়ে

রামলীলা দেখাল পুতুলওয়ালা। দেখে ভালো লাগল সাধনের। সুন্দর আঙ্গিক। নতুন ধরণের। তার দেশে যে পুতুল নাচ দেখেছে সে, তার চেয়ে অনেক নতুন ধরণের।

আস্তে আস্তে এ জীবনেও ক্লান্তি এল সাধনের। ভালো লাগল না আর। নিজে কিছু করতে পারছে না সে, এই কথাটাই বারবার মনে হলো তার। সে দল বানাতে চায়। নাচের দল বানিয়ে 'শো' দিতে চায়। একটা ট্রুপ গড়বার অভিজ্ঞতা তার নেই। সে শুধু নাচ শেখাতে পারে, সেই দিকটা দেখতে পারে। কিন্তু এ কাজে টাকা চাই। অন্ততঃ হাজার দশেক টাকার পুঁজি নিয়ে যদি কেউ তার পাশে দাঁড়ায়, ত' এখনই সাধন গড়তে পারে ট্রুপ। এ সব কথা শুনে যশবন্ত বড় দুঃখ পেলো। সত্যিই সে বোঝে না এ সব। এ তার লাইন নয়। তার চেয়ে টাকাটা সে ধার দিতে পারে সাধনকে। সাধনের ওপর তার অনেক ভরসা। পরে সাধন না হয় ফেরৎ দেবে টাকা!

সাধন রাজী হলো না। এক এক মানুষ এক এক ভাষায় কথা কয়। সাধনের ভাষা হচ্ছে নাচ। সে বিভিন্ন নাচ সৃষ্টি করতে পারে। তার যা বক্তব্য আছে, তা প্রকাশ করতে পারে নাচের ভিতরে। এমন অদ্ভুত একটা ব্যাপার, যে একলার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। অপরের সাহায্য তাকে নিতে হবেই। কাকে পাবে কোথায়?

নিজের ওপরই রাগ হলো তার। নিজেকে বুঝতে-ই জীবনের আটাশটা বছর কেটে গেল। ফুল ফুটেই সার্থক। পাখি গান গাইতে পারে। মানুষের মধ্যে কেউ লেখে, কেউ গান গায়, কেউ চাষ করে। এক এক জন এক এক ভাষা নিয়ে জন্মেছে। এমন এক অবস্থা সাধনের যে নাচের বোল ছাড়া নিজেকে খুলে মেলে ধরতে পারে না সে। অথচ কোন উপায়ই নেই।

সুহাসের কাছে টাকা চেয়ে পাঠাবে? ছিঃ। নিজের ওপরেই ঘৃণা হলো তার। আর যাই হোক—যে বাঁধন ছিঁড়ে চলে এসেছে তা আবার ফিরে বাঁধা সম্ভব নয়।

একবার মনে হলো খুব ভালোবাসার মতো একটা মানুষ পেলে হতো। তাহ'লে ভুলে থাকা যেতো। মাথার মধ্যে দেহাতীত কোন একটা বোধ নিরন্তর কাজ করে চলেছে। কুরে কুরে খাচ্ছে পোকার মতো। সর্বদা তাকে যন্ত্রণা দিয়ে স্মরণ করাচ্ছে, সাধন তুমি কিছু করলে না।

এই যন্ত্রণা আস্তে আস্তে দেহে সংক্রামিত হয়। মনে হয় তার রক্তে-ও জ্বালা ধরেছে। কাকে কি বলবে সাধন? জীবনের এই সময়টা সে যেন ভুলবে না কোনদিন। এমন নিঃসঙ্গ সে আর বোধ করবে না। অস্পষ্ট মনে হলো সাধনের, জীবনের এক সন্ধিক্ষণে তার মতো অনেকেই নিঃসঙ্গ বোধ করেছে। এই নিঃসঙ্গতা অনেককে ছুঁয়ে ছুঁয়ে তবে তার কাছে এসেছে।

এই সময়েই সাধনের জীবনে এলো বৃন্দা। জীবন যে সব জটিল গ্রন্থির সৃষ্টি করে, তার সমাধান-ও করে অতি সহজে। হঠাৎ গ্রন্থি খুলে যায়, আর এত সহজে তার সমাধান হলো দেখে আমরা অবাক মানি।

বৃন্দা এলো সাধনের জীবনের সেই জটিল গ্রন্থি মোচন করতে। এলো পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে। বৃন্দার চরিত্রে আর যাই থাক, প্রত্যয়ের অভাব নেই। সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয় তার। সে প্রত্যয় সে অপরের মধ্যেও সঞ্চার করতে পারে। তার নিজের জগতে সে ঈশ্বরের মতোই অপার মহিমা। ঈশ্বর বললেন আলো হোক—আর আলোর জন্ম হলো, এই ধরণের অমোঘ হোক তার ইচ্ছা অনিচ্ছাগুলি—বৃন্দা তা-ই চায়।

গরম কেটে বর্ষা নেমেছে। দুই এক পশলা বৃষ্টি হয়েছে। প্রকৃতির রুদ্ররোষ স্তিমিত হয়ে আকাশ ভরে একটি মেদুর প্রশান্তি নেমেছে।

রামছাগল, উট ও মোষ ঘুরছে স্বচ্ছন্দে। মেয়েরা পরস্পরের উকুন বাছছে। কাঠ দিয়ে জামাকাপড় পিটিয়ে কেচে সাফ করছে কেউ। কারো পোষা বাঁদর বাঁদরী দার্শনিক নির্লিপ্ততায় চতুর্দিক নিরীক্ষণ করছে। এরই মধ্যে তাঁবুতে খাটিয়া ফেলে পড়েছিল সাধন।

তাঁবুর দড়ি, মানুষজন, জিনিষপত্র, উনোন হাঁড়ি বাঁচিয়ে ফর্সা পা থেকে সবুজ রেশমের লাল পাড় কট্‌কী চন্দ্রাবলী শাড়ীটা অনেকখানি তুলে লীলায়িত গতিতে যে মেয়েটি এল, তাকে দেখে অবাক হয়ে উঠে বসলো সাধন। অবাক হবার মতোই চেহারা।

উগ্র ফর্সা মুখে ঘন কালো ও হ্রস্ব ভুরু দুটো যেন মোটা তুলিতে চীনে কালির ধ্যাব্‌ড়া পোঁচ। ছোট, তীক্ষ্ণ ও কটা চোখে মোটা কাজলের টান। দেহযষ্টিতে উগ্র যৌবনের সোচ্চার আত্মপ্রকাশ। এ দেহে যৌবন এসে যেন ধন্য হলো। ধন্য যে হলো, সেই কথা কয়ে উঠলো কলকণ্ঠে। ভরা ঝর্ণাকে পাথর দিয়ে বাঁধলে সে যেমন কূলে কূলে ছাপিয়ে পড়ে, বৃন্দার দেহে যৌবনও তেমনই ভরো ভরো। চেরা সিঁথি মাঝে রেখে কপালের ওপর চুল পাতা কেটে নামিয়ে ঘাড়ের ওপর খোঁপা বাঁধা। লালরঙের মোটা দেহাতী কাপড়ের হাতকাটা খাটো জামা পরণে। গলায় হাতে কানে রূপোর গহনা। বাঁ হাতে একটা পুরুষালি ঢঙের ঘড়ি। ঠোঁট দুটি ঈষৎ মোটা। তবু স্বভাবলাল। হেসে নমস্কার করলো মেয়েটি। ভাঙাগলায় ঝরঝর কোরে বললো—

আপনাকে দেখতে এসেছি। মণিপুরের কণ্ঠমণি ঠাকুর আপনার নাম করেছিলেন। এখানে এসে শুনলাম যশবন্তের কাছে। আপনার খোঁজেই ফিরছি আমি, বিশ্বাস করুন! আমার নাম বৃন্দা কৌশিক।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বৃন্দা কৌশিকের নাম কে জানেনা? সার্থক নৃত্যশিল্পী সে। তার নাম রূপকথা। উঠে দাঁড়াল সাধন! নিঃসংকোচে হাত বাড়াল বৃন্দা।

কি করতে হবে বুঝতে না পেরে সাধনও হাত বাড়াল। করমর্দনের ভঙ্গীতে বৃন্দার লম্বালম্বা আঙুলগুলো এসে সাধনের হাতে পেঁচিয়ে গেল। হাতে হাত রেখে যখন সাধন বিভ্রান্ত হয়ে গিয়েছে তখন বৃন্দা আবার হাসল। আমন্ত্রণের হাসি। নিজের মাধুরী সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাসের হাসি। হেসে বৃন্দা বলল,—

—হ্যাঁ আমিই বৃন্দা কৌশিক।

যা হলো তা জেনে শুনেই। বৃন্দা আর নারায়ণ কৌশিক যশবন্তের কাছে সাধনের কথা শুনে উৎসাহী হয়। একটা বাঙালী ছেলে দেশঘর ছেড়ে এখানে এসে নাচ শিখছে এইসব বেদেজাতের সঙ্গে থেকে, শুনেই তারা অবাক হয়। আরো অবাক হলো বৃন্দা, যখন সে জানলো এ সেই সাধন—যার নাম শুনেছে সে কণ্ঠমণির কাছে। কণ্ঠমণিকে সে কিছুদিন পেয়েছিল গুরু হিসেবে। এবার তাঁকে প্রণাম জানাতে গিয়েছিল। সেখানেই শুনল সাধনের নাম। শুনে আগ্রহ হলো তার। যোগাযোগ ঘটলো আশ্চর্য ভাবে।

যশবন্তের ভাঙা ফোর্ড চড়ে সেদিনই সাধন ফিরলো সীতমপুর। রুক্মিণী এখনো হসরতের বৌ হয়নি। সাধনের জিনিষপত্র তুলে দিতে এল সে। ভালো করে দেখলো বৃন্দাকে। রুক্মিণীর বিয়েতে আসবে বলে কথা দিলো সাধন। জানালো যে সে প্রতিশ্রুতি মতো খাঁটি রূপোর গহনা গড়িয়ে আনবে। এত প্রতিশ্রুতিতেও হাসি ফুটলোনা রুক্মিণীর মুখে। বললো···

—তুমি যেতে না, তোমাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। বাঞ্জারী কথা শুনতে মধুর। বৃন্দা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো। বললো—

—কি অপূর্ব মেয়েটি, একেবারে elemental appeal ওর, দেখ!

বাঞ্জারীতে গালি দিল রুক্মিণী। নাক সিঁটকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। তবু বৃন্দার কৌতূহল মেটেনা। রুক্মিণীর পোষাক পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে গলার ময়লা কাঠের তক্তির গাছাটা অবধি ভালো লাগে তার। বলে,—

—দেখ নারায়ণ, কি রকম খাঁটি দেশী জিনিষ!

রুক্মিণী বড় দুঃখে গালি দিয়ে থুথু ফেলল মাটিতে।

তাকে দিয়ে বৃন্দার কোন্ কাজটা হবে বুঝে পায়না সাধন প্রথমে। সে শুধু অবাক হয় আর দেখে। সীতমপুরের খামার বাড়ীটাকে ইতিমধ্যেই নিজের জায়গা করে তুলেছে বৃন্দা। কতো বাক্স, জিনিষপত্র। বৃন্দার অভিধানে টাকার কোন দাম আছে বলেও মনে হলো না! স্থানীয় মেয়েদের জামাকাপড়, রূপো আর পুঁতির গহনা কিনছে সে রাশি রাশি। বাঞ্জারা পুরুষরা কি পোষাক পরে খুঁটিয়ে লিখে নিল সাধনের কাছ থেকে শুনে। সব সময়ই বৃন্দার মধ্যে এমন একটা প্রাণশক্তি ও যৌবন বিচ্ছুরিত হয়, যে তাকিয়ে না থেকে উপায় নেই সাধনের।

সাধন যা করছে, বলছে, বলছে না, চুপ করে থাকছে, যেভাবে খাচ্ছে দাচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, সবই খুব ভালো লাগছে বৃন্দার। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছে সে।

আটাশ বছরের সাধনকে দেখে ছাব্বিশ বছরের বৃন্দার যে এতখানি ভালো লাগবে সে কথা নারায়ণ আগে বুঝতে পারেনি। এখন দুজনের সামান্য কথা নিয়ে উচ্ছ্বসিত হাসি দেখতে দেখতে মুখে ব্যবসাদারী হাসিটি নারায়ণ টেনে রাখল। কিন্তু মনে মেঘ ঘনালো। তার যে চল্লিশ বছর বয়স হয়েছে সেটা যেন আবার নতুন করে মনে পড়লো। বৃন্দা জোহারীকে সবাই বলতো আগুন! আগুনে হাত দিলে হাত পুড়বে। কতদিন একে মানিয়ে রাখতে পারবে, হিসেব না করেই সখের ইম্প্রেসারিও নারায়ণ কৌশিক বৃন্দা জোহারীকে

বিয়ে করে বসলো। তখনই বলেছিল পরিচিত বন্ধুজন—এ বিয়ের মেয়াদ বেশীদিন নয়। সে তিনবছর আগেকার কথা।

বৃন্দার সম্পর্কে এ অবিশ্বাসের জন্যে হয়তো তার মা-ও দায়ী। মধ্যভারতের কোনো রাজপরিবারের কন্যা তিনি। বিয়েও হলো সমগোত্রীয় কোনো রাজপরিবারের ছোট কুমারের সঙ্গে।

মাথার ওপর তিন ভাই থাকতে গদী পাবার আশা দুরাশা জেনে কুমার সায়েব স্ত্রীকে নিয়ে প্যারিসে গেলেন। বৃন্দা তখন ছোট। তার ফরাসী গভর্ণেসকে নিয়ে কুমার গেলেন ইটালী। মনের দুঃখে শয্যা নেবেন, তেমন ধাত নয় শালিনী দেবীর। শালিনীকে সান্ত্বনা দিতে যাঁরা এলেন তাঁদের হটিয়ে দিয়ে স্বামীর সেক্রেটারী কুশারীকে নিয়ে তিনি গেলেন রেসের মাঠে।

দুজনের চাহিদা মেটাতে মেটাতে ছত্রিশগড়ী, ভীল, রাজস্থানী আর অন্যান্য আদিবাসী মিলিয়ে তিনলাখ প্রজার ছোট্ট ষ্টেটটা ফতুর হবার জোগাড়। ষ্টেটের আছে বলতে তো কটা কুটিরশিল্প, গোটা কয়েক জঙ্গল আর কিছু ম্যাঙ্গানিজ। সায়েব এ্যাড্‌ভাইজার স্বল্প কথার চিঠিতে অবস্থা বুঝিয়ে লিখল কুমারকে। কি ভাগ্যে সময় বুঝে মারা গেলেন কুমার। বৃন্দার মা কুশারীকে ছাড়তে চাইলেন। কিন্তু কমলি নেহি ছোড়তা। তখন যদি কুশারী তাঁকে না ছাড়ে, তিনি তাঁর স্বামীর সম্পত্তির ভাগ পাবেন না। ছোট হলেও ষ্টেট। নাহয় ডোরাকাটা নয়, চাকা চাকা দাগকাটা—তবু বাঘ তো বটে। তারই বা রীতিনীতির কামড় থাকবে না কেন? দেশীবিলিতী নানাজাতের তাম্বুলকরংকবাহিনী না হ'লে হয়তো কুমারদের মন ওঠে না। বুকে পিঠে ষ্টীলের জাল আটকে, আর সেটা স্যুটের নিচে ঢেকে, তবে ভাই ভাই-এর ঘরে নেমন্তন্ন রাখতে যান;—সঙ্গে থাকে বডিগার্ড। তা ব'লে রীতকানুনে রদবদল হবে কেন? বিয়ে চৌথা অথবা প্রেতক্রিয়ার সময়ে ঠিকই সাততীর্থের জল আসবে, জন্মদিনে রাজা মন্দিরে গিয়ে রূপোর টাকার পাল্লায় ওজন হবেন।

কথায় বলে বিপদকালে দশজনের পরামর্শ নিতে হয়। এ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম হলোনা। কয়মাথা এক হলো সন্ধ্যার পর রাজা-সায়েবের চীনে ড্রয়িংরুমে—কেউ তা জানলোনা। স্কচ পরিবেশন করলেন স্বয়ং এ্যাড্‌ভাইজার সায়েব। বেয়ারাগুলো জুতোর শব্দ নরম কার্পেটে ডুবিয়ে দিয়ে দূর দিয়ে চলাফেরা করলো শুধু।

রায় গেল প্যারিসে। চরিত্রহীনা রাণীসাহেবা জীবৎকালে মাসোহারা পাবেন মাত্র। মেয়ে বড় হলে বাপের সম্পত্তির ভাগ পাবে।

রাতভোর ড্রিঙ্ক সম্বলিত ব্রিজ পার্টি ক'রে শালিনী এমনিই ছিলেন বিগড় মেজাজে। চিঠি পড়ে তাঁর এমন রাগ হলো যে ডার্লিংবেবিকে মনে হল শত্রু।

শালিনী আর ফিরলেন না ভারতে। বৃন্দার শিক্ষাদীক্ষা হলো ইউরোপে। ভাগ্যক্রমে তার চোদ্দ বছর বয়সে মা মারা গেলেন। কন্‌ভেণ্ট থেকে ছুটিতে যখন আসতো, তখন ছাড়া মা-কে দেখেনি বৃন্দা। মা'র জীবনযাত্রার ওপরেও তার কোনো শ্রদ্ধা ছিলনা। যে মিছিলে ভিড়েছিলেন শালিনী তার কোন শেষ নেই। রাতভোর তাসের জুয়া, মদ আর বিগত যৌবনে স্তাবকবৃন্দের প্রতি অসীম আস্থা। ইদানীং বিয়ার ধরে মোটা হয়ে গিয়েছিলেন। চোখের নীচের চামড়াগুলো বিশ্রী রকম ফোলা। মোটা ক'রে পেইণ্ট ক'রে হোটেলের লবিতে ব'সে বিদেশীদের হাত দেখতেন। ইণ্ডিয়ান পামিস্ট্রি আর রত্নলক্ষণ আলোচনা করে রোজগার করতেন মন্দ নয়। আবার ধনী বৃদ্ধাদের সঙ্গে ব'সে মিডিয়ম হয়ে স্পিরিট ডাকতেন। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ বা শংকরাচার্যের মুখপাত্র হয়ে অনর্গল কথা কইতেন। সব সময় সকলে যে ভুলতো তা নয়। একটা স্মৃতি কখনো ভোলেনি বৃন্দা। তাকে নিয়ে তার মা গেলেন কোনো বন্ধুজনের পার্টিতে। জুয়াড়ী, যৌন বিকারগ্রস্ত কিছু নারী ও পুরুষ, ধনী মহিলাদের ওপর নির্ভরজীবন কিছু ক্লীবচরিত্র যুবক এবং আফিম ও

কোকেন ভোজীদের নৈশ বেলেল্লাগিরির মধ্যে চোদ্দ বছরের সুন্দরী বৃন্দাকে নিয়ে যাওয়াই তাঁর ভুল হয়েছিল। বৃন্দা মা'র সঙ্গ এতো কম পেত, যে মা'র বন্ধুবান্ধবকে জানবার আগ্রহ তার ছিল অত্যন্ত বেশী।

সেখানে সে দেখল তার মার কোনো সম্মান নেই। কয়েকজন বললো,—

—বুড়ীটাকে মদ গিলিয়ে দাও! আবোল তাবোল বকবে।

তার মা-কে ক-জন মিলে অনর্গল মদ খাওয়ালো। তারপর খোঁচাতে লাগলো,

—বল, ইণ্ডিয়ান পামিস্ট্রির কথা বলো! ওনিক্সের ওপর কোন প্ল্যানেটের প্রভাব আছে বলো।

আরো দুঃখের কথা এই, যে বৃন্দা কতবার বললো,—মা চলো। বাড়ী চলো। এখানে থাকব না।

মা শুনলেন না। মদ খেয়ে টলতে লাগলেন আর দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগলেন,—

—বেবি! এরা আমায় ঠাট্টা করছে? যাচ্ছি, যাচ্ছি বেবি, চলো বাড়ী যাব। কিন্তু আমি এদের শিক্ষা দিয়ে যাব। আমি একটা ষ্টেটের রাণী। আমার স্বামী ফ্রেঞ্চ মিষ্ট্রেস রাখতো। ওরা জানে, আমার বাবার কতগুলো ইংরেজ আর ফ্রেঞ্চ বাট্‌লার, সহিস, সেক্রেটারী ছিল? আমার মেমসায়েব গভর্ণেসকে আমি এই এমনি করে!—কি করতেন বলার আগেই তিনি টলে পড়লেন। বৃন্দা ভয়ে দুঃখে কাঁদতে কাঁদতে তাঁকে টেনে তুলতে চেষ্টা করলো। কুশারী তাঁকে রূঢ়ভাবে প্রায় টেনে নিয়ে গাড়ীতে তুললো।

মাঝরাতের প্যারিসের রাস্তা দিয়ে তারা ফিরছে। বৃন্দাকে তখনো অনেক কথা বলছেন তার মা,—

—মা খারাপ, মা দুষ্টু, বেবি ভালো। বেবি—ক্ষমা করো! আর কক্ষণো আমি এমনি সব জায়গায় আসবো না।

কুশারী যাকে বৃন্দা তার মার সেক্রেটারী বলেই জানে, সে স্বচ্ছন্দে ঝুঁকে পড়ে বৃন্দার মুখের কাছে মুখ নিয়ে হ্যা হ্যা করে হাসলো, আর তারপরেই তার হাতটা আপত্তিজনক ভাবে উঠে এলো বৃন্দার গায়ে। তার আঙুলগুলোর সেই কিলবিলে গতির কথা বৃন্দা কখনো ভুলবে না।

বৃন্দা কামড়ে ধরেছিলো কুশারীর হাতটা। যন্ত্রণায় চেঁচিয়েছিল কুশারী। তারপর বিশ্রী হেসে বলেছিলো—

—বেবি! আমি ঠাট্টা করেছিলাম। তুমি ঠাট্টা বোঝ না?

মা যখন মারা গেলেন—তাঁকে দেখে তাই খুব কষ্ট হয়নি বৃন্দার। নীল আলো জ্বালা ঘরে মা'র মুখখানা কেমন যেন দেখালো। এরকম বিশ্রী বিবর্ণ ও অসুস্থ রকম হলুদ রং সে আর কোথায় দেখেছে?

পরে মনে পড়লো বৃন্দার। কসায়ের দোকানে শূওরের মাংস যখন ঝোলে, তার চর্বি এমনিই বিবর্ণ হলদে দেখায়। দেখে মনে ও শরীরে একটা ঘেন্নার ভাব আসে।

মা'র মৃত্যুর পর তাকে ভারতে আনা হলো। রাখা হলো বম্বের একটি কন্‌ভেন্টে। আঠারো বছর বয়সে সিনিয়রকেম্ব্রিজ, পিয়ানো, ফ্রেঞ্চ আর ল্যাটিনের পাঠ সমাপ্ত করে যখন নিজের দিকে তাকাবার সময় পেলো বৃন্দা, তখন নিজেকে দেখে নিজেই বিভ্রান্ত হয়ে গেল। সতেরো লাখ টাকা তার ব্যাঙ্কে। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় পাঁচখানা বাড়ী। কুশারী অবিশ্যি বোঝাতে চেষ্টা করেছিল চিঠি লিখে। জানিয়েছিল এ ছাড়াও অনেক গহনা বৃন্দার প্রাপ্য। টাকার অঙ্কও নাকি কম পড়েছে।

সে কথা নিয়ে মাথা ঘামালো না বৃন্দা। তার মা থাকতে কুশারীর সম্পর্কে তার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তা যথেষ্ট। অজস্র স্বাধীনতা পেয়ে তার নিজেকে হঠাৎ খুব ভালো লাগল।

টাকা থাকলেই সব হয়। অন্তুতঃ বৃন্দা তাই মনে করতো। টাকার ওপরে মায়ের অসীম আস্থার কথা সে ভোলে নি। প্যারিসে

বেড়াতে এলেন তার জ্যাঠামশায়। স্বয়ং রাজাসায়েব। মা অমনি তাকে সাজিয়ে গুজিয়ে পাঠালেন হোটেলে। হাজার হলেও ছোট ভাইয়ের মেয়ে। দেখা হলেই হয়তো ভালবাসবেন রাজা। কিন্তু জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে দেখা হলো না। সেক্রেটারী দেশমুখ ফেরৎ আনলেন বৃন্দাকে। সঙ্গে আনলেন কিছু ফুল ও চকোলেট। ভদ্র-ভাষায় জানালেন, শালিনী দেবী যদি দেখা না করেন তবে বড় খুসী হবেন রাজাসায়েব।

শালিনীর ক্ষোভ, অতৃপ্তি এবং অর্থহীন ভাবে বিলাসী জীবন যাপন করবার আকাঙ্ক্ষার মধ্যেই বড় হয়েছিলো বৃন্দা।

যেমন সে নিজে ফ্ল্যাট ভাড়া করে সালোঁ খুলে বসলো, অমনি ঘিরে এল লোক।

সবই যে মায়ের মতন তা নয়। বৃন্দার আশা আকাঙ্ক্ষাগুলো অনেকাংশে সুস্থ ছিলো। কন্‌ভেণ্টে সৎপরিবারের যে সব মেয়েদের সঙ্গে মিশেছিলো বৃন্দা, তারা বিবাহ, সম্মান, সুখী ও সুপ্রতিষ্ঠ জীবনের পক্ষপাতী। বৃন্দাও চেয়েছিল ভালো একটি ছেলেকে বিয়ে করে সুখী হবে। উনিশ বছরের অনাঘ্রাত মন নিয়ে প্রেমে পড়লো বৃন্দা। আর সঙ্গে সঙ্গেই হলো এক কঠিন অভিজ্ঞতা। শুনলো তাকে না কি বিয়ে করা চলে না। অন্ততঃ সে যাকে চায়, সে ছেলে তাকে চায় না। বৃন্দারই একান্ত বন্ধু অনসূয়ার দাদা চিমনভাই শুক্লা। শুক্লা জানালো তার সাহস নেই। সে ভয় পায়। বৃন্দার মার কথা মনে করে সে ভয় পায়। হাজার হোক, টাকা যতই কম থাক, শুক্লাদের পরিবার খুব সুখী।

বৃন্দা আঘাত পেয়ে বুঝল যে অন্য সকলের সঙ্গে তার তফাৎ আছে। শুক্লা বল্লল,—

—হাজার হোক, তুমি কে? তোমার আত্মীয়স্বজন নেই, তোমার কোনো পরিবার নেই, কে কোথায় থাকেন তুমি জানো না—তোমার এত টাকা, এতবড় শহর বম্বে, তুমি একলা বাস

করো,—না বৃন্দা, আমি তোমায় জানি অথচ জানি না। আমি ভয় পাই।

তার সম্পর্কে অন্যদের ধারণা তাহ'লে এই? অনেক অশ্রুপাত, অনেক নিঃসঙ্গ রাতে আত্মজিজ্ঞাসা আর মনোবিশ্লেষণের ইতিহাস বাইরের মানুষ জানে না। বাইরে থেকে শুধু পরিবর্তনটাই চোখে পড়লো। চোখে পড়লো যে বৃন্দা বদলে গেল চট্ করে। মায়ের মতো একটা ঝোড়ো জীবন বরণ করলো না। গম্ভীর হলো। আত্মস্থ হলো। তার পয়সায় যে সব আড্ডা পিকনিক জলসা চলতো, সেগুলো বন্ধ করলো। নাচ শিখতে আরম্ভ করেছিলো সে এর আগেই। সেটাই খুব সচেতন মনে গ্রহণ করলো। তার ভরতনাট্যমের গুরু মুথুস্বামীর সঙ্গে যখন 'শো' দিল বম্বেতে, নাম হলো তার রাতারাতি। মুথুস্বামীর ইম্প্রেসারিও ছিল নারায়ণ কৌশিক। অনেক পয়সার মালিক নারায়ণ। এ কাজ তার সখের কাজ। সখটাকে পেশা বানালে সে যে অদ্ভুত সাফল্য লাভ করবে তাতে আর কোন সন্দেহ রইল না। দক্ষিণভারতের বীণাবাদিনী মৃণালিনী বেঙ্কটরাওকে সুধীসমাজে উপস্থাপিত করে কর্ণাটকী রাগমালার সুরপ্লাবনে শ্রবণ ভরিয়ে দিল নারায়ণ। তার পরেই কোথা থেকে খুঁজে কাথিওয়াড়ের গরবা নাচের দল নিয়ে গেল দিল্লী, মাদ্রাজ, কলকাতায়। মণিপুরী নাচের দল নিয়ে চীন ও জাপান ঘুরে আসবার সময়ে নারায়ণ প্রথম দেখে বৃন্দাকে। তার ইম্প্রেসারিও জীবনের সার্থকতম কাজ হলো মুথুস্বামীর ভরতনাট্যম্ দল নিয়ে ভারতের সর্বত্র সফর। বৃন্দা জোহারীকে দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়। বৃন্দার নাম বহুজনের মুখে মুখে। এত রূপ, যৌবন আর প্রতিভা নিয়ে কোনো অভিজাত ঘরের মেয়ে এর আগে পেশাদারী নাচের লাইনে আসে নি। তাকে দেখে সকলে আকৃষ্ট হয়, কিন্তু সে কারো প্রতি আকৃষ্ট নয়। তার ব্যবহারে জড়তা নেই। তার যা ভালো লাগে সে তাই করে, অথচ কোনো পুরুষের শাসন সে মানে না। ইম্প্রেসারিও নারায়ণ সমানে

মেয়েদের সঙ্গেই মেলামেশা করছে। বৃন্দাই তার জীবনে প্রথম নারী, এমন মিথ্যা কথা সে বৃন্দাকে বললো না। বললো নিঃসঙ্কোচে লোলা ব্রিগাঞ্জা—স্প্যানিশ মেয়ের কথা—যে জাপান ট্যুরের পর এসেছিল বম্বেতে। বললো ঠুংরী গায়িকা হীরাবাঈ লক্ষ্ণৌওয়ালীর কথা। কনকাম্মা শান্তারাও-এর কথাও বললো।

সকলের কথা বলে নারায়ণ বললো, তবু সে বৃন্দাকে ভালোবেসেছে। বললো,—

—আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি। আমি তোমায় কোন ছকে বাঁধা ঘরোয়া সুখী জীবনের প্রতিশ্রুতি দেব না। সে জীবন তোমার জন্য নয়। তোমাকে সে জীবন মানাবে কি না আমি জানি না। তোমাকে মানুষ হিসেবে আমি ভালোবাসি। শিল্পী হিসেবে শ্রদ্ধা করি। যদি আমাকে বিয়ে করো বৃন্দা, আমি এই কথা দিচ্ছি যে তুমি ঠকবে না।· আমি তোমাকে ঠকাবো না।

সাঁইত্রিশ বছর বয়স নারায়ণের। রগের কাছের চুলে সামান্য পাক ধরেছে। রং কালো। সুদর্শন মুখ চোখ। সুন্দর চিবুক। খুব লম্বা নয়। তবু বেশ লম্বা দেখায়। বৃন্দার সঙ্গে কথা কইতে কইতে কিন্তু মুখখানা তার ছেলেমানুষের মতো দেখাল। যেন পনেরো ষোল বছরের লাজুক ছেলে।

এ কথা বললে অন্যায় হবে যে শুধু ব্যবসাগত আকর্ষণ থেকেই রাজী হলো বৃন্দা। পুরুষের প্রেম সম্পর্কে তার খুব একটা মোহ নেই। তবু সে শিল্পী। সমুদ্রের মতো উত্তাল, বন্যার মতো দুর্বার একটি প্রেমের স্বপ্ন সে অন্তরে লালন করেছে। সে প্রেমের চরিতার্থতা এই মরজীবনেই হতে পারে কি না তা সে জানেনা। হয়তো হয় না। তেমন করে প্রেম জীবনে আসে না। সে প্রেমের বাসা শিল্পী, কবি, নর্তক ও গায়কের মানসলোকে। বাস্তবজীবনে প্রেমকে পা ফেলতে হয় মেপে মেপে। দৈনন্দিন জীবনে বহু অভ্যাস ও সীমিত মাত্রাকে মর্যাদা দিতে হয়।

যা পূর্ণ, যা চরিতার্থতম পরিণতি, তা বরাবরই মানুষের নাগালের বাইরে।

কাজেই বলা যায় বৃন্দা বেশ সচেতন মনেই গ্রহণ করলো নারায়ণকে। পৃথিবীর সবটুকু চাই, আবার স্বর্গ-ও চাই—এত আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে কে? নিশ্চয়-ই কোনো মানুষ নয়। তবু সুখী হবার আরো পন্থা আছে। বহুজন-আচরিত পন্থা। পরস্পরের জন্যে ত্যাগ করবার, সুখী হবার পন্থা।

শুধু একটা জিজ্ঞাসা ছিল বৃন্দার। তার স্বাধীনতা যেন কোনদিন না ক্ষুণ্ণ করা হয়।

সে প্রতিশ্রুতি দিল নারায়ণ। বলল,—যখন ইম্প্রেসারিও বিয়ে করে নৃত্যশিল্পীকে তখন এ কথা ওঠেনা। এ প্রশ্ন একান্ত অবান্তর।

কথা দিলো বৃন্দা। প্রথমেই তার আচার্য মুথুস্বামীকে জানালো। তিনি আশীর্বাদ জানালেন। তারপর বললেন,—

—জয়ী হও। পরাজয় স্বীকার ক'রোনা।

—সুখী হতে বললেন না আপনি?

মুথুস্বামীর কাছে কিছু আব্দার করতে পারে বৃন্দা। সে জানে আচার্য তাকে স্নেহ করেন। তার প্রশ্ন শুনে চন্দন-চর্চিত প্রশস্ত কপালে অনেক রেখা পড়লো। তারপর সহানুভূতির সুরে আচার্য বললেন,—

—যারা সহজে সুখী হয় তাদের আমি বলতে পারি সুখী হও। তুমি যে ঠিক সুখী হবার সাধনা করছো এমন আমার মনে হয়নি। আমি মনে করি তোমার কাছে জীবনটা অনেকটা জটিল ও সমস্যাবহুল। শিল্পীরা সবসময় সুখী হয়না বৃন্দা, তার চেয়ে জয়ী হও। জয়ের সাধনা করো।

পাত্‌লা রেশমের শাড়ীর বিচিত্র আঁচল লুটিয়ে দিয়ে প্রণাম করলো বৃন্দা।

নারায়ণ যেদিন বৃন্দার হাতে হীরের আংটি পরালো, সেদিনই

জানলো সবাই। সরোজা, পদ্মা, পুষ্পা, কৃষ্ণা, রাজন্, নায়ার, ইদ্‌রিস্। আশ্চর্য হতে পারতো তারা অন্য কারো ব্যাপার হ'লে। কেননা ঠিক এখনই বৃন্দার জন্যে বহু ত্যাগ করবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে জনৈক কুমার, একজন লক্ষপতি চেট্টি ঘুরছেন। মুখুস্বামীর ট্রুপ-এ টাকা দিয়েছেন কুমার সায়েব পাঁচ হাজার। কে না জানে সে বৃন্দারই মুখ চেয়ে। সুন্দরদর্শন যুবক কুমার সায়েব হালফিল এই বছরের সাদা রঙের লিমোজিন গাড়ী নিয়ে কত ঘোরাঘুরি করলেন বৃন্দাকে নিয়ে। নিঃসন্দেহে তিনি দুঃখিত হবেন।

অন্য মেয়ে হলে এরকম একনিষ্ঠ প্রেম প্রত্যাখ্যান করে গোমড়ামুখো নারায়ণ কৌশিককে বিয়ে করতো নাকি?—বৃন্দার মতো?

না। বৃন্দার সঙ্গে তাদের মেলেনা। এ মেয়ে অন্য জাতের। অন্য ধাতের।

বিয়ে হলো বোম্বাইয়ে। আর্যসমাজী মতে। সমুদ্রের ওপরের হোটেলে হলো বিবাহ বাসর। এতটা জাঁকজমক বৃন্দা চায়নি। কিন্তু নারায়ণ ইম্প্রেসারিও। 'শো' অর্গানাইজ করার মতো সার্থক ভাবে পরিচালনা করলো সান্ধ্যউৎসব। বৃন্দা জোহারীর নাচ দেখে যাঁরা মুগ্ধ ছিলেন, সেইসব গুজরাটী, পার্সী, ইংরেজ অভিজাতরা এলেন। কারো আভিজাত্য অর্থে, কারো কৌলীন্যে, কারো বা ব্যবসায়জগতের সাফল্য অর্জনে। সরোজা শান্তিনিকেতনের ছাত্রী। সে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইল। নাচল অনেকেই। মালিনী সুব্রহ্মণ্যম বীণ বাজিয়ে মুগ্ধ করলো সকলকে। অনেককে অবাক ক'রে নারায়ণ নিজে গান গাইল। কে জানতো সে গান গাইতে পারে? বৃন্দার অনুগত কুমার একটি ব্রুচ পাঠালেন—চুণীর রক্তগোলাপ। মরকতের পাতা, সোণার কাঁটায় বুক বিঁধেছে একটি পাখী। হীরে দিয়ে ব্রুচটি ফ্রেম করা। দেখে সবাই ভিড় করে হাসাহাসি করলো। বলল,—

—বৃন্দা এ কি কুমারেরই দূত হয়ে এল ?

মুখু স্বামী অবসর গ্রহণ করলেন। তাঁর ট্রুপ নিয়ে-ই নারায়ণ ও বৃন্দা ঘুরল এখানে সেখানে। বম্বেতে তাদের বাসা হলো হোটেলে। নীড় বাঁধবার কোনো ইচ্ছে বৃন্দার মনে মনে ছিল কি না কে জানে! বিয়ের পর কিন্তু জীবনে তার কোনো পরিবর্তনই এল না। বরঞ্চ আগে কিছুটা নিজের মতো নিরালা জীবন ছিলো। এখন সবটাই হয়ে দাঁড়াল একরকম। ঘর ও বাহির এক হয়ে এল। বাইরে সে সেজেগুজে 'শো' দিতে যায়। ঘোরে এখানে সেখানে। চড়া বাতি জ্বলে। ড্রেস করে 'শো' দেয় সে জনাকীর্ণ হলে। শেষ হ'লে মানুষজন ভিড় ক'রে আসে। প্রেস আসে ইণ্টারভিউ করতে। ওদিকে পোষাক বাক্সে পুরে তালা লাগানো পর্যন্ত নারায়ণের দায়িত্ব ফুরোয় না। হোটেলে ফিরে দেখে বন্ধুজন, পরিচিতজন, সবাই ভিড় ক'রে বসে আছে। তাদের সঙ্গে বসতে হয়। কথা কইতে হয়। রাতে দু'জনে দু'জনের আলাদা ঘরে ঘুমোয়। সকালে আটটা না বাজতে উঠতে হয়। রিহার্সাল আছে। ট্রুপকে দেখাশুনা করবার দায়িত্ব আছে।

এক এক সময় বৃন্দা ভাবে এসব সে কিচ্ছু করবেনা। ছুটি নেবে কিছুদিন।

অবকাশে চলে যায় তারা অন্ততঃ দু'তিনদিনের জন্যে খাণ্ডালা। স্যুইসাইড্ হিলের ওপর ছোট্ট কটেজে পলাতকের মতো বাসা বাঁধে। জনকোলাহলের থেকে আমরা অনেক দূরে পালিয়ে এসেছি—ভাবতে খুব মজা লাগে বৃন্দার। যেন খুব একটা রহস্য আছে এতে। এ ভালোলাগাটা নারায়ণকেও ভাগ ক'রে নিতে হয়। স্টেশানে গিয়ে বৃন্দা বেতের ব্যাগ ক'রে মাওলী মেয়েদের কাছ থেকে বুনোজাম, পাহাড়ী করমচা কেনে। ফলের লাল রসে জিভ আর ঠোঁট লাল হয়ে যায়। বাজার করতে যায় নিজে। খাণ্ডালার ছোট্ট

বাজার। সবজী কেনে। ফুলের বেণী কিনে পরে। আখের রস খায় বাজারের ওপর কাঠের বেঞ্চে ব'সে। কটেজে এসে পৌঁছয় যখন তখন হয়তো বেলা বাজে একটা। বৃন্দা তখন শুয়ে পড়ে বলে,—

—মা গো, এখন আর আমি কিচ্ছু করতে পারছি না।

নারায়ণ ষ্টোভ ধরিয়ে ডিম বানায়, সবজী সিদ্ধ ক'রে মাখন দিয়ে ভাজে, ফল কাটে। দই, সিদ্ধ আলু, মরিচ গুঁড়ো আর ধনেপাতা দিয়ে 'কাড়ি' বানায়। প্যাকিং বাক্সের ওপর খবরের কাগজ বিছিয়ে তুজনে খায়। রান্না নিয়ে বৃন্দা অনেক গবেষণা করে। সবজী, ডিম, মাখন, লঙ্কা, পিঁয়াজ সব সিদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বসে থাকে। খেতে গিয়ে হেসে গড়িয়ে যায়। বলে,—

—মা গো, কত ঝোল রয়েছে দেখ। খেয়ে নাও নারায়ণ। খুব উপকারী।

এরই মধ্যে এক একদিন নেমন্তন্ন করে আসে কারুকে। বৃন্দার রান্নার ওপর নির্ভর করবার তুঃখ জানা আছে নারায়ণের। সে আগেই মালীকে দিয়ে রান্না করিয়ে রাখে। ফুলে ভরা কুর্চিগাছের নিচে বসে খাওয়া হয়। মালীর কুকুরটাকে এই ক'দিনেই বৃন্দা বশ করে ফেলে। অপর্যাপ্ত বিস্কুট খাওয়ায় আর ক্যাম্পচেয়ারে শুয়ে বকবক করে তার সঙ্গে। নারায়ণকে বলে,—

—দেখ, কি রকম ভাষাভরা চোখ দেখ। ও সব বুঝতে পারে। জানো?

চলে আসার সময় কুকুরটার জন্যেই হয়তো মন খারাপ হয় বৃন্দার। আসল সিল্কের স্কার্ফ একটা ওর গলায় বেঁধে দেয়। বলে,—

—পরে আসব।

এরকম ছুটি খুব কমই মেলে। ট্রেনটা যতো বম্বের কাছে আসে তত মনে আসে অস্থির অনিশ্চয়তার ভাব। কি হবে। এবার

কোথায় 'শো' দেওয়া যাবে। টাকার ব্যবস্থা করতে হবে। ট্রুপের মাইনে বাকি এখনো।

বম্বেতে নেমেই সেই পুরনো কার্যসূচী। টেলিফোন। মানুষজন। —ছুটোছুটি, দেখাশোনা, প্রেস। সকলের সামনে নারায়ণের সঙ্গে হেসে হেসে ঘরোয়া কথা বিনিময় করতে করতে বিবাহিত জীবন সম্পর্কে রিপোর্ট দেওয়া—

—আপনি কি মনে করেন, নাচের জন্মে আপনার পারিবারিক জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

—আপনি কি কফি খেতে ভালবাসেন?

—ইসাডোরার আত্মজীবনী সম্পর্কে আপনার মত কি?

—পেশাদার নৃত্যশিল্পীর সমস্যা কি?

—মেয়েদের বিয়ে করা উচিত, না কর্মজীবন গ্রহণ করা উচিত?

মুখে পেশাদারী হাসি টেনে রেখে জবাব দিতে হয় বৃন্দাকে। হঠাৎ ছোট ঘরের সমস্তটা ঝল্‌সে চড়া আলো জ্বলে ওঠে। ছবি তোলা হয়। কাগজে সেই ছবি বেরোয়। আশ্চর্য প্রতিভা বৃন্দা কৌশিক। নৃত্যজগতের তারা!

অতর্কিতে মেঘ ঘনায় অন্য কোণে। অবহিত ছিলনা বলেই বিভ্রান্ত হয়ে যায় বৃন্দা। এ ট্রুপ যে একান্তভাবে কোন পেশাদারী প্রতিষ্ঠান নয়, সে কথা সে কতবার বলেছে—প্রেসকে, ট্রুপকে, নিজেকে। বলেছে এইজন্মে, যে নারায়ণ-ও তাকে সেই কথাই বুঝিয়েছে। ট্রুপের পরিচালনার ব্যবসাদারী দিকটা বরাবরই ছিল নারায়ণের হাতে। বৃন্দা ছিল নৃত্যনির্দেশক। কে কতো টাকা পায় না পায় কোনোদিনই জানতে চায়নি বৃন্দা। নারায়ণ তাকে বলেছে,—

—এসব হিসেব নিকেশের স্থূল দিকটা না হয় আমার ওপরেই ছেড়ে দাও বৃন্দা।

তাই মেনে নিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল বৃন্দা। এবার বাইরে পার্টি নিয়ে বেরোবার প্রাক্‌মুহূর্তে তার ট্রুপ থেকে প্রতিবাদ এলো। ছেলে-মেয়েদের মুখপাত্র হয়ে এলেন সঙ্গীত-পরিচালক প্রবীণ মহারাষ্ট্রীয় বিঠলদাস। ভদ্র ও বিনীত ভাবে-ই জানালেন—

ছেলেমেয়েদের, তাঁর, যন্ত্রীদের সকলের-ই অনেক টাকা বাকী। চারমাস ধরে টাকা পায়নি তারা। অন্ততঃ তিনমাসের টাকা না পেলে কেউ ট্যুরে বেরুবে না।

চাপা রাগে নারায়ণের চোখে ছুরি খেলতে লাগলো। বললো,—

—এখন টাকা নেই। ট্যুরের পরে হিসেব হবে।

বৃন্দা বললো,—

—কিন্তু নারায়ণ, তুমি টাকা পেয়েছো রুস্তমজী-ফ্রামজীর কাছ থেকে। তুমি তার থেকে কিছু দাও। খুব নির্দোষ ভাবেই বলে বৃন্দা। কিন্তু নারায়ণ চটে আগুন হয়ে যায়। বলে,—

—তুমি কি মনে করো আমি টাকা সরিয়ে রেখেছি? পঁচিশজন মানুষকে নিয়ে তিনমাসের জন্যে ট্রেনে ঘোরা, খাওয়া দাওয়ার হিসেব করেছো? বিঠলদাস বলেন,—

—যে টাকা আমরা চোখে দেখিনি তার হিসেব চাইনা। কিন্তু দিল্লী, এলাহাবাদ ঘুরে এলে 'শো' দিয়ে—অসম্ভব পয়সা পেল ট্রুপ। ট্রুপ বলা ভুল। ট্রুপ সে পয়সা চোখে দেখেনি। তুমি কেন তখন টাকা দিলেনা?

—একেবারে লাভ হয়নি বিশ্বাস করুন বিঠলজী। বৃন্দাকে নারায়ণ যা বলেছে, সেই মতো বলে বৃন্দা। বিঠলজী তার দিকে তাকান। শ্লেষের সুরে বলেন,—

—তুমি জানো না বৃন্দা যে সময়ের কথা বলছি আমি। আমাদের বাজারের মধ্যে একটা বাসায় রেখে তুমি আর নারায়ণ সাহেবের বাড়ীতে ডিনার খাচ্ছিলে তখন।

অপমানে লাল হয়ে বৃন্দা ঠোঁট কামড়ায়। বলে,—

—আর কেউ না জানুক আচারিয়া জানে। সে ম্যানেজার।

—আচারিয়া বেইমান। নারায়ণের টাকা খেয়েছে, এদিকে দেখাচ্ছে ক্ষতি হয়েছে।

কুৎসিত একটা পরিস্থিতি। বৃন্দা অনুনয় করে,—

—আমি আর্টিস্ট হিসেবে বলছি আপনাকে বিঠলজী—আপনি বিশ্বাস করুন।

বিঠলদাস মাথা নাড়েন,—তোমার সঙ্গে আমাদের তুলনা হয়না বৃন্দা। তুমি হোটেলে থাকো, মাইশোর জর্জেট পরো, চেঞ্জে যাও নিজের মেজাজ তাজা রাখবার জন্যে। আমরা যারা মিউজিক দিচ্ছি, নাচছি, বাজাচ্ছি, সব করছি—আমাদের টাকাটা-ই ঠিকমতো দাওনা। তা-ও কি সামান্য টাকা! পঞ্চাশ, পঁচাত্তর, আশী! না না, আমি বলে যাচ্ছি পুরো টাকা না পেলে ট্রুপ নড়বেনা। সবাই আগুন হয়ে আছে। ওরা এলে খুব কুৎসিত ব্যাপার হতো। ওদের মানিয়ে বুঝিয়ে রেখে তাই আমিই এলাম। যাহোক ঠাণ্ডাভাবে বলতে পারবো বলে।

বিঠলদাস চলে গেলে পরে নারায়ণের ওপর ফেটে পড়লো বৃন্দা। মাটিতে পা ঠুকে লাল হয়ে বললো,—

—একটা ট্রুপকে হারানো মানে হাজার হাজার টাকা ক্ষতি। সামান্য আড়াই তিন হাজার টাকার জন্যে তুমি এই করেছো? আমাকে শুনতে হলো এইসব কথা? ট্রুপের পয়সায় আমি নবাবী করি? ছি ছি, আমি মুখ দেখাব কি করে? এখনি সব টাকা মিটিয়ে দাও তুমি।

নারায়ণ কোনো কথার জবাব দিল না। চোখ ছোট ক'রে বৃন্দাকে দেখতে লাগলো। তারপর বললো,—

—ঠিক আছে। সব টাকা দিয়ে দেব আমি। ট্যুরটা গুছিয়ে নিই—তারপর ছাঁটাই করবো সব—!

—কি বল্‌লে?

—সেন্টিমেণ্টাল হয়ো না বৃন্দা! কে না জানে ট্রুপ করেছি

আমরা টাকার জন্যে? আর্ট আর্টিস্ট—এ সব কথাগুলো ফাঁকা শোনায় না? আমি যদি না থাকতাম, তাহ'লে কেমন করে চালাতে? ভেবে দেখেছো?

বৃন্দা গিয়ে দরজা বন্ধ করলো।

টাকা মিটিয়ে দিয়ে ট্যুরটা গুছিয়ে নিল বটে নারায়ণ। কিন্তু ট্যুরের মধ্যেই ট্রুপের মনের অসন্তোষে ভাঙন দেখা দিল দলে। টাকাটা দিয়ে যেন আরো অবিশ্বাসভাজন হলো নারায়ণ আর বৃন্দা। চাপা গলায় কানাকানি হলো,—

—ওদের তাহ'লে নিশ্চয় কোনো মতলব আছে!

প্রয়োজনের সময়ে শরীর খারাপ হলো সরোজা আর পদ্মার। মাথার ব্যথায় তারা উঠতেই পারলোনা। 'শো' হলো ক্ষতিগ্রস্ত। বাজনা জমলোনা। নাচ জমলোনা। রাগে দুঃখে হাত কামড়াতে ইচ্ছে হলো বৃন্দার। প্রেস এসে বলে গেল,—

—মিসেস্ কৌশিক, আপনি তো তেমনই alluring আছেন। ট্রুপের অবস্থা এমন কেন?

কাগজে-ও সেই মর্মে খবর বেরুল। শুধু বৃন্দার প্রশস্তি। তাতে ফল হলো উল্টো। একটা মিটিং ক'রে ভুল বোঝাবুঝি পরিষ্কার করতে চেষ্টা করলো বৃন্দা। নারায়ণকে বললো—আমি, তুমি নয়, আমি বন্ধুত্বপূর্ণভাবে মীমাংসা করবার চেষ্টা করি?

নারায়ণ-ও সে মিটিংএ বসে রইল দর্শকের মতো। বৃন্দা কথা কইতে ট্রুপ এমন হট্টগোলের সৃষ্টি করলো যে কোন পরিষ্কার বোঝাবুঝি নয়, চরম পঙ্কিল আবর্তের সৃষ্টি হলো। তুচ্ছতম সব কথা উঠলো। কবে বৃন্দা কাকে ফুল দিয়েছিল, কে না জানে নারায়ণ লাঞ্চ পার্টি দিয়ে বশ করেছে প্রেসকে, এমনি সব কথা! কেউ কম উদ্যমী নয়, কারো শক্তি কম নয়, কথার ঝড় বইলো। কথা দিয়ে পরস্পর পরস্পরকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে তুলোর মতো পিঁজে

ফেললো। অদ্ভুত, অর্থহীন সব ঘেন্না আর ঝগড়ার কথা তুলোর মতোই উড়তে লাগলো ঘরময়।

রেগে বৃন্দা ফেরৎপথে ফার্স্টক্লাশে এলো। ডাইনিং সেলুনে গিয়ে খেল। আলাদা হোটেলে ফিরলো এক বান্ধবীর ফোর্ড চড়ে। থার্ডক্লাশে বসে থালির খাবার খেতে খেতে ট্রুপ হাজার অভিশাপ দিল বৃন্দাকে।

তারপর অতি সহজেই ট্রুপ ভাঙল। নারায়ণ বললো,—

—দেখলে ত? আমি বলিনি ওরা কত ছোট? বৃন্দা মনের দুঃখেও তা মান্‌ল না। বললো,—

—আমারই দুর্ভাগ্য। কারো দোষ নেই।

তারপর প্রেসের মারফৎ সবাই জানল,—বৃন্দা কৌশিক সাময়িক ভাবে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।

বৃন্দা আর নারায়ণ এবার প্ল্যান করে আটঘাট বেঁধে ট্রুপ করবে বলে ঘুরে ঘুরে বাজিয়ে দেখল তাদের বাজার চড়া কি মন্দা। মনে হলো, স্টেটগুলোর কাছে গেলে সাহায্য পাবে কিছু। অনেক শুভানুধ্যায়ী জিজ্ঞাসা করলেন,—এমন ট্রুপ ভাঙলো কেন?

বৃন্দা শাড়ীর আঁচল আঙুলে জড়িয়ে সুন্দর দেখতে হয়ে বসে রইলো। মনগড়া কাহিনীগুলো বললো নারায়ণ। বৃন্দা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে ফরাসী প্রবাদ বা ল্যাটিন কবিতা বলে দুঃখ প্রকাশ করলো। না বুঝে মাড়োয়ারী শ্রোতা আরো মুগ্ধ হলেন।

ট্রুপ করবে বলে আর্টিস্টের সন্ধানে ফিরতে ফিরতে বৃন্দা আর নারায়ণ এলো জয়পুর।

সাধনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের এই হলো ভূমিকা।

৭

সমব্যথী একটি শিল্পী-হৃদয় পেয়ে সাধন তার মন খুলে ধরলো। নারায়ণ, যশবন্ত আর বৃন্দা তিনজনেই শুনল বসে। নারায়ণের সুন্দর চেহারা, মার্জিত আত্মস্থ ব্যবহার সাধনকে জয় করলো সহজেই। বৃন্দা সাধনের কাছে একটা বিস্ময়। বৃন্দা প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী। তার ব্যক্তিত্বও চমৎকার। কতো জানে বৃন্দা, কতো অভিজ্ঞতা তার, তবু কি সরল, নির্ভীক, প্রদীপ্ত তার চরিত্র। যেন প্রোজ্জ্বল আগুনের শিখা। তা ছাড়া সে শুনতে জানে। শুনতে রাধাও জানতো। কিন্তু রাধার স্বভাবই ছিল অন্যরকম। বৃন্দা পরিপূর্ণ নারী। যৌবনের প্রখর উত্তাপ তার মধ্য থেকে সতত বিচ্ছুরিত। সে শুধু শুনতে জানে না, বুঝতে পারে, বলতে পারে। নিজের জীবন থেকে সমগোত্রীয় অভিজ্ঞতার কথা তুলে আশ্চর্য ভাবে সাধনের মনকে টানতে পারে। এমন ধারা শিল্পী সাধন আগে দেখেনি।

তা ছাড়া অর্থ বৃন্দার কাছে কোন সমস্যা-ই নয়। অগাধ টাকা তার নিজের আছে বলে জীবনের তুচ্ছ প্রয়োজনগুলি তাকে পীড়িত করে না। আটকে ধরে না। স্বচ্ছন্দে সে শিল্প, সাহিত্য, ইউরোপের জীবন এবং ট্রুপ সম্পর্কে কথা বলতে পারে। রূপরসগন্ধময় এক সমুজ্জ্বল জীবনের ওপর থেকে যবনিকা তুলে ধরে সাধনকে অবাক করে দিতে পারে। অবচেতন মনের কোন অন্ধ বিশ্বস্ততা এতদিনও সাধনের মনে রাধার ছবিখানি ধরে রেখেছিল। সুন্দর, সুকুমার একটি সমব্যথী মেয়ের মুখ তার মনের সেই গহীনে আঁকা ছিল চীনে পটের মতো ব্যঞ্জনাময় নরম রঙে। এখন যেন রাধা আপনা

থেকেই সরে গেল ম্লান মুখে, বিনা প্রতিবাদে। কোনো অজানা ব্যথায় ভারী হলো সাধনের হৃদয়। নিশ্বাস নিতে বাতাস পেল না। উগ্র ফরাসী সুগন্ধির গন্ধে ভরা সেই স্বল্প বাতাস। কলিজাটা আঁকড়ে ধরেছে একখানা হাত। সে হাতের লম্বা ফর্সা আঙুলের নখগুলিতে লাল রঙ। একটা আঙুলে কমল হীরের আংটি জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে। সে হাত বৃন্দার।

সাধন আর কিছু চায় না শুধু ট্রুপ গড়তে চায়। কাজ করতে চায়। সৃষ্টি করতে চায়। স্বার্থের লেনদেনের গন্ধবিহীন একটি পরিষ্কার পরিবেশ রচনা করতে চায়। এমন একটা ট্রুপ গড়তে চায়, যেখানে সবাই সমান হবে। সবাই মর্যাদা পাবে।

একজন প্রকৃত প্রতিভাবান্‌ শিল্পীর দাম নারায়ণকে বৃন্দা ইতিমধ্যে বুঝিয়েছে। নারায়ণ-ও ভালো করেই বুঝেছে। শিল্পী ছাড়া ট্রুপ হ'তে পারে না। আর এমন শিল্পী সে কোথায় পাবে যার প্রশংসায় কণ্ঠমণি উচ্ছ্বসিত—যে লোকনৃত্য সংগ্রহের জন্যে পড়ে আছে মাসের পর মাস নোংরা বাঞ্জারা ডেরায়। না। সাধনের মূল্য আছে। দাম ফেরৎ পাবে নারায়ণ রজত মূল্যে। ক্ষতি হবে না।

এ সব কথা আগেই হয়ে গিয়েছে বলে সাধনের কথা শুনে নারায়ণ উৎসাহে সোজা হয়ে বসলো। সাধনের হাত দুখানা ধরে বললো,—

—শুধু একটা দরদী মন পাইনি ভাই। তাই শুধু গুণোগার দিয়েই আসছি এতকাল ধরে। তোমার কথা শুনে মনটা আমার জুড়িয়ে গেল। ভরে গেল।

গাছের গুঁড়ির গায়ে হেলান দিয়ে বসে ছিলো বৃন্দা। উঠে বসলো। বললো,

—ক্রমেই মানুষ দেশের শিল্পকলার দিকে ঝুঁকছে। আমার উৎসাহ আছে। অর্থ আছে। শুধু বড় একলা বোধ করি। জানো ত' যে কোন কল্পনাকে রূপ দিতে গেলেই চাই একজন সমব্যথী কর্মী।

মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলো সাধন। বললো,—

—এ আমারই মনের কথা বৃন্দা। এই কথাই আমি ভেবেছি। আরো বুঝেছি, সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে যে আশ্চর্য সম্পদ আমি দেখেছি, তাকে যদি ফোটাতে পারো তোমার নাচের মধ্যে সেই হবে আসল জিনিষ। সাধারণ মানুষ যে সব নাচ রচনা করে, তার বিষয়বস্তু নেয় পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত থেকে। কেন নেয়? কেন আমরা এত বছর ধরে লালন করছি এই সব জিনিষ? কেননা তার মধ্যে হাজারটা সাধারণ মানুষের জীবনের আদল আছে। তাছাড়া সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মধ্যে কতো ব্রত, পার্বণ, উৎসব—তার থেকে আমরা নতুন বিষয় আহরণ করতে পারি না?

শুনতে শুনতে বৃন্দার চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। বলে,—

—তবে এসো সাধন। অনেকের অনেক কল্পনা থাকে, বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না। অন্ততঃ একবার এমন ঘটনা ঘটুক জীবনে যে আমাদের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবে রূপ দিই আমরা। কে বলতে পারে আমরা জিতব না?

এইসব কথাবার্তা যতক্ষণ চলছে, যশবন্ত একান্ত দর্শক হয়েই থেকেছে। এই সময়ে সে মাঝখানে এসে কথা বলে। বলে,—

—যদি ট্রুপ করো তা হ'লে ভালো করে কথাবার্তা কয়ে নাও।

—কথা বলবার কি আছে?

সাধন বুঝতে পারে না। যশবন্তের কথাগুলি মনে হয় নির্বোধ। বৃন্দা-ও চোখে অসন্তোষ নিয়ে তাকায় যশবন্তের দিকে। নারায়ণ শুধু হাসে। বলে,—

—ঠিক বলেছেন আপনি। নিশ্চয় কথা বলবো আমরা। বলেছি তো, এবার আর কোনো কাঁচা কাজ করবো না। এমন ভাবে চলবো যে বন্ধুজনের মধ্যে যেন কোন ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয়।

পরে রাতে শুতে এসে সাধনকে ডাকে যশবন্ত। বলে,—

—আমার কতকগুলো কথা আছে। তুমি বিশ্বাস করো আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী ?

—বোকামি করো না।

যশবন্ত খাটিয়ার ওপর বসে চুলটা আঁচড়ায় আর বলে,—

—যশবন্ত খুব বোকা নয় সাধন। অন্ততঃ তোমার চেয়ে তার অভিজ্ঞতা বেশী। তুমি জানো না, একটা নেশায় পড়ে আমি ট্রুপ জীবন যাপন করেছি অন্ততঃ চারবছর। বৃন্দাকে আমি জানতাম না। নারায়ণের সঙ্গে বিয়ে হবার পর ওদের ট্রুপ হয়েছিল যাদের নিয়ে, আমি তাদের অনেককে চিনি। যারা ওদের ট্রুপকে গড়তে সাহায্য করেছে তাদের-ও অনেককে জানি। নানা জনের নানা কথা আমার মনে আছে। তার সবটাই মিথ্যে হতে পারে না। বহু মানুষকে ওরা ঠকিয়েছে—

—যশবন্ত !

যশবন্ত আশ্চর্য হয়ে তাকায়। বলে,—

—এগুলো আমার কথা নয়। তোমার জন্যে বলছি। আমার কি স্বার্থ থাকতে পারে বলো ?

সাধন লজ্জিত হয়। যশবন্ত বলে,—

—আমি তাদের জানি না। আমি তোমাকে জানি। ধরে নিচ্ছি আমি, যে তাদের ব্যবসা-বুদ্ধি কম। আবার অনেক মানুষের কথা মনে পড়ছে যারা মিথ্যা কথা বলেছে বলে মানতে পারি না। তাই আমার মনে হয়, এসব প্রশ্ন তো পরে উঠবে-ই। না হয় তুমি জানতে চাও না—উপেক্ষা করো এসব কথা। কিন্তু অন্যান্য ছেলে মেয়ে যারা আসবে ? তাদের সঙ্গে ত' কথা একটা বলতেই হবে তোমাদের ? তা-ই আমার মনে হয়—কার কতটুকু অংশ থাকবে এতে, অথবা কিছুই থাকবে না, সব বলে কয়ে নেয়াই ভালো। নইলে যে কোনদিন দেখবো আবার তুমি ঘুরে ফিরে আমার কাছেই চলে এসেছো।

—তখন জায়গা দেবে না তুমি ?

এতক্ষণে যশবন্ত খাস আজমীরিতে গালাগালি শুরু করলো।

—কি বলছো অমন করে?

—আদর করছি তোমায়। বলি ভেবে দেখেছো, আমার বৌ-য়ের চেয়ে-ও তুমি বেশী সময় নিচ্ছো আমার?

—যশবন্ত, আমার জুতো ছিঁড়ে গেছে।

—পায়ের নিচে কাঠের তক্তা বেঁধে ঘোর গিয়ে।

—আমার জামা দরকার। আমাকে জামা বানিয়ে দাও।

ঈশ্বর ওপর দিকে বাস করেন এই বিশ্বাসে যশবন্ত ছাদের দিকে হাত তুলে হতাশা জানালো। বললো,—

—তোমাকে কম করে চারবার জামাকাপড় বিছানা পাঠালাম—সেগুলো দিয়ে এলে নোংরা জিপসীগুলোকে। এখানে এমন ক'রে বেড়াও, যে দেখে আমার বাড়ীর লোক অবাক। আমি বুঝিয়েছি বাঙালীরা ভাবুক আর বিপ্লবী হয়। তারা উদাসীন হয়। এতদিনে তোমার খেয়াল হলো যে, বিশ্রী রকম জামাকাপড় পরে বেড়াচ্ছো তুমি? যে কথাগুলো বললাম খেয়াল করেছো?

সাধন হাতের ওপর মাথা রেখে মিটিমিটি হাসলো। বললো,—

—এ রকম হয়ে বৃন্দার সঙ্গে ঘুরতে আমার লজ্জা করে।

—আমি কি বললাম এতক্ষণ ধরে?

—কালকে আবার শুনবো। যশবন্ত, তুমি বৃন্দার নাচ দেখেছো?

—না। আমি তোমায় দেখছি। অবাক মানছি। খুব হতাশ শোনালো যশবন্তের গলা। সে বললো,—

—তুমি বোধহয় প্রেমে পড়ছো সাধন।

আলোচনা করতে ব'সে যশবন্ত, সাধন, নারায়ণকে অবাক ক'রে দিয়ে বৃন্দা বললো,—

—আমি, নারায়ণ আর সাধন, তিন জনেই সমান ভাবে অংশীদার রইলাম।

—সে আবার কি ?

সাধনের দিকে তাকিয়ে মধুর হাসলো বৃন্দা। বললো,—

—তোমার বোঝার দরকার নেই। এর মানে হলো, ট্রুপ থেকে লাভ হ'লে সে লাভ তোমার। আবার ক্ষতি হ'লে ক্ষতির ভাগ-ও নিতে হবে। আমার লাভ ক্ষতি তোমার-ও হলো আজ থেকে। বুঝলে ?

সাধন মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলো। এর সম্পর্কেই তাকে সাবধান হতে বলেছিলো যশবন্ত ? বললো,—

—বা বৃন্দা, তুমি কি ম্যাজিক জানো! বলছো ট্রুপ হলো, অমনি ট্রুপ হয়ে যাবে ?

নারায়ণ একটু হাসলো। বললো,—

—নারায়ণ সে ভার নিচ্ছে সাধন। দেখো তুমি—কি করতে পারি না পারি ? এরপরে অনেক কিছু করবার আছে। পেট্রন জোগাড় করা ও প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা, কনস্টিটিউশন বানানো, ছেলেমেয়ে ঠিক করা।—বলো কি সাধন, সবে ত' শুরু হলো কাজ।

রাতের বেলা ঘুমোতে এল যখন ঘরে—নারায়ণ বৃন্দাকে বললো,—

—তখন একেবারে যে বলে বসলে, সমান অংশ সকলের ? তুমি কি গতবছরের অভিজ্ঞতা ভুলে গিয়েছো ? ওকে তুমি যথেষ্ট টেনেছ। ও অমনিতেই রাজী হতো।

চুল সামনে এনে টান করে ব্রাস করছিল বৃন্দা। চুলগুলির ফাঁক দিয়ে তাকালো নারায়ণের দিকে। বললো—

—তাতে কি হয়েছে ? কোন প্রশ্নই ও তুলবে না। নারায়ণ চিন্তিত মুখ করে মাথা নাড়লো। বাঙালী মাত্রেই গোলমাল করে। তারা মোটে মেনে নিতে জানে না কিছু। বড় প্রশ্ন তাদের মনে। বড় বিদ্রোহী তারা। বৃন্দা এবার চুলটা যত্ন করে বাঁধলো। গরম জল দিয়ে মুখে ভাপ নিলো। তুলোতে আসল চন্দনের গুঁড়ো

মাখিয়ে মুখ পরিষ্কার করলো। তারপর নারায়ণের সামনে এসে দাঁড়ালো। বললো,—

—যদি কোন গোলমাল হয়, তুমি সব সময়ই ক্ষতি দেখাতে পারবে। তোমার খাতা রইলো। লাল কালি রইলো।

হাসিতে ভরে গেল নারায়ণের মুখ। বললো—

—এতদিনে তুমি বুঝছো বৃন্দা। ট্রুপ এবার চমৎকার হবে। কোন গোলমাল হবে না।

—বলছো?

ব'লে বৃন্দা শুয়ে পড়লো। নারায়ণের ইচ্ছে হলো একটু কাছে আসে। ঐ টান টান সুঠাম যৌবনতপ্ত দেহ একটু জড়িয়ে ধরে। স্বাস্থ্য ও যৌবনের একটা সুরভি আছে বৃন্দার ফর্সা গলায়, গালে, বাহুতে, পায়ে।

কিন্তু বৃন্দা রাজী হলো না। বললো,—যাও। ভালো লাগছে না।

নিজের খাটে এসে বসলো নারায়ণ। তারপর ট্রুপের কন্‌স্টিটিউশনের টাইপ করা কাগজগুলোর মধ্যে ডুবে গেল।

* * * *

তারপর তিনমাস ধরে যা যা হলো, তা সাধনের কল্পনাতেও ছিল না। বৃন্দা ঝড়ের মতো ঘুরল এখানে সেখানে। রাজবংশের রক্ত তার গায়ে। কাজেই পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অনেক রাজা-রাজড়াকে-ই পেল। রাজামহারাজারা অনেকেই পশ্চিম প্রবাসী। তবু বৃন্দার টাকার অভাব হলো না। জয়পুরের উপান্তে মহারাজার দাক্ষিণ্যে চমৎকার একটি বাংলো পাওয়া গেল। ভারতীয় শিল্প-কলার প্রতি কার অনুরাগ কতটা আন্তরিক সে প্রশ্ন উঠলো না। একজন যদি এ কারণে পাঁচ হাজার দিতে পারেন, আর একজন টেক্কা দিয়ে ছয় হাজার দিলেন। সরকারী মহলের সাহেবসুবো, পার্শী ও গুজরাটি ধনপতি শিল্পপতিদের মধ্যে এমন সব মানুষের নাম

পেট্রন হিসেবে পাওয়া গেল, যে তার নিচে নাম সই করতে রাজা-মহারাজা ধনকুবের কারোই আপত্তি হলো না। ফ্রামজী রুস্তমজী প্রমুখ, চেট্টি, আয়ার, প্যাটেল অনেকের নাম মিলিয়ে খুব সম্মানজনক হয়ে উঠলো পেট্রনদের তালিকা। প্রেসিডেন্ট হলেন বম্বের নানুভাই জাভেরী। প্রৌঢ় শিল্পপতি। হাজার কাজের মানুষ। অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের মতো বৃন্দার ট্রুপেরও প্রেসিডেন্ট হতে আপত্তি হলো না তাঁর। বরঞ্চ বৃন্দাকে দেখে শুনে খুবই ভালো লাগল। বললেন,—

—এ একটা সৌভাগ্য মিসেস কৌশিক।

প্রেস-এর মূল্য যে এতখানি তা জানতো না সাধন। ট্রুপ থাকবে জয়পুরে। বৃন্দা প্রেসকে পার্টি দেবে বম্বে আর কলকাতা গিয়ে। এর মানেও সে বুঝলো না। বৃন্দা খুব হেসে বললো,—

—পরে বুঝো সাধন। এখন কাজ করতে দাও।

বম্বেতে এসে প্রেসকে ডাকলো বৃন্দা তাজে। তাজ-এ বিরাট পার্টি হলো। এই ট্রুপের মস্তো আদর্শবাদের কথা কলকাতা বম্বের সব কাগজে বেরুল। সাধনের ছবি বেরুল বাঞ্জারা দলের সঙ্গে। কে জানতো ছবি তোলবার সময়ে নারায়ণের এই মতলব ছিল। সাধনের সম্পর্কে বৃন্দা অনেক কথা বললো বলে প্রেসের একজন হর্তাকর্তা মিষ্টি দুষ্টুমি করলেন। কাগজে সাধনের নাম বেরুল—'Country needs such artistes' এই শিরোনামায় এক প্রবন্ধে। তাতে তাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নামগুলির সঙ্গে যথেচ্ছ তুলনা করা হলো। সে সব মানুষের নামও শোনেনি সাধন। সবাইকে জানানো হলো, এই খাঁটি শিল্পীটিকে নিয়ে বৃন্দা কৌশিক নতুন ট্রুপ শুরু করছেন। আদর্শবাদের মশাল জ্বালিয়ে যাত্রা শুরু করছে কলাতীর্থম্।

ছেলে, মেয়ে, যন্ত্রী, সঙ্গীত পরিচালক সকলকে নিয়ে এলো নারায়ণ। কাগজ ও প্রতিষ্ঠান মারফৎ আহ্বান গেলো ছেলেমেয়েদের কাছে। আদর্শবাদী শিল্পীপ্রাণকে উদাত্ত আহ্বান জানানো হলো।

বাংলা থেকে এলো গোপাল, নগেন, অমিয়। মহারাষ্ট্র থেকে এলো শঙ্কর, মারুতি, মনোহর। গুর্জরের সতীশ, নরসিং, প্যাটেল, শান্তা, অনসূয়া, কুসুম। দক্ষিণ থেকে এলো তরুণ সঙ্গীত-পরিচালক বিখ্যাত যন্ত্রী কৃষ্ণন্ আয়ার। তা ছাড়া এলো রাজন, রেড্ডি, কৃষ্ণা, এস এম বীণা, সুশীলা, কমলা।

সাধন আশীর্বাদ চেয়ে পাঠালো কণ্ঠমণির কাছে। রাধার সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে তিনি কেমন ভাবে নেবেন বুঝলো না। তাই কিছু লিখলো না। কণ্ঠমণির আশীর্বাদ এলো। তিনি লিখলেন —সার্থক হও। নিজের পথ খুঁজে পাও।

আরো জানালেন—তিনি পুরোপুরি অবসর গ্রহণ করেছেন। মধুকুঞ্জ ভেঙে গিয়েছে। ছেলেমেয়েরা চলে গিয়েছে। সাধনের খোলন্দাজের দরকার আছে কি? শ্যামকে তিনি পাঠাতে পারেন।

এমনি ধারা চিঠিগুলি ফ্রেম করে কলাতীর্থমের ড্রয়িংরুমে রাখলো বৃন্দা। টাকা পাঠিয়ে দিল শ্যামের নামে। ক-দিন বাদে, টিকি, কণ্ঠি আর খোল সমেত শ্যাম এসে পড়লো। এসে সাধন আর যশবন্তকে দেখে আশ্বস্ত হলো। বৃন্দাকে দেখেই অবিশ্বাস করলো। সাধনকে জিজ্ঞাসা করলো,

—এইহানে কি মাইয়া মানুষই কর্তা না কি?

হেসে চলে গেল বৃন্দা। আর্টিস্ট হলে নানারকম খামখেয়ালী থাকবে তাদের। কথা বলবে তারা আবোল তাবোল।

শ্যামকে নিয়ে সাধন খুব আদর যত্ন করলো। কথা শুনলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সাধনই ভেঙে দিয়ে এসেছে মধুকুঞ্জ, বলতে গেলে। কেননা তারপরেই ভাঙন ধরেছে। বাবা অসুস্থ খবর পেয়ে বম্বেতে ফিরে আসে রাধা। তার আগেই তার দক্ষিণে গিয়ে নাচ শেখবার পরিকল্পনা ছিল। এখন যে রাধা কোথায় আছে, কি করছে, বলতে পারে না শ্যাম। বললো—রাধাদিদিরে যে কি চক্ষে দেখছিল বড়কর্তা। তানার মনেই দুঃখ হৈলো বেশী।

শুনে মনটা কেমন যেন উদাস হলো সাধনের। মনে হলো রাধা হারিয়ে গিয়েছে। অনেক মাইলের দূরত্ব, অনেক মানুষের মিছিল, অনেক পথ অনেক দিকে গিয়েছে—তারই মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে।

ক্ষণিকের অবসাদ কোথায় চলে গেলো। নতুন জীবনের প্রাণ-বন্যায় ভেসে গেলো সাধন। বাংলো বাড়ীখানা অনেক মানুষের কথায় বার্তায় মুখর। মিস্ত্রী কাজ করছে, দর্জি পোষাক বানাচ্ছে, কাঠের দেয়াল, টালির চাল আর পাথরের মেঝেতে ছোট ছোট কটেজ উঠছে—দেখতে দেখতে চোখের সামনে স্বপ্ন হলো সম্ভব। অসম্ভবকে সম্ভব করে যে তার মতো, সেই অদ্ভুত কোনো শক্তির মতো, উজ্জ্বল সুন্দর মনোহারিণী বৃন্দা সাধনের দিকে তাকিয়ে জয়ের হাসি হাসল। বললো,—

—হলো ত'?

—হলো।

ব'লে সাধন কোন আশ্চর্য আবেগে ভেসে গেলো, ভরে গেলো। নতজানু হয়ে বসে পড়লো কাঠের চাঁচ ভরা মেঝেতে, বৃন্দার কোলের ওপর হাত রেখে বললো,—

—আমি তোমাকে ঠকাবোনা বৃন্দা। আমার সাধ্যমতো ভরে দেবো। নিজেকে শেষ করে দেবো।

এ কথা একদিন নারায়ণও বলেছিলো। সে কথা আজ বৃন্দার মনে পড়লো না। সাধনের আবেগদীপ্ত মুখখানায় বিশ্বাস ও আন্তরিকতা জ্বলজ্বল করছে। দেখে বৃন্দার আত্মস্থ, ব্যক্তিত্বদীপ্ত মুখখানার প্রতিটি রেখা নরম হয়ে এল। অকারণেই গলা ভারী হয়ে এলো। চোখে ছলছল করলো জল। বললো,—

—আমার চেয়ে তুমি অনেক বড়ো। তোমার সঙ্গে আমার তুলনা হয়না সাধন।

সেদিন দুজনের মধ্যে কোন একটা সর্ত স্থাপিত হলো। রাখী

বাঁধা হলো কোথাও। সে সর্তের একটি কথাও মুখে উচ্চারিত হলো না। সবই রইল গোপনে, অনুচ্চারিত। তাতেই যেন তার দাম বাড়লো।

৮

কলাতীর্থম্। সাধন-বৃন্দার স্বপ্নসম্ভব। সৃষ্টির মূলে কোন এক ও অদ্বিতীয় নেই। সবই দুই। দুইয়ের মিলনে তবে হয়েছে নতুন সৃষ্টি। পুরুষ ও প্রকৃতির এই দ্বৈত সত্তাকে অস্বীকার করে কে?

সাধন আর বৃন্দার মধ্যে যে শিল্পী-সত্তা ছিল, তা সার্থক হলো দুজনে যখন হলো সমবেত। চাঁদ ও সমুদ্রের পরস্পর আকর্ষণে ভরাকোটালে বান ডাকে এতদিন শোনা ছিল, এখন চোখে দেখে সবাই অবাক মানলো।

ভরতনাট্যম্‌টা-ই ভালো করে শিখেছে বৃন্দা। কৃষ্ণন্ আয়ারের সঙ্গীত পরিচালনায় রচিত হলো 'মনোহরা বন্ধনম্'। কিন্নরী-কন্যা মনোহরাকে মায়াপাশে বন্দী করলো ব্যাধ। তাকে তুলে দিলো রাজপুত্র সুধন্যের হাতে। সুধন্য ও মনোহরার মিলনে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে চাইলো অন্য লোক। মনোহরা ফিরে গেল কিন্নরলোকে। মর্তের ছেলে সুধন্য মনোহরাকে খুঁজে খুঁজে এলো কিন্নরলোকে। সেখানে চন্দ্রালোকে তাদের মিলন হলো।

এই মধুর কাহিনীকে কর্ণাটকী সুরের ঠাটে রূপায়িত করলো কৃষ্ণন্ আয়ার। যন্ত্রীদের নিয়ে দরজা বন্ধ করে চললো সুর নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা।

বৃন্দা, রাজন, রেড্ডি, সুশীলা, কমলাকে নিয়ে নৃত্য রচনা করলো। কাজের সময়ে বৃন্দা অন্য মানুষ। আর সকলের ক্লান্তি আছে তো তার ক্লান্তি নেই। এতটুকু বিরক্তি নেই সহকর্মীদের অক্ষমতা দেখে।

সাধনের অবাধ কল্পনা কোনো বাঁধাধরা ঠাটের মধ্যে মুক্তি পায় না। হাঁপিয়ে ওঠে সাধন। লোকনৃত্য নিয়ে হাজার রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার স্বাধীনতা তাকে দিয়েছে বৃন্দা। ছেলেমেয়েরা সাধনদাদার ভক্ত হয়ে উঠেছে। সকলের সহযোগিতা এমন চমৎকার ভাবে নিতে জানে সাধন, যে তার সাথে মন খুলে মিশতে কারো বাধে না।

মালাবার উপকূলের জেলেদের জীবন নিয়ে নাচ তৈরী করে সাধন। সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে চারজন জেলে মাছ ধরে ফিরলো। তীরে অপেক্ষা করছিল তাদের ঘরের মেয়েরা। এই সবে নৌকোর গলুইয়ে নারকেল ভেঙে দিয়ে তারা শুভেচ্ছা জানিয়ে পাঠিয়েছে পুরুষদের। ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে জেলেরা নৌকো আর মাছ নিয়ে ফিরল। তখন জেলে পাড়ায় উৎসবের হৈ হৈ পড়লো। পুরুষ মেয়েরা এলো। নাচগান হলো।

শঙ্কর, মারুতি, রাজন, রেড্ডি এদের সাহায্য ছাড়া পারতো না সাধন। সকলের মিলিত চেষ্টায় চমৎকার প্রাণবন্ত হলো নৃত্য অংশটি। আয়ারের সঙ্গীতে মালাবার উপকূল থেকে সমুদ্রের ঝোড়ো বাতাস, ঢেউয়ের ডাক, আর উচ্চকণ্ঠে জেলেদের গান যেন অনুভব করলো শ্রবণমননে দর্শকজন। গৃহপ্রত্যাগত পুরুষদের বরণ করবার সময়ে সুশীলা আর কমলা দুই বোন এমন সুন্দর নাচলো যে মুগ্ধ হলো সাধন। বৃন্দাকে বললো,

—এই দুটি মেয়ে আমাদের মস্তো সহায়। কি চমৎকার তুলতে পারে দেখেছো?

বৃন্দা তার দিকে তাকিয়ে হাসলো। বললো,

—আমাকে ধন্যবাদ দাও। কি করে খুঁজে এনেছি বলো?

সাধন ঘাম মুছে মস্তো তোয়ালেটা গায়ে জড়িয়ে বলল,—

—তার অপেক্ষা কি রেখেছ বৃন্দা? এই ট্রুপের সবটুকুই ত' তোমার—তোমারই।

কলাতীর্থমে খাওয়া, বসা, শোওয়া ছকবাঁধা নিয়মে চলে। কারো সঙ্গে কারো তফাৎ নেই। কলাতীর্থম্-কে গ্রাহক পেলো বলে-ই হয়তো যশবন্তের খামারটা টিঁকে গেলো। যশবন্তের ভাঙা ফোর্ড বোঝাই করে সব্জী আসে। তার ডেয়ারী থেকে আসে টিনের ড্রামে দুধ। রিহার্সালের পর সকলকে দুধ খেতে দেওয়া হয়। আবার কোনোদিন সমস্ত দুধই দই বানিয়ে পাঠায় যশবন্ত। সেদিন ঘোল বানাতে বসে বৃন্দা। মস্তো কাঠের বাটিতে দই ফেটায় যত্ন করে। গেলাস ভরে ট্রেতে রাখে। সকলকে পাঠিয়ে দিয়ে সাধনের সঙ্গে সে বসে কাঠের বেঞ্চে। আলোচনা হয়। বৃন্দার সঙ্গে নোটবুক থাকে। সে টুকতে থাকে—কি দরকার, কাকে কি বলতে হবে এইসব।

সাধন আর বৃন্দার একটি যৌথনৃত্য থাকা দরকার। তার বিষয়বস্তু খুঁজে হয়রাণ দুজনে। বৃন্দা একদিন বললো,—

—সাধন, আগে যখন কথা কইতে, রাস উৎসবের কথা তোমার মুখে কতবার শুনেছি। এসো আমরা রাসটা নিই। তোমার বেশ অভিজ্ঞতা আছে।

সাধন বললো,—

—রাস? কিন্তু রাধা সাজবে কে?

বলেই তার মনে হলো রাধার কথা। চোখে বুঝি বা সেই স্মৃতি চারণার কোমল ছায়া নেমে বর্তমানকে করেছিলো অস্পষ্ট। তাই বৃন্দা বললো,—

—সে কি সাধন? তুমি রাধা খুঁজে পাচ্ছনা? সাধন মাথা নাড়ল। তারপর ঈষৎ হেসে বললো,—

—একজনের কথা মনে পড়লো। সে হয়েছিল রাধা, আমি হয়েছিলাম কৃষ্ণ। পূর্ণিমায় সেই রাসউৎসবে সে নেচেছিল। সে থাকলে বড় সুন্দর হতো বৃন্দা।

—তারপর?

—আরো কি আশ্চর্য জানো, তার নাম-ও রাধা।

—তাতে আশ্চর্য হবার কি আছে সাধন ?

বৃন্দার কথাগুলোকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে কোন্ সুর বাজে বুঝতে পারে না সাধন। বলে,—

—আশ্চর্য নয় ? আমার খুব আশ্চর্য লাগে।

বৃন্দার মুখখানা কেমন যেন দেখালো। সে বললো,—

—তাকে আসতে বললে না কেন ?

—কোথায় গেছে কে জানে ?

বৃন্দার চোখে বেদনা, মুখে হাসি। সে বলে,—

—তবে তো রাস নাচা হলো না সাধন।

—না।

—দেখ, আমার-ও রাধা সাজা হলো না। সাধন বৃন্দার কাঁধে হাত রাখল। বললো,—

—তুমি বুঝি সেই কথা ভাবছ। তুমি কেন রাধা সাজবে না বৃন্দা—তবে এ-রকম বিষয় নির্বাচনে ত' তোমারই আপত্তি ছিল। আর আমি যে তোমার জন্যে অন্য কথা ভেবেছি। আমি আর তুমি হীর-রঞ্জা নাচবো। তা ছাড়া কি ভেবেছি জানো ত ?

—কি ভেবেছ ?

—তোমার আর আমার ফসল কাটার নাচ। চাষার মেয়ে তুমি, আর আমি চাষী।

রিহার্সাল যখন পুরোদমে শুরু হলো, বৃন্দাকে দেখে অবাক হলো নারায়ণ। এতদিন ধ'রে বৃন্দাকে দেখছে সে, কিন্তু এ বৃন্দা তার কাছে অপরিচিত। কুশলী শিল্পী বৃন্দা, নিপুণ তার শিক্ষা। কিন্তু শিক্ষা ও কৌশলের অতীত কোথাও বাস করে সেই অপূর্ব, নামহীন সুন্দর। —যাকে হৃদয়ে উপলব্ধি করলে তবে প্রাণবন্ত হয় নৃত্য, সঙ্গীত, শিল্প। যেন সরোবরে সুন্দর পদ্ম ঘুমিয়ে ছিল। সূর্যের তাপ লেগে হেসে জেগে উঠল। প্রস্ফুটিত পদ্মের উন্মীলিত পাপড়ির সে

আনন্দ হিল্লোল যদি মানুষের মধ্যে দেখা যায় তবে কি মনে হয় ?

যা মনে হলো নারায়ণের, তা স্বীকার করতে পারলো না সে নিজের কাছে-ও। এর নাম প্রেম। এ যদি প্রেম হয়, তবে নারায়ণ কোথায় নেমে গেল, কত ছোট হয়ে গেল,—তুচ্ছ হয়ে গেল ? না। নিশ্চয় এ প্রেম নয়।

নারায়ণের চোখে এই প্রশ্ন দেখলে পরে হয়তো সচেতন হতো বৃন্দা। কিন্তু বৃন্দার চোখে এখন আর সাধন ছাড়া আর কিছু নেই। মনোহরা সে। কিন্নরকন্যা সে। তার রাজপুত্র সুধন্য। বিচ্ছেদ হলো যখন, তখন বনে এসে বিরহিণী মনোহরা কত তুঃখই করলো। তারপর এলো সুধন্য। মিলনের নৃত্য তুজনের হাতে হাতে ধ'রে। তুজনকে আরতি ক'রে।

সে নাচ দেখে অবাক হলো সবাই। এমন ঐক্য সম্ভব হয় কি ক'রে ? তারা শুধু ধন্য ধন্য করলো। নাচের শেষে সাধন চাইলো বৃন্দার দিকে। ঘন ঘন নিঃশ্বাসে ওঠানামা করছে বৃন্দার বুক। কপাল ঘামে ভেজা। 'বান্ধা' ছাপের ঘননীল শাড়ী লেপটে আছে গায়ে। মূর্ত যৌবন যেন। সাধনের চোখের প্রশংসা দেখে হাসলো বৃন্দা। যেন গোপনে বাজি ফেলেছিলো তারা। এখন যেন হার নয়, তু-জনেরই জিত হলো। তুজনেই আনন্দিত হলো।

ফসল কাটার নাচে তুজনে তুজনের কাছে এলো। শুধু এই নাচের ঘরে নয়। আরো কোথাও, মনে মনে। বৃষ্টির মুখে ফসল বাঁচাতে তুজনেই যেন কষ্ট করলো। আবার পাকা ফসল হাতে হাতে কেটে মাথায় তুলে ফিরতে তুজনেরই আনন্দ হলো। বাংলাদেশের লালপাড় কাপড় সাধারণ চাষীর মেয়ের মতো পরল বৃন্দা। ফসল গোলায় তুলে তুজনেই আনন্দ করলো অন্যান্য কিষাণ কিষাণীর সঙ্গে।

হীররঞ্জায় বিরহিণী নায়িকা বৃন্দা চন্দ্রভাগার তীরে বনে বনে

বিচরণ করে। তার উচ্চ ও করুণ বিলাপকে সঙ্গীত বলে ভুল ক'রে কাছে এলো হরিণ। বল্‌লো—আমি সঙ্গীত পিয়াসী। সামান্য পাতার শব্দে ভয় পাই আমি। আজ দেখ: তোমার গান শুনে কাছে এলাম।

বৃন্দার মধ্যে মূর্ত হলো বিরহিণী নায়িকা। 'হীর' গানের সু-উচ্চ সুর যেমন ধেয়ানের কণ্ঠে প্রাণ পেল—এই করুণ ও মধুর লোক-গাঁথার সঙ্গে ভংড়া ও কাওয়ালী মিশে এক অভিনব নৃত্য অংশ হলো হীর।

নাচ রচনা করে সাধন—রিহার্স্যাল চলে, আসন্ন ট্যুরের প্রস্তুতি হয়। কাজ ছাড়া অন্য কিছু চোখে পড়েনা তার। ক-দিন থেকে ছেলে মেয়েদের মধ্যে কি নিয়ে যেন একটা চাপা হাসি আর লুকোন ইঙ্গিত চলছিল। কি হয়েছে তা সাধন জানে না।

হঠাৎ তার মনে হলো রাজন্ আর বীণাকে নিয়ে-ই চলছে ঠাট্টা। তার-ও মনে হলো, দেখেছে বটে তাদের বাগানে বেড়াতে। সন্ধ্যার পর বারান্দায় দাঁড়িয়ে গল্প করতে। খুব ভালো লাগলো তার। বৃন্দা আর নারায়ণের সঙ্গে রাতে বসে কথা কইতে কইতে বললো,—

—এখানে কেমন রোমান্স চলেছে জানো?

বৃন্দা বোধ হয় জানতো না। শুনে-ও খুব খুসী হলো না।

কে জানতো সেই কথা থেকে অনেক কথার সৃষ্টি হবে? যশবন্তের কাছে দিন তিনেক কাটাতে গেলো সাধন। ফিরে এসে দেখে সরগরম ব্যাপার। তার কাছে এলো বীণা। সংযত, আত্মস্থ, কম কথার মেয়েটি। মানসিক উত্তেজনা কণ্ঠে প্রকাশ পেলো না। নাকের ডগাটা একটু ফুললো শুধু। বললো,—

—সাধন দাদা, তোমার কি দরকার ছিলো বৃন্দাকে রাজনের কথা বলবার?

—তাতে হয়েছে কি?

ভেবেই পেলো না সাধন। বীণার পরের কথা শুনে সে ত' অবাক।

—সম্ভবতঃ চলে যাবো আমরা।

—সে কি!

বীণার কথায় জানা গেল রিহার্স্যালের ত্রুটি বিচ্যুতি নিয়ে বীণাকে অপমান করে বৃন্দা। তারপর রাজনের সঙ্গে মিশতে বারণ করে। তাদের দুজনের কেউ-ই নাকি বুঝছে না যে, এ সব বাজে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লে ট্রুপের-ই ক্ষতি হবে।

সাধন বললো,—

—কেন কি বলেছে বৃন্দা আমি শুনে দেখি। আমার মনে হয় অতি সামান্য ব্যাপার। এতখানি গুরুত্ব না আরোপ করলে-ও পারি আমরা। তুমি ভেব না বীণা।

বৃন্দা তার কাছেই আসছিল। বীণাকে দেখে ভ্রূ ঈষৎ তুলল। বীণা বেরিয়ে গেল। বৃন্দা বস্‌লো। বলল,—

—কি বলছিল?

—কিছু না। কি হয়েছে কি বৃন্দা?

—কিছুই না। ওরা ছেলে মানুষ। বড্ড বাড়াবাড়ি করছিল। একটু সাবধান করে দিলাম। ট্রুপের পক্ষে ত' খুব ভালো নয় জিনিষটা।

—সে কি বৃন্দা! কি বলছো তুমি। দুটি ছেলেমেয়ে মেলামেশা করছে—তাতে কি হয়েছে?

—তুমি বুঝবে না সাধন। প্রথমে এমনই নির্দোষ দেখায় ব্যাপারটা। তারপর আসে অন্য চিন্তা। এই করে ট্রুপে ভাঙন ধরে।

—তা হ'লে তোমার আমার মেলামেশা-ও বন্ধ করতে হয় বলো! না বৃন্দা, তোমার কাছে আমি এইসব ছোট জিনিষ আশা করি না। এতে ট্রুপের বিশ্বাস ভেঙে যাবে। ছি! বৃন্দা আধোচোখে তাকালো। তারপর একটু অবাক হলো। সাধন বললো,—

—বৃন্দা তুমি কাউকে আঘাত করতে পারো না। আমি বিশ্বাস করি না। এরকম ক'রো না বৃন্দা।

বৃন্দা হেসে ফেলল। বললো,—

—বেশ! ভুলে গেলাম আমি। হলো ত'?

—মুখেই শুধু বললে হবে না। বীণার কাছে তুমি মাপ-ও চাইবে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের সঙ্গে যদি ভাল ব্যবহার না করবে তো চলবে কি ক'রে বলো?

যেমন কথা সেই কাজ। বীণার কাছে গিয়ে অনুতপ্ত বৃন্দা মাপ চাইলো। দেখেশুনে অবাক হয়ে নারায়ণ শীষ্ ভেতরে টানলো। বললো,—বৃন্দা, তুমি মাপ চেয়ে এলে বীণার কাছে?

—সাধন বললো।

—সাধন বললো?

নারায়ণের চোখে চোখ পড়লো বৃন্দার। ঈষৎ হেসে গুন্‌গুন্ গান করলো বৃন্দা। বললো,—

—এ সব ছোট কথা আর আমার কানে তুলো না নারায়ণ। আর যা-ই হোক আমি ট্রুপটার কোন ক্ষতি চাই না।

নারায়ণ বৃন্দাকে দেখলো। অবাক হয়ে চেয়ে রইলো।

বৃন্দা তারপর সাধনের অবসর সময়টুকুও নিল। সময় মানে তো প্রহর ঘণ্টা পল অনুপলের সমষ্টি। সূর্য উঠলে দিন হয়। সূর্য ডুবলে রাত আসে। এ সব কথা নতুন করে জানতে হবে তা ত' জানতো না সাধন। হঠাৎ কেমন করে তার সমস্ত দিন রাত্রি সময় প্রহর ভরে দিলো বৃন্দা। দাতা ও গ্রহীতা কেউই জানলো না কোথা দিয়ে কি হলো। অন্ততঃ সাধন যে অসাবধানে ছিলো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

সকাল থেকে রাত অবধি দেখা হয়। তবুও কথা বলার সময় মেলে না। ট্রুপ যাবে সফরে। ট্রুপের এখন বড় ব্যস্ততার সময়।

কলকাতা, বম্বে সানন্দ অভ্যর্থনা জানালো কলাতীর্থম্‌কে। সাধন আর বৃন্দার যৌথনৃত্যগুলির প্রশংসা হলো সবচেয়ে বেশী। সমবেত দর্শকজন ধন্য ধন্য করলো। এমন একাত্মতা শুধু কবির কল্পনাতেই সম্ভব। পাদপ্রদীপের আলোয়, রঙীন রঙ্গমঞ্চে, ঐকতানের পটভূমিকায় যে স্বর্গ রচিত হলো, তাতে সাধন আর বৃন্দা দুজনে দুজনকে খুঁজে পেল। সাধনের মনে হলো, সে শুধু রাজপুত্র সুধন্য নয়, সে যেন মর্তের মানুষের সুন্দরের জন্য কামনার মূর্ত রূপ। আর বৃন্দা?

সাধনের অন্তর বললো—বৃন্দা সেই সৌন্দর্যলক্ষ্মী যাঁর চরণপাতে বিকশিত হয় পদ্ম।

ফিরবার আগের রাতে বম্বেতে মালাবার হিল্‌সের বাড়ীতে মস্তো পার্টি দিলেন নানুভাই জাভেরী। ট্রুপের অদ্ভুত সাফল্যে তাঁর-ই আনন্দ হয়েছে সবচেয়ে বেশী। বহু জিনিষে ঝোঁক ছিল নানুভাই-এর। শুধু সংস্কৃতি নিয়েই মাথাটা ঘামাননি। কিছু মানুষে লেখে, পড়ে, গান গায়, ছবি আঁকে, নাচে, এই অস্পষ্ট ধারণা ছিলো তাঁর অবচেতন মনে। সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু তাঁকে ভাবতে হয়নি। গ্রহ উপগ্রহরা বলেছে,—এর পরে যদি আপনি ও-সব চিন্তা-ও ঢোকান মাথায়! প্রয়োজন কি? সে জন্যে তো অন্য মানুষ আছে! এক মাথায় আর কত কথা ভাববেন?

কলাতীর্থমের 'শো' দেখে নানুভাই-এর খুবই বিস্ময় লাগলো। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এলেন নিজের বাড়ীতে। বৃন্দাকে দেখে দেখে তাঁর আর বিস্ময় ফুরোয় না। বৃন্দাকে-তো প্রিন্সেস বললেও হয়—কি তার সারল্য, কি মনখোলা মেয়ে আর কি প্রতিপত্তি! কলাতীর্থম্‌কে অতিথি ক'রে তাঁর নিজের সম্মানই বা কতো বাড়ল। কাগজে কাগজে তাঁর-ও ছবি, তাঁর সম্বন্ধে কথা। খুবই খুসী হলেন নানুভাই। কি দেবেন যে উপহার এদের ভেবে পেলেন না। নিজের মিল থেকে কাপড়ের বেল এনে দিলেন পর্দা বানাবার জন্যে।

লাইটের সেট্ দিলেন একটা, একটা টেপ রেকর্ডার। বৃন্দা বারবার বললো,—কি প্রয়োজন? কেন আপনি এত খরচ করছেন?

আরো মুগ্ধ হলেন নানুভাই। ভুলেশ্বর কল্‌বাদেবীর বাজার উজাড় করে শহরে যতো পাওয়া যায়, কাঁচ আর পুঁতির কাজ করা জামা কাপড় এনে দিলেন। মেয়েদের সকলকে দিলেন শাড়ী। একটু দুষ্টুমি করা উচিত মনে হলো তাঁর। সাধনকে বললেন—

—তোমাকে হিংসে হচ্ছে আমার। তুমি বৃন্দার পার্টনার।

—শুধু স্টেজে!

ব'লেই হাসলো বৃন্দা। বললো,—

—কথা দিয়েছেন, মনে আছে তো? জয়পুরে আসছেন এবার!

পার্টির রাতে মালাবার হিল্‌সের ওপরের বাড়ীটা আলোয় ঝলমল করে উঠলো। এখন অপরূপ হয়েছে এপ্রিলের মালাবার হিল্‌স্। উঁচুনিচু রাস্তার দুইপাশে ফুটেছে অজস্র কৃষ্ণচূড়া। সমুদ্রের উত্তাল বাতাসে গাছে গাছে দোলা লাগে। স্বপ্ন যদি কারো চোখে থাকে, তবে সে পরিবেশ নিয়ে স্বপ্ন রচনা করতে পারে। নিজে সে স্বপ্নরাজ্যে ঘুরে বেড়াতে পারে। আলো জ্বললো বিশাল বাগানের সর্বত্র। পদ্মফুলের লেকের পাশে হলো বসবার জায়গা। অনেক মানুষ এলো।

স্নান ক'রে ঘননীল রেশমের শাড়ী পরলো বৃন্দা। স্বল্পপ্রসাধনে সুন্দর হলো। আজ আর বৃন্দার কোথাও প্রসাধন সোচ্চার নয়। চুল নামিয়ে বাঁধা। আকাশনীল রঙের জামাটিতে আরো নরম দেখাচ্ছে।

খাদ্যপানীয়ের ব্যবস্থা প্রচুর। চোখ একটু রঙীন হতেই সমাগত জনের মনমেজাজ খুলে গেল। খোলাখুলি কথাবার্তা শুরু হলো।

নারায়ণ নিঃসঙ্গ বোধ করলো। মিসেস্ পাক্‌বাসা দুই কাণের লম্বা লম্বা মুক্তোর দুল দুলিয়ে তাকে আমন্ত্রণ করলেন—

—কৌশিক, কোথায় যাচ্ছ?

তাঁর টেবিলে বসে একটু উস্‌খুস করেই উঠে গেলো নারায়ণ। দেখলো বৃন্দা আর সাধন ব'সে কথাবার্তা কইছে মিসেস্ মুদ্‌গলকার আর ম্যাডাম রুস্তমের সংগে। সাধন বলছেনা, শুনছে। বৃন্দা-ই বলছে। একলা যেন শতমুখে কইছে। হাসছে, চোখ তুলছে, কতো-রকম গ্রীবাভঙ্গিমা করছে। তাকে হাজার বার অভিনন্দন জানাচ্ছেন মুগ্ধ শ্রোতারা। নারায়ণের চোখ খুব বিষণ্ণ দেখালো। দেখ কি নিমকহারাম মেয়ে! এ সব কথা বলার সময়ে তুই তোর স্বামীকে পাশে ডাকবি। একটা ট্যুর দিয়ে আসতে না আসতে সব কথা ভুলে গেলি? ঐ বাঙালী ছেলেটাকে তোর ভালো লেগেছে! আর কি মূর্খ ঐ ছেলেটা! পোষাক করতে জানেনা, চুল এলোমেলো—মস্তো আর্টিস্ট! আমি সব বুঝি। বুঝি না কি আর যে, প্রেমের প্রস্তুতি চলেছে? গত তু' দিনের মধ্যে বৃন্দার সঙ্গে একান্তে আলাপ করা একবারও সম্ভব হলো না। বসলেন উনি, শুনলেন। টাকা-পয়সার কথা তুলতে ভুরু তুললেন, যেন উনি রাজরানী—আমি চাকর। বুঝিনা কি, যে আধখানা মন তোর অন্যত্র ছিল? এখন উনি নরম-সরম, যেন সলজ্জ বধূটি। বুড়ো বয়সের—!

এখন একবার বৃন্দার নাম ক'রে মনভ'রে গালি দিয়ে তবে নারায়ণের মনে হলো, একদিন বৃন্দা তার কাছেও এমনি সলজ্জ সুন্দর ভাবেই আত্মসমর্পণ করতো। বৃন্দার মাকে সে কোনদিন-ও জানেনা। তবু তাঁর কথা মনে হলো। প্রেম করবার স্বভাব পেয়েছিস মার কাছ থেকে। তবু ত' তুই ছিলি তাঁর সন্তান। তোর ত' একটাও নেই।

বৃন্দার নেই মানে নারায়ণের-ও নেই। একথা মনে হতে নারায়ণের খুব অবাক লাগলো। বাতাসে আঙুল দিয়ে লিখে দেখলো কথাটা। তারপর কাঁধ ঝেড়ে এগিয়ে গেলো। বললো,—

—আমি-ও আলোচনায় যোগ দিতে পারি কি?

—নিশ্চয়-নিশ্চয়।

সবাই বলতে নারায়ণ চেয়ারে বসলো। একমুখ হাসলো। তারপর ম্যাডাম রুস্তমকে বললো,

—ইয়োর হাইনেস, আপনি কি জানেন বৃন্দার বয়স কতো?

মদ খাওয়া চলে। কিন্তু মাতাল হওয়া বে-আদবী। বৃন্দা সকলের দিকে তাকিয়ে হাসলো। বললো,—

পুওর নারায়ণ। আমাকে মাপ করুন। এখনি আসছি আমি। ওঠো নারায়ণ।

—হুকুম করছো? আমি তোমাকে নতুন দেখছি না যে, মুগ্ধ হয়ে গলে যাবো।

মহিলারা নিজেই মাপ চেয়ে বিদায় নিলেন। ম্যাডাম রুস্তমের ঈষৎ গোঁফযুক্ত ঠোঁট বেঁকে গেলো বিতৃষ্ণায়। যাই হোক এই ট্রুপে হাজার হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। বৃন্দার স্বামী-ও সে টাকার সুবিধে পেয়েছে। মদ খেয়ে আবোল তাবোল বকছে আবার তাঁরই সামনে?

তাঁরা চলে গেলে পরে নারায়ণকে বৃন্দা বললো,—

—ওপরে চলো।

—তোমার কথায়?

—কি পাগলামি করছো নারায়ণ? শ'য়ে শ'য়ে মানুষ তোমাকে দেখছে জানো?

—কৌশিক দা!

সাধনের কথা শুনেই নারায়ণ তাকে বিশ্রী একটা গালি দিলো। বৃন্দাকে কখনো রাগতে দেখেনি সাধন, তাই অবাক হয়ে চাইলো। পা ঠুকে নাক ফুলিয়ে নিচু তীব্র গলায় বৃন্দা বললো,—

—ইতর! কাপুরুষ!

ব'লেই আঁচল ঘুরিয়ে চলে গেলো বৃন্দা। এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে খুঁজছিলো এদেরই। নারায়ণের ~~পূর্ব~~ পরিচিত সবাই। নারায়ণকে দেখে এগিয়ে এলো তারা। বললো,—

—কৌশিক, আমাদের ফাঁকি দিচ্ছ ? বৃন্দা কোথায় ?

সাধন সরে পড়লো। ঈষৎ প্রমত্ত একজন পুরুষ, একদা নারায়ণের পুরোন ট্রুপে কিছু টাকা খোয়া দিয়েছেন, বললেন,—

—কৌশিক, বৃন্দার নতুন বন্ধুটি কোথায় ?

—বৃন্দার নতুন বন্ধু ? বলো কৌশিক, তাহ'লে সব সত্যি ?

—তাই বৃন্দা এমন রোম্যান্টিক চেহারা ক'রে ঘুরছে ?

—কি দেখলো বৃন্দা ছেলেটার মধ্যে—

—কি বলছো কি, কত বড়ো আর্টিস্ট।

প্রথম জন নারায়ণের সামনে ভারী চ্যাপ্টা মুখখানা নামিয়ে হাসতে হাসতে বললেন,—

—এসো কৌশিক, মন খারাপ ক'রো না। I drink to your loneliness !

—কার ?

—I drink to the very very lonely soul of নারায়ণ কৌশিক !

সবাই হৈ হৈ ক'রে উঠলো। কথাগুলো আপত্তিজনক। কিন্তু ড্রিঙ্কটি বেশ। খেয়ে ফেললো নারায়ণ।

বৃন্দাকে খুঁজতে খুঁজতে এলো সাধন। ঝিলমিল পাতা, একটা নাম-না-জানা গাছ। তার নিচে দাঁড়িয়ে বৃন্দা। নানুভাই আর একজন ইংরেজ ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে কথা কইছে হেসে হেসে। ইংরেজ ভদ্রলোক সাধনকে নমস্কার করলেন। বললেন,—

—আপনার নাচ দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আপনি আশ্চর্য।

লাজুক হেসে সাধন বৃন্দার দিকে তাকালো। নানুভাই বললেন,—

—বৃন্দার-ই আবিষ্কার সাধন।

বৃন্দা সাধনের পাশে দাঁড়ালো। শ্যাম্পেনের রিমঝিম্ নেশায় তার কাছে জগৎসংসার সুন্দর। সাধনের হাতে যখন হাত রাখলো, বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হলো দুজনের দেহে। বৃন্দা বললো,—

—না। আমরা দুজনেই দুজনের আবিষ্কার।

নিচু হয়ে স্বীকার করলেন কথাটা ইংরেজটি। বললেন,—

—সুন্দর কথাটি।

তারপরই বৃন্দা সরিয়ে নিলো হাত। সহসা আত্মসচেতন হয়ে সাধনকে পরিহার করে চলে গেলো নানুভাই-এর সঙ্গে কথা কইতে কইতে।

এ্যাকাশিয়া গাছের পুষ্পিত ডালের পেছনে ছোট ঝিলের ধারে প্যাগোডা ঢঙের একটি লতাঘর। সাধন সেখানে গিয়ে বসলো। সুন্দর ঝিরঝিরে বাতাস। এখন এইখানে আসা উচিত বৃন্দার। বৃন্দাকে আমি কামনা করছি। আমি কি বুঝিনি, আজ সারা সন্ধ্যা বৃন্দা কামনার বিদ্যুৎ-সঞ্চার নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে? এ রকম হবেই। গত ক'মাসে, তোমার সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে-ই ত' আমাদের সম্বন্ধ দিনে দিনে নিকটতর হয়েছে। হয়তো নারায়ণ মনে করে, আমরা তাকে প্রবঞ্চনা করেছি। আমি জানি, আজ-ও বৃন্দার সঙ্গে আমি কোন দৈহিক নৈকট্য উপভোগ করিনি। প্রয়োজন হয়নি। আমি আর সে নাচলাম। নাচবার সময়ে সে হলো আমার প্রিয়া। শুধু তো তালে তালে ছন্দে ছন্দে-ই মিললো না। আরো অনেক পরিচয় হলো তখন। বৃন্দা, তোমার নাচ দেখে আমার অণুপরমাণু সাড়া দিলো। দুজনেই আমরা যখন একেবারে আত্মসমর্পণ ক'রে নাচছি, তখনই দুজনের আত্মায় মিল হলো। রোজকার আমি কতো অসম্পূর্ণ, কতো খর্ব। কিন্তু মঞ্চে যখন দাঁড়াই, সে-ই আমি-ই সত্যিকারের আমি। নাচের তালে তালে আমি তোমার সঙ্গে আমার গভীর মিলনের আনন্দ পেলাম—যাকে কণ্ঠমণি বলতেন—ব্রহ্ম রসো বৈ সঃ—ব্রহ্ম রসের সদৃশ আনন্দ। মিলনের গভীর আনন্দ, তার আরোহণ ও অবরোহণ, সবই আমি সেই সময় পেলাম।

কিন্তু তা-ও বোধহয় সব নয়। অন্ততঃ প্রেমকে স্বীকার করতে হবে বাইরে। উপেক্ষা করতে পারি না। উপেক্ষা করতে পারি না

বৃন্দা, যে তুমি আর আমি পরস্পরের রক্তকণিকাকে চঞ্চল করেছি। আমি তোমাকে কামনা করি। তোমার সুন্দর দেহকে আমার দুই হাতের মধ্যে চাই। নদী ছিল ঘুমিয়ে। তাকে আমরা দুজনে জাগালাম, নিয়ে এলাম, ভরে দিলাম। এখন সে সমুদ্র চাইবে। কেমন ক'রে বলি তা হয় না?

বৃন্দা, তুমি সুন্দর। তুমি হাঁটলে আমার মনে হয়, পায়ে পায়ে পদ্ম ফুটিয়ে লক্ষ্মী এলো। পাকা ধানের মতো পূর্ণতার সৌরভ তুমি বহন করো। তুমি উজ্জ্বল, তুমি সুন্দর, তোমাকে আমি ভালোবেসেছি।

শরৎকালে যখন মাটি গরম হতো রোদের তাতে, সেখানে পা ফেলে হাঁটতে হাঁটতে ধানভরা ক্ষেত, উথালপাথাল বাতাস আর শিউলি ফুলের গন্ধ সব দেখে, ঘ্রাণ নিয়ে তৃপ্তি হতো না। মনে হতো এ সমস্ত আমার। আরো নেব, আরো নেব, নিশ্বাসে, শরীরে, অনেক ক'রে, ফুরিয়ে ফেলে। তোমাকে-ও আমার তেমনি ক'রে লোভীর মতো নিঃশেষ ক'রে, নিজের ক'রে, অনেক ক'রে, নিতে ইচ্ছে করে। বৃন্দা, তোমাকেই আমি চেয়েছিলাম।

ওরা গান গায়। বলে এসব রাগিণী বন্দনা গীত। সোহিনী, মালবী, গৌরী আমি জানি না। যখন শুনেছি, আমি তোমাকেই দেখেছি সেই সব সাজে। প্রিয়তম সঙ্গ সুখে তপ্ত; বিরহে করুণ, মলিন; রত্নবেদীতে রানীর মতো অথবা নিশীথে প্রিয়তমের সঙ্গে কাননে শৈলে বিহরমাণ। তুমিই আমার 'সুন্দর অংগ, অনংগ ভরী ছবি॥ আঁখিয়া ললকৈ দ্যুতি যোবন্ কী ঝলকৈ তন্‌মেঁ॥' তুমি অশান্ত করো, উদ্দাম করো, অস্থির করো, তাই তোমাকে ভালোবেসেছি আমি। বৃন্দা, তুমিই আমার প্রিয়া।

* * * *

অনেক রাতে সাধনকে খুঁজে খুঁজে বৃন্দা এলো লতাঘরে। মালাবার হিল্‌সের কৃষ্ণচূড়া গাছকে উত্তাল করেছে সমুদ্রের বাতাস।

সে বাতাসে সোঁ সোঁ শব্দ। জোয়ার আসছে। পুরো আকাশ খেয়া দিয়ে তখন চাঁদ পশ্চিম আকাশে।

সকলে ঘুমিয়ে না পড়া পর্যন্ত বৃন্দা অপেক্ষা করলো। তারপর নেমে এলো।

উপুড় হয়ে ঘুমোচ্ছিল সাধন। অন্ধকারকে সুরভিত ক'রে এলো বৃন্দা। নিচু হয়ে গায়ে হাত দিলো সাধনের। সাধন জানতো বৃন্দা আসবে। তাই হাত বাড়িয়ে টেনে নিলো তাকে। কাঠের মেঝে। জাফরির ফাঁক দিয়ে শেষ প্রহরের চাঁদের আলো। এলোমেলো ঝোড়ো বাতাস।

হাঁপিয়ে উঠে বৃন্দা নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চাইলো। হাসলো একটু। সাধন বাহু আরো কঠিন করলো। মরুভূমিতে যেমন ক'রে মুখ ঘসতো, তেমনি মুখ ঘসলো বৃন্দার কাঁধে।

বৃন্দার রক্তে যেন সমুদ্রের ঢেউ। ধড়াস ধড়াস ক'রে পাড়ে এসে ভাঙছে। আবার ফুঁসে উঠছে। নিজের কাছে নিজে হারিয়ে যেতে যেতে অসহায় বোধ করলো বৃন্দা। সাধনের হাত উঠে এলো বৃন্দার বুকে। আভরণ, আবরণ, সবই বাধা। বন্য পিপাসায় জর্জর দেহ। নিরাবরণ সেই আদিম সৌন্দর্যকে দুই হাতে চেপে নিজের দেহে পেষণ ক'রে ধরলো সাধন।

সেই বর্বর ও আদিম অনুভূতির অজস্র স্বাদ প্রথম অনুভব ক'রে গলে গেলো বৃন্দা। নিঃশেষে সমর্পণ করলো নিজেকে। পরস্পর পরস্পরের মধ্যে স্বাদ পেলো জলের, মাটির, ঝড়ের।

নদী ঝাঁপিয়ে পড়লো সাগরে আর তাই দেখে লজ্জা পেলো চাঁদ। সমুদ্রের সঙ্গে এমন নিলাজ মাতামাতি যে সে-ও করে, তা ভুলে সে গেলো অস্তাচলে।

আঁধারের লজ্জা নেই। তার অন্তহীন কালো বুকে অনেক ভুলভ্রান্তি মাতামাতি, অনেক কিছু সয়।

সে-ই রইলো সাক্ষী।

৯

অনেক কথাই এতোদিন শুধু কথা ছিলো বৃন্দার কাছে। প্রেম, ভালোবাসা, নিজেকে হারিয়ে খুঁজে পাবার আনন্দ। এখন তাদের মানে বুঝলো বৃন্দা। এত যে সুখ আছে তা সে জানতো না। সে শুধু চাইতো, নিতে জানতো, খুঁজে বেড়াতো সুখ। প্রেম সম্পর্কে অনেক কল্পনা ছিল তার। কার না থাকে? কে না চায় প্রেমের সম্বন্ধে যত পড়া যায়, শোনা যায়, প্রেম ততো গভীর হোক? তবে অন্তরের স্বপ্ন যে জীবনে বাস্তব হ'তে পারে তা বৃন্দা জানতো না। সাধন তাকে তা-ই জানালো। বললো,—

—বৃন্দা তুমি শিল্পী। শিল্পকে ভালবাসো তা-ই তুমি মহৎ। যে সৃষ্টি করতে পারে তার চেয়ে ভাগ্যবান আর কে আছে? বৃন্দা, তা-ই তোমাকে আমি শ্রদ্ধা করি। ভালোবাসি।

আরো কত কথা বলেছো তুমি সাধন, সব কথার মানে আমি বুঝিনি। আমার মধ্যে ছিল একটা জিজ্ঞাসা—জানবার ইচ্ছা। ছিল একটা অন্বেষণ। এত ছিল আমার, তবু আমি ছিলাম অসম্পূর্ণ। ছিলাম নিঃসঙ্গ। আমি নিজেই খর্ব ছিলাম, ক্ষুদ্র ছিলাম। তাই মানুষকে ছোট ক'রে দেখেছি। বিচার করেছি ছোট মাপকাঠিতে। বিচার করেছি, দোষ দেখেছি, লোভীর মতো আঁকড়ে ধরেছি সুখের সামান্যতম প্রতিশ্রুতি। তুমি আমাকে ভ'রে দিলে। আমার নিঃসঙ্গতা দূর করলে। সৃষ্টি করতে পারে কে? যে পরিপূর্ণ। যে অনেক পেয়েছে। পৃথিবীর মতো আমি সেই পরিপূর্ণতা অনুভব করলাম সাধন। আমাকে তুমি সার্থক করলে।

মরুভূমিতে কাঁটা মনসার গাছগুলো দিগন্তব্যাপী রুক্ষতার

মাঝখানে তৃষ্ণার্তের মতো আঁকাবাঁকা ডালপালা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাস বয়ে আনে পরাগ কেশর। সেই মনসা গাছেও কুঁড়ি আসে। ফুল ফোটে। দেখ বিকাশেই সার্থকতা।

পরিপূর্ণতার উপলব্ধিতে ভরা দেহ মন বৃন্দার। চরিত্রে স্বভাবে খোঁচাগুলো ঢেকে গিয়ে নিটোল কোমলতা।

একা যে কিছু হয় না। দুই চাই। সৃষ্টির সেই আদি কথা নতুন জেনে সাধনের মনে জোয়ার ডাকলো। চাওয়া পাওয়ার সমস্ত ধারণা ভাসিয়ে দিয়ে এলো সৃজনের প্রেরণা। নিজেকে মনে হলো অসীম শক্তির অধিকারী। কে বুঝিয়েছিলো তাকে যে, সে হীনবল, সঙ্গতিহীন? অনেক আছে তার। এতো আছে যে, সে-ই ঢেলে দিতে পারে। মনে হলো সে কোনো আদিম কৃষকের মতোই শক্তিমান। যে নিজের জমিতে দাঁড়িয়ে চাষ করে ঝড়েজলে। এই আনন্দে ফসল ফলায় যে, এর সবটুকু তার-ই নিজস্ব। আবার সেই ফসলই অনেকের ভোগে লাগবে। মাটিতে পা, আর আকাশে মাথা রেখে সেই মানুষ নিজের শক্তি উপলব্ধি করে।

মনে হলো এতোদিন যতো মানুষ দেখেছে সে, তাদের সকলের জীবনেই কতো ছন্দ আছে। কতো চাষী, কতো জেলে, কতো যাযাবর মানুষ, কতো নদীর দেশের মানুষ, আবার কতো মরুভূমির ছেলেমেয়ে। সহসা অভূতপূর্ব দায়িত্ব অনুভব করলো সাধন। নৃত্যের মাধ্যমে এদের জীবনকে রূপ দেবার দায়িত্ব। এ দায়িত্ব তার।

সে কি কমজোর? এ হলো দায়িত্ব এড়াবার কথা। কে কার দায়িত্ব এড়ায়? এই সুবিশাল বিশ্বপ্রকৃতি তার নিজের কাজ ক'রে চলেছে মানুষের অলক্ষে অগোচরে। সেখানে কোন ক্লান্তি নেই।

দুর্লভভাগ্য সাধনের যে জীবনের সেই মহোৎসব দেখবার চোখ সে পেয়েছে। দেখে আর জেনে-ও যদি সে তার দায়িত্ব এড়িয়ে যায়, সে কি সচেতন মানসের কাজ হবে? অনেক সচেতন শিল্পী আছে, যারা কোথাও না কোথাও ভীরু। তারা বিশ্বাস পায়না। জোর পায়না।

কি পারি, না পারি, দুঃসাহসিক ভাবে পরখ করে হারজিতের ঝক্কি নিতে পারে না। নিছক শিল্প বা সৌন্দর্য সৃষ্টি ক'রেই তারা চলে যায়। সে মানুষ সাধন নয়। জীবনের দায়িত্ব সে অস্বীকার করে না। এতোদিন যদি বা করেছে, এখন তো আর সম্ভব নয়। এতদিনে সে মনের দোসর পেয়েছে, পাশে পেয়েছে বৃন্দাকে।

এখন কি আর তার পক্ষে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া উচিত ?

না। এতো পেয়েছে সাধন, সে তা করতে পারেনা।

আমি বেইমান নই। আমি অবিশ্বাসী নই। আমি যতো পেয়েছি, তার যতো পারি শোধ ক'রে দিয়ে যাব। বিষ পান ক'রে শুধু অমৃত তুলে দেয়, সে হলো আমাদের শাস্ত্র পুরাণের দেবতা। সেই আদর্শ আমি দেখেছি। আমি অমৃত পেয়েছি। তাই আমাকে অনেক দিতে হবে। এখানেই আমার সার্থকতা।

শ্রদ্ধেয় জীবন। শ্রদ্ধেয় মানুষ। আমার দেশের অন্তরের কথা হলো শ্রদ্ধা। যা দেবো, শ্রদ্ধার সঙ্গে দেবো।

এই সময়টা সাধনের জীবনের এক শ্রেষ্ঠতম লগ্ন বললেও অত্যুক্তি হয় না। নিজেকে বিশ্বাস করলো সে। বৃন্দাকে বিশ্বাস করলো। আর কোনো কথা ভাবলো না।

রচনা করলো নতুন নতুন নাচ। 'পদ্মানদীর উপকথা' এই নাচে প্রলয়ংকরী পদ্মার বুকের জেলেদের জীবন রচনা করলো সাধন। প্রমত্তা নদী পদ্মা। কখনো মাছ এনে দেয় জেলেদের হাতে, নৌকো-গুলিকে বহন করে হাসিমুখে। আবার কখনো মাতামাতি করে আনন্দে। মানুষ করজোড়ে তাকে শান্ত হতে বলে। তবে পদ্মা প্রসন্ন হয়। এই নৃত্য-অংশে পূর্ববঙ্গের উদাত্ত জারি গান যোজনা করলো সাধন। ব্রতকথা পালাপার্বন দিয়ে পূর্ববঙ্গের গ্রামের একটি জীবন তুলে ধরলো।

এক একটা কল্পনা মাথায় আসে আর বৃন্দাকে ডাকে সাধন। অনেক কিছু চাই তার। বৃন্দা সাধনের হুকুম তামিল করে। মোরগ

জড়িয়ে দিয়ে তুই যুবক-যুবতীর প্রেম, তাও দাঁড়ায় প্রাণবন্ত একটি নৃত্যাংশে।

কাজের নেশা এমন ক'রে পেয়ে বসে সাধনকে যে তেমনটি বৃন্দা আর কখনো দেখেনি। সকাল থেকে রাতের মধ্যে দশঘণ্টা ক'রে নাচা এবং শেখানো—তার পরিশ্রমের কথা ভাবা যায় না। যশবন্ত মাঝেমাঝে এসে দেখে নাক সিঁটকোয়। নারায়ণকে বলে—

—মানুষটা করছে কি? দিচ্ছে ত' রিহার্স্যাল। সে জন্যে ক্ষেপে উঠে, না খেয়ে না ঘুমিয়ে সকলকে শুদ্ধ ক্ষেপিয়ে তোলার মানে কি?

সাধনকে বলে,—

—ঘোড়ার মতো পড়বে আর মরবে। কার জন্যে করছো? তোমার পার্টনারদের ত' দিব্যি চেহারা ফিরছে। নিজে মরছো কেন?

কেন, তা সাধন জানেনা। প্রবল একটা জ্বরের নেশার মতো আত্মহারা ভাবে সে চলেছে।

শঙ্করও যশবন্তের কথায় সায় দেয়। বলে,—

—পড়বে আর মরবে। কতজনকেই যে দেখলাম।

নিজেকে ঢেলে দেবার, শেষ ক'রে দেবার নেশাতে সাধন তখন ভরপুর। তার স্বদেশে প্রতিভার জন্ম হয় ঘরে ঘরে। বিকাশের পথ না পেয়ে উপযুক্ত লালন পালনের অভাবে অঙ্কুরে নষ্ট হয়ে যায় সে সব প্রতিভা। নিজের পথ খুঁজে পেয়েছে সাধন। এখন নিজের মধ্যে নিজেকে ধ'রে রাখা সত্যিই কঠিন তার পক্ষে। প্রবল অস্থিরতা আর অতৃপ্তি-ই সৃষ্টির উৎস। তৃপ্তি পায়না সাধন। অস্থির বোধ করে। নতুন নতুন নৃত্যের ভাবভঙ্গী চোখে দেখে সে। মনে হয় যদি খোলা মাঠে হাজারটা মানুষকে নাচাতে পারতো, সে কি অপূর্ব হতো। অনেক মানুষ, বিরাট রঙ্গমঞ্চ—বিরাট স্বপ্ন সাধনের চোখে।

মেতে যখন ওঠে এই পাগল তার কাছে আসতে ভরসা হয় না

কারো। ছেলেমেয়েরা দূর থেকে দেখে দেখে ফিরে যায়। খাবার কথা বলতে এসে ধমক খেয়ে কেঁদে পালায় সুশীলা।

বড় একখানা কাগজ মাটিতে ফেলে চারিপাশে পিন করে তাতে পেনসিল দিয়ে নৃত্য-অংশের স্কেচ করতে করতে সাধন সময়ের হিসেব হারায়। চোখের নিচে কালি পড়ে। বৃন্দা ছাড়া কেউ তাকে মানাতে পারে না সে সব সময়ে। অন্যরা ডেকে ডেকে সাড়া পায়না। একটানা পাঁচসাত ঘণ্টা কাটলে বৃন্দা-ই অস্থির হয়ে ওঠে। জোর ক'রে ঘরে ঢোকে। সাধনকে টেনে তোলে। স্নান করতে পাঠায়।

বীণার বড় মায়া পড়েছে সাধনের ওপর। ছন্নছাড়া মানুষটাকে কেমন ক'রে যেন ভালবেসেছে সেই গোলমালের পর থেকে। সহজে অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার কায়দাটা-ও তার জানা। বৃন্দা-ও যখন সাধনের সঙ্গে মেতে ওঠে, তখন ট্রুপের সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্ধ ঘরে সিগারেটের ধোঁয়া আর কফির তাতে কাটে। ঝগড়া-ও করে দুজনে মাঝেমাঝে। বৃন্দা চ্যাঁচায়,—

—আমার কম্পোজিশনের ধারণা নেই? যতো ধারণা তোমার আছে, না? এত ব্যালে দেখলাম, অপেরা দেখলাম, উনি আমায় কম্পোজিশন শেখাচ্ছেন!

—তবে প্যারিসে যাও। বড় কম্পোজিশনের জহুরী এসেছেন! কটা চাষার মেয়ে দেখেছো জীবনে? জানো তারা কেমন করে আসে, বসে, হাঁটে, ভার বয়?

দুজনের চ্যাঁচামেচি যখন চরম পর্যায়ে ওঠে, তখন বীণা ঢোকে ঘরে। ফুঁসতে থাকে বৃন্দা আর সাধন দু-জনেই। কিন্তু বীণা পরোয়া করেনা। বলে,—

—বৃন্দা, একমিনিট-ও বসবেনা। সবাই না খেয়ে অপেক্ষা করছে। জানো?

—বীণা, বাইরে যাও!

বীণা কানে-ও নেয়না। কোমরে আঁচল জড়িয়ে ট্রে'র ওপর

পেয়ালাগুলো তোলে। কাগজ মুড়ে তুলে দেয়ালের বোর্ডে পিন করে। সাধনের কাঁধে তোয়ালে ফেলে দেয়। হাতে দেয় টুথব্রাস। বৃন্দা-ও উঠে পড়ে বাধ্য হয়ে। খাবার ঘরে গিয়ে বীণা সাধনকে শাসন করে,—

—দই খাও। বেশী করে খাও।

—খাবো না।

—নইলে বিকেলে আমাদের বকবে কি ক'রে?

সাধন ওপরে এসে দেখে চমৎকার ঘরদোর। মাটির ঘটে নিমফুলের ক'টি গুচ্ছ। আরাম ক'রে গড়িয়ে পড়ে সাধন। বলে,—

—বীণা, তুমি কি ম্যাজিক জানো?

এতক্ষণে বীণা একটু হাসে। বলে,—

—বিশ্রাম করো।

দোর ভেজিয়ে দিয়ে বেরিয়ে আসে।

ঘুমোতে শুরু করলে সাধন একটানা চোদ্দ পনেরো ঘণ্টা-ও ঘুমোয় কখনো।

রাজনকে বীণা বলে,—

—দেখছ তো? সাধনদাদার শরীরে কতখানি অবসাদ জমে ছিল? বড় ক্ষয় করে নিজেকে।

রাজন বলে—খুব মুস্কিল ওর পক্ষে।

—কেন?

—একে ও নিজে পাগল। তারপর বৃন্দা!

—এ ভাবে চললে সাধনদাদা বাঁচবেনা।

তখন যশবন্তের কথা মনে পড়ে—ঘোড়ার মতো পড়বে আর মরবে।

এত যে হলো এ শুধু বৃন্দা আর সাধনেরই হলো। এই সব

যুক্তি, পরামর্শ, কথাবার্তার মধ্যে নারায়ণের অভাব কেউ তেমন ক'রে অনুভব করলো না।

নারায়ণ রইল একটু আলগা হয়ে। মুখে অমায়িক হাসি টেনে। সেই একবার বম্বেতে যা সংযম হারিয়েছিলো নারায়ণ। তার পুনরাবৃত্তি আর হয়নি। সে জন্য কোনো ক্ষমা চায়নি সে বৃন্দার কাছে। কেননা পার্টির পরদিন যখন দুজনকে দেখলো তখনই সে বুঝলো, এর মধ্যে নিজেকে নিয়ে ফেলাটা অসম্মানের হবে।

নারায়ণ সংযত হলো ব্যক্তিগত কারণে। নিজের স্বাস্থ্য বিষয়ে মনোযোগী হলো। যোগাসন দিয়ে দিন শুরু। ন-টার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়া। সর্বদাই নিজের কাজে ব্যস্ত। ট্রুপের সুখসুবিধে দেখা। শহরে শো'এর প্রাথমিক চিঠিপত্র লেখা। হিসেব রাখা। ট্রুপে যে কতো টাকা আসছে আর যাচ্ছে তার কোনো হিসেব-ই বৃন্দা রাখেনা। নিজেই তৎপর হলো নারায়ণ। টাইপরাইটার খট্খট্ করে প্রস্থে প্রস্থে হিসেব তৈরী করলো। নিজের কাজেই ডুবে রইলো নারায়ণ।

দেখে সাধন খুব খুসী। —এমন মাটির মানুষ কৌশিকদা!

নারায়ণ নিজের মনে আছে, তা-ই ভালো বৃন্দার কাছে। খুব হাসিখুসীভরা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্বন্ধ দু'জনের মধ্যে। এই ওপর ওপর সৌহার্দ্যটুকু নিয়েই বৃন্দা খুসী। তলিয়ে দেখবার তার সময় নেই। নইলে দেখতো বাইরের মানুষটার আড়ালে সত্যিকারের নারায়ণ কৌশিক-কে। দাঁতে ঠোঁট চেপে সে দেখছে সব, আর জ্বলে যাচ্ছে অপমানে।

সে কথা বাইরের কেউ জানেনা। চোট খেয়ে আহত বাঘের মতো নিজের ক্ষতস্থান নিজেই লেহন করছে নারায়ণ। একলা যখন থাকে, নিজের সঙ্গে তার হাজারটা বোঝাপড়া চলে। একটা অদ্ভুত প্রক্রিয়া। নিজের সঙ্গে নিজে তরোয়াল খেলার মতো।

অনেক দূরের কথা মনে পড়ে নারায়ণের। চোখের সামনে স্ত্রী অপর পুরুষের সঙ্গে প্রেম করছে দেখে চুপ করে আছে কেন সে?

কেননা কথা বলার মুখ তার নেই। কেন নেই? সেখানেই স্মৃতিচারণার কথা উঠলো।

পরিহাসছলে বা হালকা ভালোলাগার খাতিরে ভাসাভাসা ভাবে প্রেম করেছে বৃন্দা অনেকবার। তখন নারায়ণ-ই বলেছে,—

—বৃন্দা, কেন বেকার ঘায়েল করছো বেচারাকে?

—একচোখো হরিণের মতো বোকামি কেন করে ও? আমার সম্বন্ধে কেন সতর্ক থাকে না? আমার কি দোষ?

কখনো বলেছে,—

—বেশ করছি। একঘেয়ে লাগছে আমার।

সে সব সময়ে নারায়ণের কোনো ভয় হয়নি।

ভয় হলো এখন। আর নিজেকেই মনে হলো অপরাধী।

কোনো মেয়ে-ই যে শুধু উর্বশী হয়ে থাকতে চায়না, একথা কৌশিক বোঝেনি। ভেবেছিলো বৃন্দা বুঝি সাধারণ মেয়েদের চেয়ে অনেক ওপরে। সে আর্টিস্ট, সে বৃন্দা কৌশিক, বহুজনের স্বপ্নের কামনা। ভালোবাসা, মান, অভিমান দিয়ে রচা স্বর্গ চাইবে না বৃন্দা সাধারণ মেয়েদের মতন। তাই, যদি-ও একদিন বৃন্দা বিবাহিত জীবন থেকে সেই সুখ আহরণ করতে চেষ্টা করেছিলো, রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের আলোর মোহময় জীবন নয়—একটি একান্ত ব্যক্তিগত সুখী জীবন চেয়েছিলো—বাধা দিয়েছিলো নারায়ণ। মুখ স্বামীর আশীর্বাণীর কথা স্মরণ করিয়েছিলো। বলেছিলো,—সুখ কামনা করতে হাজারজন আছে। আমি তুমি চাইব জয়।

বৃন্দা চেয়েছিলো নারায়ণ তার চেয়ে অনেক বড় হোক। জোর ক'রে দাবী করুক বৃন্দাকে। তা'হলে হয়তো বাধা দিতোনা বৃন্দা। কিন্তু নারায়ণকে ভীরু জেনে যেন আস্তে আস্তে নিভে গেলো বৃন্দা। সে যে প্রিয়া হতে চেয়েছিলো, সে যেন বড়ো লজ্জার কথা। নিজে ত' ভুললো-ই বৃন্দা, নারায়ণকে-ও ভুলতে সাহায্য করলো। নিশ্চিন্ত হলো নারায়ণ।

এখন নারায়ণ বুঝতে পারছে, সে সব কথা বৃন্দা নিশ্চয় ভোলেনি। বৃন্দার অনেক ইচ্ছের কোন মর্যাদা দেয়নি নারায়ণ। তাই এতদিন পর যদি বৃন্দা একজনকে ভালবেসে-ই থাকে, তবে নারায়ণ কিছু কি বলতে পারবে? মুখ আছে তার? হয়তো পা ঠুকে, নাক ফুলিয়ে ফর্সা মুখে আগুন ছুটিয়ে, সমস্ত শরীর থর থর করে কাঁপিয়ে হিস্‌হিসে গলায় বৃন্দা বলবে,—

—তুমি আমার কে? কবে কি দিয়েছো আমায়? আজ আমি নিজের মতো সুখী হয়েছি। তুমি কেন বাধা দিচ্ছ? আমার জীবনে তুমি শুধু ইম্প্রেসারিও নারায়ণ, তার বাইরে আর কোন সম্পর্কেরই দাবী তুমি করতে পারো না।

এ ত' কল্পনার কথা। সে বললে পরে বৃন্দা কি জবাব দেবে সে-ই কল্পনা। মজা হচ্ছে, কোন কথা-ই ত' নারায়ণ বলতে পারবেনা। একদা যে বন্ধুত্বের অঙ্গীকার করা হয়েছিলো, সে কথা বৃন্দা নিশ্চয় ভোলেনি। অঙ্গীকার হয়েছিলো, যে যার মতো স্বাধীনভাবে সুখী হতে পারবে। অপরজন বাধা দেবেনা। তারা দু'জন বন্ধু। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী।

সেই অঙ্গীকার মেনে বহুকাল ধ'রেই তারা একটা সহজ বন্ধুত্বের জীবন যাপন করছে। আঘাত লাগবার কথা নয়। তবু আশ্চর্য মানুষের জীবন, নারায়ণের মনে ভয়ানক আঘাত লাগলো। এমন ঘা লাগলো যে, সবিস্ময়ে নারায়ণ দেখলো বুকখানা তার ভেঙেচুরে যাচ্ছে।

সেই সর্বনাশা পার্টির দিন। তার আগে থেকেই প্রস্তুতি চলছিলো অবশ্য। কোন চূড়ান্ত পরিণতির দিকে উঠছিলো নাটক। সকালবেলা নেশার ঘোর কাটতে সে বৃন্দার কাছে ক্ষমা চাইবে বলে ঘরে এলো। দেখলো উজ্জ্বল হলুদ, প্রায় কাঁচাসোনার মতো একখানা রেশমী কাপড় গা থেকে ফেলে দিয়ে, উদ্ভিন্ন যৌবন নিরীক্ষণ ক'রে দেখছে বৃন্দা প্রমাণ আয়নাখানায়। দেখছে নিজের দেহটা। দেখে বৃন্দার

চোখে সে কি বিস্ময়। মদালস নয়ন, ভরা ঠোঁট, ভরা শরীর। দেখে বুঝলো নারায়ণ।

বৃন্দাকে দেখলো আর সাধনকে দেখলো। বুঝতে বাকি রইলোনা তার।

প্রেমে পড়লে বৃন্দাকে যে এমন সুন্দর দেখাবে, তার চলন, বলন, চাহনি, সব তাতেই সঞ্চারিত হবে রহস্য, তা-ও জানতোনা নারায়ণ। ভয়ানক ঘা খেলো সে। যেন এত সব সম্ভাবনা লুকিয়ে রেখেছিলো বৃন্দা। তাকে কোনদিন জানতে দেয়নি। দুই ঠোঁট ঈষৎ ফাঁক, মুক্তোর মতো দাঁত দেখা যায়, চোখের দৃষ্টি কোথায় উধাও, যেন স্বপ্ন দেখছে বৃন্দা। দিনের বেলা-ই স্বপ্ন দেখতে শিখেছে সে। সবচেয়ে নারায়ণের বেজেছে যেখানে, তা হলো বৃন্দার কাছে সে একেবারে একটা তৃতীয় মানুষ হয়ে গিয়েছে। তার রাগ দুঃখ অভিমানে কিছু এসে যাবে না বৃন্দার। বৃন্দা এখন যে জগতে বাস করে, সেখানে সাধন ছাড়া আর কারো প্রবেশাধিকার নেই। দুজনে দুজনের চোখে চোখে দেখে নিমেষে কেমন একটা নিজেদের জগৎ সৃষ্টি ক'রে ফেলে। চাহনি বিনিময়ে কথা হয়।

নারায়ণ অনেক কথা ভুলতে চায়, কিন্তু পারে না। তার-ই বৃন্দা, তারই চোখের সামনে অপর একটা ছেলের সঙ্গে প্রেম করছে, এ দৃশ্য কি সহ্য করা যায়?

জ্বলে পুড়ে বিষে জর্জরিত হয়ে আছে নারায়ণ। সুযোগ পেলেই সেই বিষ ঢেলে দেবে অন্যত্র। দিয়ে বৃন্দাকে-ও একই বিষে জ্বালাবে। আর এক রকম খেলা জানে নারায়ণ। ভাঙন ধরানো যায় বৃন্দার মনে, যদি সাধন অন্য নারীতে আসক্ত হয়। এখন তা-ও আর সম্ভব নয়। কেননা, একটি মেয়েকে-ও চোখে দেখে না নারায়ণ যে বৃন্দাকে ছাপিয়ে উঠতে পারে। সুশীলা, কমলা অথবা বীণা, সাধনের চোখে এরা কেউ-ই নেই। সাধন রুচির দিক থেকে রাজসিক। নিঃসম্বল মানুষ, টাকা পয়সা চেনে না, কিন্তু প্রেম করবার সময় বৃন্দাকে-ই পছন্দ হলো।

তবু নারায়ণ চেষ্টা করেছিলো। যখন জ্বর হলো সাধনের বীণা-ই অনেক রাত অবধি জেগে বসে তার শুশ্রূষা করলো। পরে বৃন্দাকে আড়ালে ডেকে, নারায়ণ বললো,—

—কি যে করে বীণা! একটু সাবধান হয়ে চললেই পারে।

—কি হলো?

—এই কালই দেখলাম। অনেক রাতে, সাধনের ঘর থেকে—!

নারায়ণের চোখে চোখ রাখলো বৃন্দা। বললো,—আমিই ত' ওকে বলেছি ও ঘরে থাকতে। রাত বারোটায় শঙ্কর গেলো। তার আগে অবধি যে বীণা ছিলো, তা ত' আমি জানি-ই।

—ও! আমি ভাবলাম বুঝি রোমান্স চলছে একটু—

ব'লে নারায়ণ হাসলো নির্মল প্রাণখোলাভাবে। বৃন্দা ভ্রূভঙ্গী করলো। বললো,—

—কি বলছো! তুমি জানো না বীণা আর রাজন-এর কথা?

—ভুলে গিয়েছিলাম।

ব'লে নারায়ণ খবরের কাগজ তুলে মুখখানা ঢাকলো। সাধন যে বিশ্বাস ভাঙতে পারে এ ধারণা-ই যখন বৃন্দার নেই, তখন আর ছোটখাটো অছিলায় ভাঙন ধরবে কি ক'রে? ভেবে ভেবে নারায়ণ কূল পেলো না।

নতুন নাচ কম্পোজ করবার সময়ে থেকে থেকে সাধনের ভীষণ দরকার পড়ে বৃন্দাকে। স্নান করে ভিজে গায়ে-ই ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে এলো। সবে ঘুমোতে গেছে বৃন্দা, তাকে হৈ হৈ ক'রে ডেকে তুললো। অথবা ডেকে না পেয়ে গালাগালি চ্যাঁচামেচি করে ঝড় তুললো। সে সব সময় কোথায় গেলো বৃন্দার ধৈর্যচ্যুত হবার অভ্যাস? কোথায় গেলো তার মেজাজ? সর্বদা বৃন্দা উৎকর্ণ শ্রবণ মনন নিয়ে বসে আছে। সাধন ডাকতে না ডাকতে ছুটে আসে। যা বলে, শোনে চুপ করে একমনে। দেখে শুনে মরে মরে যায় নারায়ণ।

একদিন যখন রাত দুটো বাজে তখনো আসেনি বৃন্দা—নারায়ণ উঠে গেলো। ঘরে নেই ওরা। কোথাও নেই। মনে হলো বাগানের দিক থেকে সুর আসছে। সাধনই গাইছে।

নিশাচরের মতো নিঃশব্দ পদক্ষেপে নারায়ণ গেলো বাগানে। নিমগাছের তলায় শতরঞ্চি পেতে বসেছে বৃন্দা আর সাধন। পাশাপাশি নয়, দূরে দূরে। মাথা নিচু ক'রে একটানা করুণ ও সুন্দর সুরে গাইছে অমিয়, দোতারা বাজিয়ে,—

কি হৈল কি হৈল আমার সই
ও প্রাণ, বলতে কথা—
কথা বলতে পারলাম কই ॥

যারা শুনছে তাদেরই দেখলো নারায়ণ। দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে চুপ ক'রে আছে। যেন তারাই দুজন আছে, আর এই সুর উৎসারিত হচ্ছে কোনো গোপন উৎস থেকে। আর কোনো মানুষ নেই।

দেখে আস্তে আস্তে ফিরে এলো নারায়ণ। তার ঘরের আয়নাটা চিড় খাওয়া। তাতে নিজের বিভ্রান্ত হতাশ মুখখানা দেখলো। তার কপালে সত্যিই ফাটল ধরেছে। সামনের ঐ চিড়টার চেয়ে সে ফাটল আরো অনেক গভীরে গেছে। অনেক অনেক নিচে। তল খুঁজতে গেলে তলিয়ে যেতে হবে।

১০

কলাতীর্থমের প্রথম ট্যুর শুধু সার্থক হয়েছিল। সে সার্থকতার দীপ্তি ম্লান করে দিলো দ্বিতীয় বছরের ট্যুর।

শিল্প প্রযোজনার দিক থেকে অনেক কিছু শিখলো বৃন্দা সাধনের কাছে, যা তার সুদূরতম ধ্যানধারণাতে ছিলো না।

আদর্শবাদিতার কথা স্বীকার ক'রে নিয়েই ট্রুপ গড়তে নেমেছিলো বৃন্দারা। কিন্তু কে না জানে সে সব শুধু কথার ওপর কথার ঠাস বুনোট? এই ট্রুপে প্রত্যেকটি শিল্পীর মর্যাদা সমান। তাদের কাউকে খর্ব করা হবে না। কারো ওপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না কোনো নির্দেশ। ট্রুপের লাভ ক্ষতির হিসেব সকলের সামনে আলোচনা হবে। টাকা পয়সার ব্যাপারটা থাকবে খোলা খাতায়। সকলেই জানবে সব। পরিপূর্ণ বিশ্বাসের ভিত্তিতে গঠিত হলো এই ট্রুপ।

নারায়ণ আর বৃন্দা যখন 'কলাতীর্থম্' গড়লো, তখন তাদের মনে-ও একটা সুস্পষ্ট ধারণা ছিলো। হ্যাঁ, এই সব কথা বলছি আমরা। কিন্তু পেশাদারীভাবে ট্রুপ চালাতে গেলে যে সব নিয়ম মেনে চলতে হয়, তার ব্যতিক্রম করবো কেন? সে সব নিয়ম কোনো কালে-ও খাতায় লেখা থাকে না। যেমন—এ ট্রুপে নাচ, গান, যন্ত্র, মঞ্চসজ্জা, দরকার আছে অনেক শিল্পীর। তাদের কাছ থেকে কাজ আদায় করা হবে মিষ্টিমুখে। কিন্তু সবচেয়ে ওপরে অলিখিত নির্দেশ তারা অমান্য করতে পারবে না। ট্রুপে, ট্রুপের মালিকের চেয়ে বড়ো প্রতিভা কেউ থাকতে পারবে না। স্বতন্ত্র বক্তব্য এবং বৃহত্তর প্রতিভা যার থাকবে, যে ছাপিয়ে উঠবে

বৃন্দাকে, সে স্বচ্ছন্দে চলে যেতে পারে অন্যত্র। তাদের কলাতীর্থম্ চায় না। অবাধ স্বাধীন চর্চার সুযোগ দিয়ে নতুন নতুন প্রতিভা সৃজন করতে চায় না কোনো ট্রুপের মালিক। তারা চায় ট্রুপের কর্মীরা সবাই মালিকেরই ছাঁচে ঢালা তৈরী ম্যাজিক পুতুল হবে। নাচবে যারা, বাজাবে যারা, সঙ্গীত আহরণ করবে যারা, তারা কেউই মালিককে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। নৃত্য, সঙ্গীত, মঞ্চসজ্জা, এই সব বিষয়ে মালিক যতটা জানে তার চেয়ে বেশী তাদের জানবার দরকার নেই। এমন কি মেয়েদের বেশী রূপসী হওয়া অবাঞ্ছনীয়। ছেলেদের পক্ষে অপর কারুকে ভালবাসা অপরাধ।

টাকার ব্যাপারে আরো কড়াকড়ি। কন্স্টিট্যুশানের বজ্র আঁটনে ফস্কা গেরো। লাভের কথা কখনো ট্রুপের সামনে বলা হবে না। বলা হবে শুধু ক্ষতির কথা। পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে টিকিট বিক্রী হ'তে দেখে হয়তো উল্লসিত হয়েছিলো ট্রুপ। কিন্তু সে পূর্ণতা মায়ামরীচিকা। জমার ঘর ফাঁকা। কেমন ক'রে হলো? এই এত বড়ো ট্রুপ নিয়ে চলাফেরা, খাওয়া দাওয়া, পোষাক—এর খরচা নেই? খাতা খুলে লাল কালির দাগ ওপর থেকে নিচ অবধি দেখিয়ে দেওয়া হবে। দেখে শুনে সমবেদনায় গলে গিয়ে চুপ ক'রে থাকবে ছেলেমেয়েরা। এ কথা তারা কোনো কালে-ও জানবে না, যে সত্যি হিসেব রইলো অন্য খাতায়। পৃষ্ঠপোষকদের রাজকীয় হারের চাঁদা সব জমা পড়েনি।

এ হলো চিরকালের আচরিত ধারা। রকমফের হতে পারে। তা ব'লে খোলনলচে পালটে যেতে পারে না। এ সব নিয়ম মেনে চললে তবে-ই দাঁড়ানো যায় পেশাদারী জগতে। শ্রদ্ধা সম্মান পাওয়া যায়। যারা না মানে তারা বোকা। ভালোমানুষ আদর্শবাদী ঐ নামে-ই পরিচিত।

তার কারণ হলো, হারজিতের ধারণাটা আজ-ও বদলায়নি। এমনি করে দশটা শিল্পীপ্রাণের সততার সুযোগ নিয়ে যার অনেক

টাকা হলো, ছুনিয়া বলবে সে-ই জিতেছে। আর যে মানুষটা আখেরের কথা না ভেবে, সৎভাবে বাঁচলো, প্রাণ দিয়ে বাঁচালো আদর্শকে, শুধু একা নয়, দশজনের উন্নতির কথা ভাবলো, সে মানুষের পক্ষে টাকা করা-ও মুস্কিল। আবার টাকা না করলে তাকে-ই সবাই বলবে যে, দেখ, মানুষটা হেরে গেলো।

এই সমস্ত পার্থিব জ্ঞান নিয়েই বৃন্দা ও নারায়ণ এসেছিলো কলাতীর্থম্ গড়তে। তারা যে জগতের মানুষ, সেখানে ধ্যান ধারণা বা আদর্শবাদের কথা খুব বেশী শোনা যায়না। তবে এ কথা বলতেই হবে, যে বৃন্দা বা নারায়ণ এবার ট্রুপের ছেলেমেয়েদের নিয়মিত টাকা দিতে এতটুকু এদিক ওদিক করেনি। সর্বতোভাবে তাদের সুখ সুবিধে দেখেছে। ট্রুপের ভেতরে জীবন যাপনের মানে কোন পার্থক্য রচনা করেনি। বম্বের অভিজ্ঞতা তাদের এসব কথা শিখিয়েছে। আমেদাবাদের একজন শিল্পপতির আতিথ্যে কিছুদিন কাটায় তারা সেই সময়। সবাই বললো তিনি মাটির মানুষ। কাপড়ের কলের সাধারণ মিস্ত্রীকে-ও 'ভাই' ব'লে কথা বলেন। তাঁর বাবার জন্মবার্ষিকীর দিন মিলের দেড়হাজার কর্মীর সঙ্গে সপরিবারে ব'সে খান তিনি।

তাঁর বাড়ীতে গিয়ে বাগানের সুইমিং পুল আর সাদা ময়ূরের জন্য জাল ঘেরা বৃন্দাবন-কানন দেখে সময় কাটালো বৃন্দা। তাঁর একটা কথা কখনো ভোলেনি তারা। তিনি বাগানে দাঁড়িয়ে পাখীকে ছোলা দিতে দিতে বলেছিলেন,—

—দেখ, আমি একজন সাক্‌সেস্। আমার এই সাফল্যের মূল মন্ত্রটি কি জানো? আমি কক্ষণো আমার শ্রমিকদের কোন অসুবিধায় ফেলি না। টাকা পয়সা নিয়ে কোনো গোলমাল করি না। নইলে ভাব কি এই গোলমালের সময় পারতাম ঠেকাতে? লেবার নিয়ে এতটুকু মুস্কিল হয় না আমার। যদি এমন একটি-ও লোককে দেখি যে শ্রমিকদের মাথায় নতুন বুদ্ধি ঢোকাতে পারে, তাকে তক্ষুনি

সরিয়ে দিই। দেখ মিসেস কৌশিক, ঝগড়াঝাঁটি ক'রে কাজ চালানো যায়না। Keep them satisfied. এই হচ্ছে একমাত্র পন্থা।

সেই উপমা মনে ছিলো ব'লেই এবার ট্রুপ গড়বার সময়ে নতুন ক'রে নারায়ণ বা বৃন্দা ভুল করলো না।

শুধু যদি প্রেমে পড়ে ক্ষান্ত থাকতো সাধন, কথা হতো না কোনো। অনেক মানুষ আছে, যাদের কাছে জীবন যাপন একটা ক্লান্তিকর অভ্যাসমাত্র। এই অবসাদ থেকে মুক্তি পাবার জন্যে তারা প্রেম করে। সাধনের জাতই আলাদা। বৃন্দার চোখে ছিলো রোমান্টিক ভালবাসা। সাধনের মনে এ অনুভূতিটা-ও যেমন সজীব, তেমনি উত্তপ্ত ও অস্থির। প্রথমে না হোক, ক-দিন বাদেই সে বৃন্দাকে ঘা দিতে শুরু করলো। বললো,—

—সুশীলা আর মারুতিকে আলাদা একটা কম্পোজিশন দেবো। রাধাকৃষ্ণ।

—সে কি সাধন, তুমি যে বললে রাধাকৃষ্ণ থাকবে না?

—থাকবে না বলিনি, বলেছি তোমাকে দিয়ে ঠিক হবে না। সুশীলা করুক।

—সুশীলা?

—নিশ্চয়। আমি খুব জানি ও চমৎকার পারবে।

অপমানিত হলো বৃন্দা, আর তা বুঝে রেগে চেঁচিয়ে যা তা বললো সাধন। অপমান করবার কথা তার মাথায় ছিলো না। অন্যকে একটু বাড়তে দেখলেই বৃন্দা কেন ক্ষুণ্ণ হবে? বৃন্দার যদি পছন্দ না হয়—!

যুক্তির দিক থেকে কোন ছিদ্র নেই। বাধ্য হয়ে মানলো বৃন্দা। তার পরে পরে—সমানে ঠোকাঠুকি শুরু হলো। মেয়েদের নাচ সংশোধন করান বৃন্দার কাজ। দেখে শুনে সাধন বললো,—

—এ কি করেছ? আমার কম্পোজিশনে ওরা গ্রামের মেয়ে—আপন মনে আনন্দ করছে। ওদের নিজস্ব ভাব কেন নষ্ট করছো

বৃন্দা ? তোমার ছায়া নিয়ে ফেলছো ওদের মধ্যে। ওরা নিজেরা-ও শিল্পী। নিজেদের এক এক ঢংয়ের ব্যঞ্জনা আছে। ধারণা আছে। তোমার ছাঁচে ঢালাই হতে হবে ওদের, তার কোনো মানে আছে ?

সাধনের কথা শুনে বৃন্দা মস্তো ঘা খেলো। কিন্তু তার কি মনে হলো না হলো সে সম্বন্ধে সাধন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। নাচের সময় সে একান্ত নির্মম। অত্যন্ত অনমনীয়। বৃন্দা সেই কঠোরতাকে ভুল বুঝে বারবার আঘাত পেলো মনে। রক্তাক্ত হলো অভিমানে ও অবমাননায়। কিন্তু সাধন ছাড়লো না। তাকে বোঝালো,—

—কোনো মানুষের নিজস্বতার ওপর হস্তক্ষেপ কোরনা বৃন্দা। এতদিন ধরে তা-ই করেছো জানি, তবে ভুল করেছো। তোমার ট্রুপের শিল্পীরা তোমার আজ্ঞাবহ ক'টা পুতুল তৈরী হোক তুমি তা-ই চাও ? না, তারা স্বাধীনভাবে ভাবতে শিখুক, আগ্রহান্বিত হোক, নিজেরা সচেষ্ট হয়ে সহযোগিতা করুক তা-ই চাও ?

এ সব কথা বৃন্দা জানতো। বিশ্বাস করতো না। সাধনকে ভালোবেসে তার মস্তো লাভ হলো। প্রথমে সাধনকে ভালোবেসে সাধনের খাতিরেই বুঝতে চেষ্টা করলো। তারপর আশ্চর্য হয়ে দেখলো, যে না, সাধন ঠিকই বলেছে।

নারায়ণের ঘরে ব'সে এই কথা নিয়ে আলোচনা করতে গেল বৃন্দা আর সাধন। সাধনের পিঠে মৃদু চাপড় মেরে নারায়ণ বললো,—

—কেন আমাকে এসব কথা বলছো সাধন ? এ বিষয়ে তুমি আর বৃন্দা যা বলবে আমি তা-ই মেনে নেবো।

সাধন বললো,—

—বৃন্দার বড় অহংকার ছিলো, গর্ব ছিলো কৌশিকদা। একটা শিল্পীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথে অহমিকাটা মস্তো বাধা কৌশিকদা।

ব'লেই সাধন ক্ষান্ত হলো না। এ কথা বলবার স্বপক্ষে তার

যতো যুক্তি আছে বলতে শুরু করলো। অজস্র কথার ঝড় উঠলো। কোথাকার কথা কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো। এতদিন না হয় পড়াশুনা করেনি সাধন। এখন কলাতীর্থমের লাইব্রেরী থেকে বৃন্দার উপরোধে ভালো ভালো বই পড়েছে সে। বৃন্দা তাকে ফরাসী সাহিত্য থেকে শিল্পীদের জীবনী শুনিয়েছে। সে সব কথা মনে এলো সাধনের। বললো, অহমিকা ত্যাগ করতে না পারলে শিল্পীর পূর্ণ বিকাশ সম্ভব হয় না। বলতে বলতে উত্তেজিত ও আত্মহারা সাধন বললো,—

—দেখেছো, আগের থেকে বৃন্দা কতো চমৎকার হয়েছে মানুষ হিসেবে? বল কৌশিকদা, তার পরিবর্তনটা দেখনি?

কৌশিক সাধনের মুখের দিকে চাইলো। মানুষটা কি মূর্খ? বৃন্দার স্বামীর সঙ্গে না কথা কইছে সে? বৃন্দা-ও অবহিত হলো। বিব্রত বিরক্তিতে বললো,—

—কি বলছো কি সাধন?

হাসিটি বড়ো সুন্দর নারায়ণের। হাসলো নারায়ণ এমন করে, যেন শিশুকে ভোলাচ্ছে। বললো,—

—দেখেছি বৈ কি সাধন! যে দেখেনি, সে কাণা।

এই কথাবার্তার মধ্যে যশবন্ত-ও ছিলো। গাড়ী এসে পড়েছিলো মাঝখানে। তাকে গাড়ীতে তুলে দিতে গেলো সাধন। যশবন্তের সঙ্গে মণ্ডী অবধি গেলো। গাড়ীতে স্টার্ট দিয়ে যশবন্ত বললো,—

—সাধন, তুমি চিরকালের মূর্খ। বললে বুঝবেনা। তবু বলছি কৌশিককে সাবধান। আগুন নিয়ে খেলছো তুমি।

সাধন হাসল। যশবন্ত কেন সাবধান হতে বললো সেটা বুঝতে চেষ্টা করলো না। তবে আগুনের কথাটি ভালো লাগলো। গুনগুন করে গাইলো,—

—যৈসে জ্বলে আগ রে!

দেখে শুনে মাথা নাড়লো যশবন্ত।

সাধনের পরিচালনায় ট্রুপের যে সত্যিই কতখানি উন্নতি হয়েছে, তা বোঝা গেলো দ্বিতীয়বার ট্যুরের সময়ে। এ যে আমাদের নিজস্ব জিনিষ—এর সাফল্যের দায় একান্ত আমাদের-ই—এই বোধ থেকে ছেলেমেয়েরা প্রাণপণ করে খাট্‌লো। এক বছরের মধ্যে এতগুলি নতুন প্রতিভার সন্ধান কেমন করে পেলো এরা, তাই ভেবে অবাক হলো দর্শকজন। কলকাতার সৌখীন প্রেক্ষাগৃহ সপ্তাহের পর সপ্তাহ ভরে রইলো। চড়া আলোর মধ্যে রঙ্গমঞ্চে হাজার মানুষের মুখোমুখি হয়ে দাঁড়ানোর আশ্চর্য রোমাঞ্চ যা কখনো পুরোন হয় না; তার পর আস্তে আস্তে সমস্ত মানুষের উপস্থিতি ভুলে গিয়ে নিজেদের মধ্যে ডুবে যাওয়া; কল্পলোক নিজেরা সৃজন ক'রে নিয়ে নাচের আনন্দে সব ভুলে মাতাল হয়ে ওঠা—এ অভিজ্ঞতার তুলনা কোথায়? হাজার মানুষের করতালিতে ঝড় ওঠে। ছবি তোলে কতজন।

চৌরঙ্গীর ওপরের মস্তো বাড়ীটায় ফিরতে ফিরতে রাত এগারোটা বাজে। বিছানায় শুয়ে ঘামে গা ভিজে যায়। অদ্ভুত একটা উত্তাপ ঘিরে থাকে সাধনকে।

তার-ও পরে আসে বৃন্দা। বলে,—

—সাধন ঘুমিওনা। কি সুন্দর রাত দেখ!

ঘুম ভাঙে সাধনের অনেকবেলায়। ঘামে ভিজে গেছে জামা। শরীর ও মনে অদ্ভুত অবসাদ নিয়ে জেগে ওঠে সাধন। মুখে সব কিছু মনে হয় বিস্বাদ। বীণা একবার বৃন্দাকে বলে,—

—সাধন দাদাকে একবার ডাক্তার দেখাও। কিরকম ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে দেখেছো?

বৃন্দা উড়িয়ে দিলো কথাটা। বললো,—

—সাধনের কোন গোলমাল নেই। চমৎকার আছে ও। ট্যুরের জন্যে একটু পরিশ্রম হচ্ছে। সাধনকে বললো,—

—এবার গরমের সময় তোমাকে নিয়ে আমি নৈনিতাল যাবো।

সেখানে আমার একটা বাড়ী আছে জানো? শুধু আমি আর তুমি। খুব পরিশ্রম হচ্ছে তোমার।

শুনে সাধন ফুঁ দিয়ে কথাটা উড়িয়ে দেবার ভান করলো। বললো,—

—যাও ত' কৌশিকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে বড়বাজার থেকে দশটা চুণরী ওড়নী কিনে আনো। মৌলালীর ওপর থেকে রাঙের গহনা-ও আনো কিছু। কস্ট্যুমে কম পড়ছে।

চলে গেলো বৃন্দা। সাধনের সমস্ত শরীর থেকে উত্তম আর শক্তি বিচ্ছুরিত হয়। কেমন করে ভাবলো বীণা যে, সাধন অসুস্থ?

ভেতর ভেতর যদি ভিত ক্ষয়ে যায়, ইমারতখানা ভেঙে পড়তে সামান্য ঘা-ই যথেষ্ট। নিচ দিয়ে যদি ফাটল ধরে, তখন যে কোনো দিন-ই ধ্বসে পড়ে এতদিনের আশ্রয়। একেবারে অতর্কিতে হলো কি? এ প্রশ্ন খতিয়ে দেখতে গেলে দেখা যায়, না তো—এমন যে ঘটবে তা তো তখন-ও বোঝা গিয়েছিলো। ফাঁপাভিতের ভেতর দিয়ে শোঁ শোঁ ক'রে বাতাস চলতো, তার ডাকে সাবধান বাণী ছিল। ফাটলগুলো দেয়াল বেয়ে উঠে এসেছিলো। তখন এত পূর্বাভাস দেখেও সতর্ক হয়নি কেউ। কেননা একচোখো হরিণের মতো বিপদের সম্ভাবনাকে অবহেলা করা হয়েছিলো। তাই সহসা রূঢ় আঘাতে সচেতন হয়ে দেখা গেলো আর কোনো আশ্রয় নেই।

সব গিয়েছে ভেঙে চুরে।

কলাতীর্থমের এই দ্বিতীয় ট্যুর, যা রসিকজনের স্মৃতিতে এক অনন্য সমুজ্জ্বল গৌরবে আসীন, যার আশ্চর্য সাফল্যের জুড়ি ক্বচিৎ মেলে, তা সাধনের জীবনে-ও অবিস্মরণীয় হয়ে রইলো। এই জন্য, যে তার মধ্যেই পরবর্তী ঘটনাগুলির অঙ্কুর নিহিত ছিলো। সাধনের জীবনের একটা সন্ধিক্ষণ এই ট্যুর। কেননা তারপর-ই তার জীবনকে সুনির্দিষ্টভাবে অন্য পথে ঠেলে দিলো এই সময়কার ঘটনাবলী। সেই মধুকুঞ্জ ছেড়ে আসার পর থেকে এই কলাতীর্থম্ গড়া—এ-ই তার

জীবনের সমস্ত সাধনার পরিণতি। তা-ই ভেবেছিলো সাধন। শিল্পীর পক্ষে যতদূর স্বপ্ন সম্ভব হতে পারে, তার জীবনে তা হয়েছে। আর সব মেলে, শুধু হৃদয়ের দোসর না কি মেলেনা। বাস্তবের মানুষের ওপর কল্পনার হাজারটা রং আরোপ ক'রে রচে নিতে হয় মানসীকে। সাধনের জীবনে তা-ও সম্ভব হলো। বৃন্দা এলো তার পাশে। তার স্বপ্নকে রূপ দিলো। তার জীবনটা ভ'রে দিলো।

এইখানে পূর্ণচ্ছেদ। এরপরে আর হয়না। আর কিছু হতে পারে না। একটা মানুষ অন্তরের তাগিদে সব থাকতে-ও বিবাগী হলো। সে-ই আবার খুঁজে পেলো তার সত্যিকারের আশ্রয়। তারপরে তো আর কিছু থাকে না। এখানে-ই তো শেষ হতে পারতো সাধনের জীবন-কাহিনী।

মানুষের জীবন নিয়ে যে কাহিনীকার অনাদ্যন্ত কাল ধ'রে লিখে চলেছেন, তাঁর দৃষ্টি অনেক দূরে যায়। কার জীবন কেমন ক'রে সার্থক হবে, কার তৃষ্ণার শান্তি কোন্ পানপাত্রে অপেক্ষা ক'রে আছে, কোন্ যাযাবর কোথায় ঘর পাবে, সে বিষয়ে তাঁর স্পষ্ট ধারণা আছে। তাঁর হিসেবটা সব সময় মানুষের চোখে পড়ে না। তাই ব'লে যে হিসেবটা-ই মিথ্যে, তা ত' নয়। আপাত কারণ হয়তো খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই বলে-ই যে এর পেছনে কোন কারণ-ই নেই তা-ও ত' নয়। তাই আমরা যেখানে পূর্ণচ্ছেদ দেখি, সেখানেই সব সময় শেষ হয় না। নটে গাছটি মুড়ুলো ব'লে রাজার গল্পটা নয় শেষ করে দিলাম। কিন্তু সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করতে করতে সেই রাজারানীর ঘরে-ই যদি আগুন লাগে একদিন, হঠাৎ যদি রাজপুত্রের মনে আসে বৈরাগ্য, দুয়োরানী যদি ভাঙা ঘরে ব'সে ছেঁড়া কাঁথার গান গাইতে বিদ্রোহ প্রকাশ করে—তাহ'লে তো আবার নতুন ক'রে গল্প শুরু হয়। এ-ই শেষ, একথা বলতে কবিও ভয় পেয়েছেন। বলেছেন—

—"শেষ নাহি যে, শেষ কথা কে বলবে ?"

গুণীজন একথা বোঝেন। তাই শেষ কথাটি বলতে তাঁদের আপত্তি।

সাধন-ও ভেবেছিলো তার জীবনে সব চাওয়া পাওয়ার পালাই ফুরিয়ে গেছে। এবার এই পূর্ণতার সমের ওপর-ই শেষ আস্থায়ীটি গাওয়া হবে। এমনি করে-ই চলে যাবে দিন।

সে ধারণা যে এই ট্যুরের ঝোড়ো জীবনটা থিতিয়ে বসতে না বসতেই ঝড়ের মুখে কুটো হয়ে উড়ে যাবে সে কথা সাধন ভাবেনি। চৌরঙ্গীর ময়দানের গাছগুলিতে নতুন পাতা আর প্রথম কুঁড়ির সমারোহ দেখেছে বৃন্দার পাশে দাঁড়িয়ে। বিজলীবাতির আলো আর গঙ্গার বাতাসে দ্বিতীয় প্রহরের রাত স্বপ্ন রচনা করেছে তাদের চোখে। তখনো সাধন জানেনি কতো অমোঘ হয়ে ঘনিয়ে উঠেছে ঈশান কোণের রাঙা মেঘ।

পূর্বাভাস সত্যিই তার মনে ছিলো না। শুধু মাঝে মাঝে মনে উঠে এসেছে একটা অদ্ভুত অতৃপ্তি ও অপূর্ণতার স্বাদ। এতো পেয়েছে যে মানুষ, তার ত' সর্বদা-ই ভ'রে থাকা উচিত। কিন্তু তবু দেহ ও ইন্দ্রিয়াতীত একটা অপূর্ণতার বোধ তার মনে এসেছে মাঝে মাঝে। নিজেকে দেখে সে নিজেই অবাক হয়েছে। বৃন্দা-ও অবাক হয়েছে। বলেছে,—

—সাধন, কিসে তোমার ভরবে বলতে পারো ?

সাধন বলেছে,—

—কি ক'রে বুঝলে বৃন্দা ? আমি ত' মুখে বলিনি।

তা-ও যদি না বুঝবে ত' কিসের ভালোবাসা বৃন্দার ? সাধন বলেছে,—তুমি কেন আমাকে শান্ত করতে পারো না বৃন্দা ?

কথাবার্তা এখানেই মিটেছে। তবে এই যে অপূর্ণতার বোধ, সেটা ঝিমিয়ে যাবার আগে বড় জ্বালা দিয়ে গিয়েছে। শরীরে আশ্চর্য অনুভূতি হয়েছে সাধনের। কখনো মনে হয়েছে নিঃশ্বাস

নিতে পারছে না, বুকে চেপে ধরেছে কোন গুরুভার। কখনো মনে হয়েছে দেহ তার জ্বলে গেল, চোখে ঘুম আসেনি। অক্লান্ত পরিশ্রম করলে যেমন অবসাদ বোধ হয়, তেমনই অবসাদের গ্লানি তাকে ক্লান্ত করেছে।

এই দেখেই বৃন্দা চাইলো তাকে নিয়ে বাইরে যেতে। অন্ততঃ একমাসের জন্যে। এ তার অনেকদিনের স্বপ্ন। সাধনকে-ও সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন দেখতে শিখিয়েছে বৃন্দা। সাধনের পায়ের কাছে নিচু মোড়ায় বসে, আস্তে আস্তে কত কথাই যে বললো বৃন্দা স্থন্দর ক'রে। নৈনিতালে যাবে তারা দু'জন আর যশবন্ত। সাধনকে এতটুকু ক্লান্ত করবে না বৃন্দা। যত খুসী ঘুমোবে সাধন। উঠবে যখন, বৃন্দা-ই তাকে কত কি রান্না করে খাওয়াবে। লেকে নৌকো চ'ড়ে বেড়াবে তারা। গরমের সময় বরফ গ'লে জল নেমেছে। আইরিস আর গোলাপ ফুটেছে ও সব জায়গায়। টুকরি ভরে তাজা আপেল বেচে যায় পাহাড়ী মেয়েরা। পাহাড় চারিদিকে ধোওয়া, ঠাণ্ডা বাতাসে বুক অবধি পরিষ্কার হয়ে যায়। সন্ধ্যা হ'লে যে নীল প্রশান্তি নামে তার তুলনা নেই। সেখানে-ই যাবে তারা!

নীরবতা, বিশ্রাম, প্রশান্তি আর অগাধ অবসর—কথাগুলো সাধনকে অদ্ভুত পিপাসিত করলো। তৎক্ষণাৎ চলে যেতে ইচ্ছে করলো তার। সত্যি গত কয়টা বছর কিভাবে যে কেটেছে! সামান্য ক'দিন বিশ্রাম পেলে-ই ভালো লাগবে। তবে অনেক টাকার দরকার।

বৃন্দা হাসলো। বললো,—

—অনেক টাকা রোজগার করেছো তুমি এই দু' বছরে। অন্ততঃ এবারকার ট্যুরে ত' বটে-ই! যা দরকার, তুমি নেবে। এ ত' তোমারই টাকা সাধন।

যতো ভাবলো, ততই উৎসাহিত হলো বৃন্দা। মস্ত একটা তালিকা বানালো। কোনো কিছুই নেই সাধনের। কোন-ও

শখ-ও নেই। সব কিছু-ই তার লাগবে। সে নিজে সমানে শাড়ী কিনছে, যা দরকার হচ্ছে খরচ করছে। বড় স্বার্থপরতা হয়ে গিয়েছে। বৃন্দা এবার সাধনকে সব ক'রে দেবে।

নারায়ণের কাছে বললো বৃন্দা। বললো,—

—তুমি-ও চলো। আমরা সবাই ঘুরে আসি।

—টাকার কথা ভেবেছো ?

—অন্ততঃ দু' হাজার। কিছুই নয় বলতে গেলে। এটা কোনো টাকা-ই নয়।

জতুগৃহ রচিত হয়েছিলো অনেক দিন-ই। আগুন জ্বালাতে একটি স্ফুলিঙ্গের প্রয়োজন ছিলো। অন্ততঃ নারায়ণ তার-ই অপেক্ষা করে বসেছিলো। প্রতীক্ষিত সেই মুহূর্ত যখন এলো, উত্তেজিত হয়ে চ্যাঁচামেচি করে নিজেকে এতটুকু বিক্ষুব্ধ করলো না নারায়ণ। হাসলো। বললো,—

—ঠাট্টা করছো ?

—ঠাট্টা করছো ত' তুমি-ই। কি বলছো কি !

—বলছি ট্রুপের টাকা কোথায় দেখছো তুমি বৃন্দা ? কোথায় টাকা ?

—নারায়ণ !

—হিসেব দেখতে চাও, হিসেব দেখো। চল্লিশজন মানুষের ট্রুপ। সাধন আসবার পর থেকে-ই যে তুমি বদলে গেলে বৃন্দা। আর তো হিসেবপত্র দেখলে না। কলাতীর্থম্ বহুদিন ধরে ঘাটতি বাজেট নিয়ে চলেছে। লাভ হয়েছে কোথায়, যে টাকা দেখছো তুমি ?

নারায়ণের চোখে চোখ রেখে বৃন্দা সহসা দেখলো তার নগ্ন স্বরূপ। কোথায় গেলো নারায়ণের সুন্দর মুখ, আর নির্মল হাসি ? মুখোসটা খুলে ফেলেছে নারায়ণ। এখন তাকে দেখুক বৃন্দা। দুই চোখ ভরে দেখুক। দেখে বৃন্দার মুখে বিমূঢ় অবিশ্বাস আর

একটা ভয়ঙ্কর সন্দেহ ফুটে উঠলো। একটু নিচু হয়ে ঝুঁকলো তার দিকে নারায়ণ। বললো,—

—না বৃন্দা, একেবারে টাকা নেই। তবে এ সব কথা মুখে হবে না। মিটিং ডাকো।

ঘরে যেন আগুন লেগেছে, এমনি ভাবে-ই ছিট্‌কে বেরিয়ে যাচ্ছিলো বৃন্দা। নারায়ণ বললো,—

—আমার সঙ্গে অনেকদিন কোনো কথা বলোনি বৃন্দা। আজ আমি ক-টা কথা বলবো।

নারায়ণ দরজা বন্ধ করে দেখে, ভয় পাচ্ছিলো বৃন্দা। হাসলো নারায়ণ। বললো,—

—ভয় পাচ্ছ? আমি তোমার কিছু করবো না। তবে অনেকদূর গড়িয়ে গিয়েছে ব্যাপার। অন্ততঃ শেষবারের মতো একটা খোলাখুলি কথা হয়ে যাক।

—শেষবারের মতো মানে?

পরুষ রূঢ় কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো নারায়ণ,—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ—শেষবারের মতো। শুরু ত' শুধু তোমাদের। তাতে আমার কি? আমি শেষ হয়ে গিয়েছি। শেষ ক'রে দিয়েছো তুমি আমাকে। ভেবেছো এমনি ক'রেই চলবে? আমি শুধু দেখে যাবো, হজম করে যাবো? তুমি আমায় শেষ ক'রে দেবে, আর আমি তাই মেনে নেবো? যেতে হয় তো ভেঙে চূরে দিয়ে যাবো বৃন্দা। তারপর যদি যেতে হয় তো যাও নৈনিতাল। নৈনিতাল যাও, যেখানে খুসী যাও, নরকে যাও—যা ইচ্ছে করো।

বৃন্দার চোখে-ও আগুন ঝিলিক দিলো। বললো,—

—আস্তে নারায়ণ, আস্তে। কথা শুরু করতে গিয়ে-ই যদি চেঁচিয়ে বুক ফেটে মরো—কথা বলবে কি ক'রে? আর তুমি-ই যে শেষ কথা বলবে তা-ই বা ভাবছো কেন? সে কথা ত' আমারও হতে পারে?

বসলো বৃন্দা। জোরে জোরে সিগারেট টেনে একটু সংযত হলো নারায়ণ। বললো,—

—কথার খেলাপ করেছো তুমি বৃন্দা জোহারী। টাকার কথা বলছো? আজ ন্যায্য দাবী আর টাকার হিসেব চাইছো আমার কাছে? পাঁচ বছর আগে কার মুখের দিকে চেয়ে সমস্ত বাজি রেখে ট্রুপ গড়েছিলাম বৃন্দা? কার জন্যে সকলের অপ্রিয় হয়ে অমানুষিক পরিশ্রম করেছি? আজ আমি তোমার কাছে বাতিল হয়ে গেলাম?

—তুমি ভুল বুঝছো নারায়ণ—

—তুমি যে ভুল করছো!

—তুমি ভুল বুঝছো। ভাবছো এটা আমার একটা সাময়িক নেশা। তা নয়। সাধন আর্টিস্ট। সাধন আর তুমি আমার চোখে এক হ'তে পারো না।

—ও।

ব'লে শীষ টানলো নারায়ণ। মুহূর্ত আগেও কণ্ঠে যে পুরুষের হতাশা বেজে উঠেছিলো তা নিমেষে অন্তর্হিত হলো। বিশ্রী কুৎসিৎ ইঙ্গিত টেনে হাসলো। বললো,—

—শিল্পী পেলো শিল্পীকে—এবার আর কি। রঙ্গমঞ্চ থেকে আমি বিদেয় হবো। কেমন? আর আমাকে সইতে পারছো না। যেতে হয় যাবো বৃন্দা, তবে যাবার আগে তোমার ওই গর্ব আমি মুচড়ে ভেঙে দিয়ে যাবো—আর তোমার পা-চাটা ঐ গোলামটাকে—

—নারায়ণ!

—আমার জীবনের পাঁচ পাঁচটা বছর নষ্ট করেছো তুমি—আমাকে দেউলে করেছো—শ'য়ে শ'য়ে মানুষ জেনেছে তোমার আর সাধনের সম্পর্ক—আমাকে করেছো হাসির পাত্র। ভেবেছো আমি সব ভুলে যাবো? এই সমস্ত অপমান আর অবমাননা—তার শোধ নেবো না? ভেবেছো এর পরে-ও সাধন তোমাকে নেবে?

তোমাকে আমি শেষ করে যাবো বৃন্দা। নিজের চেহারা আয়নায় দেখেছো? ভেবেছো দু'বছর পরে সাধন তোমাকে পুঁছবে? আর্টিস্টরা নতুন নতুন মানুষ চায় বৃন্দা।

—কাপুরুষ! ইতর!

গায়ের জোরে একটা চড় মারলো বৃন্দা নারায়ণের গালে। শব্দ হলো ভীষণ জোরে। সঙ্গে সঙ্গে লোহার মতো হাতে বৃন্দাকে টানলো নারায়ণ। বর্বর শক্তিতে চেপে ধরলো বুকে, বললো,—

—বৃন্দা, সে আশা দুরাশা! আমি ছাড়া তোমার গতি নেই। তার চেয়ে চলো, চুলোয় যাক ট্রুপ, চুলোয় যাক ওই হতভাগা সাধন, আমি তুমি ইউরোপে চলে যাই। অনেক টাকা সরিয়েছি আমি—একটা টাকারও হিসেব নেই—অনেক টাকা, বৃন্দা! যদি বলো সব টাকা আমি তোমার সামনে ফেলে দিচ্ছি। তুমি যদি একবার বলো। তোমার কাছে আমার টাকা কি বৃন্দা?

মানুষ নয়, অন্ধ কতকগুলো শক্তি যেন চেপে ধরেছে বৃন্দাকে। অনেক কষ্টে সে নিজেকে ছাড়ালো। ছিটকে পিছিয়ে এলো। টেবিলের কোণা ধরে নিজেকে সামলালো। নারায়ণের জ্বলন্ত নিঃশ্বাস যেন তার মুখে চাবুক মারছে এখনো। কষ্টে নিজেকে সামলে বৃন্দা বললো,—

—নারায়ণ। এই শেষ! এরপরে তোমাকে আমি এক মুহূর্তও সহ্য করবো না। একটা কথা জেনে রাখো—সাধনকে আমি ভালবাসি। সে আমায় ভালবাসে। তোমার কোনো কথাতেই আমি তাকে ছেড়ে আসবো না। এ কথা সত্যি যে, এর পরে আর একসঙ্গে থাকা চলবে না। যেতে হ'লে তুমিই যাবে নারায়ণ।

—আচ্ছা?

—তবে ট্রুপের কাছে পুরো হিসেব দাখিল করে। তোমার এই ঘৃণ্য চক্রান্তের জন্যে বারবার আমি নিজেকে, নিজের বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে নষ্ট করবো না। পাই পয়সার পর্যন্ত হিসেব দেবে তুমি।

দরজার বাইরে যারা অপেক্ষা করছিলো তাদের মধ্যে সাধনও ছিলো। কোনোদিকে না চেয়ে বৃন্দা চলে গেলো নিজের ঘরে। মুখে হাত চাপা দিয়ে। হোঁচট খেতে খেতে। কিছু না বুঝে সাধনও গেলো পিছু পিছু,—

—কি হয়েছে, কি হয়েছে বৃন্দা? সাধনের বুকে ভেঙে পড়লো বৃন্দা। কাঁদতে কাঁদতে কাঁপতে কাঁপতে বললো,—

—সাধন, নারায়ণ বেইমানী করেছে!

—কি বলছো কি?

—পরে বুঝো, এখন যাও সাধন, একলা থাকতে দাও আমায়!

দড়াম করে দরজা বন্ধ করলো বৃন্দা। বিমূঢ় সাধন নারায়ণের ঘরে গেলো। নারায়ণের চোখে মুখে দুঃখের কালি রেখা। মাথার চুলগুলো দু'হাতে ধ'রে বসে ছিলো খাটের ওপর। সাধনকে দেখে অপরাধীর মতো করুণ হাসলো। বললো,—

—এসো সাধন। তোমাকেই চাইছিলাম। বলো আর্টিস্ট, এখন কি করবে। তোমার কলাতীর্থম্ তো ভাঙতে চললো। এমনি করেই কি সমস্ত আদর্শ ভাঙতে হয় ভাই? সবাই যদি ভাঙবে, তবে গড়বে কে বলো?

—তার মানে?

নারায়ণ বললো,—তুমি বোস। আমি তোমার ওপর রাগ করিনা সাধন। বুঝি তোমার কোন দোষ নেই। সব দোষই হয়তো আমার। বৃন্দাকে আমি সুখী করতে পারিনি। বৃন্দা বলে গেলো, আমাকে যেতে হবে। বেশ, তাই যাবো আমি। ট্রুপের কাগজ-পত্রের বোঝাগুলো শুধু বয়ে বয়ে মরছি। সেগুলো বুঝে নাও, আমাকে ছুটি করে দাও।

স্তম্ভিত সাধন। কি কথা বলবে? সে বললো—আমি কিছু বুঝতে পারছি না। কি হলো তোমাদের মধ্যে? আমি কি করেছি? এ সব কথাই বা বলছো কেন?

নারায়ণ অদ্ভুত ভাবে হাসলো। বিষণ্ণতা, আত্মকরুণা এবং হতাশায় ভরা তার সুর। বললো,—

—অন্য কেউ হলে সাধন, আমি মনে করতাম সে ভান করছে। আমি তাকে উচিত শিক্ষা দিতাম। তুমি সত্যি কথা বলে থাকো। তোমার মতো মানুষ আমি দেখিনি। তুমি কি বলতে চাও একটা কথাও বোঝনি?

—না।

—বেশ আমিই বলছি। তোমায় ভালবাসে বৃন্দা। তুমিও তাকে ভালবাস। আমরা তিনজন মিলে ট্রুপ করেছিলাম। এখন আর একসঙ্গে থাকা সম্ভব নয়। এখন আমার চলে যাওয়া ছাড়া কি উপায় আছে বলো?

চোখের সামনে সাধনের দুনিয়া ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। পায়ের নিচে মাটি নেই। সাধন বললো,—

—তা হয়না। ট্রুপ ভেঙে যাবে।

—ট্রুপ? ট্রুপের কথা ভাবছ তুমি? ট্রুপ গোল্লায় গেছে। আমরা তিনজনই ঠিক থাকতে পারলাম না—ট্রুপের রইলো কি?

—ট্রুপ রইলো। ছেলেমেয়েরা রইলো। তাদের নিয়ে ট্রুপ—কৌশিক! তোমার আমার মধ্যে কি হলো না হলো, তার জন্যে তাদের ভাসিয়ে দিতে পারো না।

সাধনের কথা শুনে নারায়ণের মাথায় সমাধানের কোনো পন্থা খেলতে লাগলো। বিস্মিতও হলো সে। চরম বিস্ময়ে বললো,—

—এসব কথা তুমি সত্যিই বিশ্বাস করো, তাই না সাধন?

—নিশ্চয় বিশ্বাস করি। ট্রুপের কনস্টিট্যুসানে যতগুলো কথা লেখা আছে, প্রত্যেকটা বিশ্বাস করি। ট্রুপের লাভ ক্ষতি সব কিছুর অংশীদার ছেলেমেয়েরা। তাদের ক্ষতি করবার কি অধিকার আছে তোমার আমার? তা হয়না কৌশিক।

—কি করতে চাও তবে?

—এমন কোনো কাজ করা চলবেনা, যাতে ট্রুপের ক্ষতি হয়।

—বৃন্দা তোমাকে ভালবাসে সাধন। আমাকে সরে যেতেই হবে।

—তা হয়না। তোমাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে ট্রুপ বজায় রাখলাম, এত বড়ো হার মানতে আমি পারব না কৌশিক। নিজের কাছে কি জবাবদিহি করবো বল?

—বৃন্দা অন্য কোনো কথা মানবে না।

—তার অনেক আগে আমি চলে যাবো।

—তুমি চলে যাবে?

—নিশ্চয় যাবো। তুমি কি মনে করো আমি ভয় পাই? হ্যাঁ, ভয় আমার আছে। ভয় পাই নোংরামি দেখে, চক্রান্ত দেখে, স্বার্থ দেখে। আমার জন্যে যদি চল্লিশটা মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহ'লেও নিজের স্বার্থ কামড়ে পড়ে থাকবো আমি? সে সময়ে চলে যেতে আমি এতটুকু ভয় পাইনা কৌশিক। কিন্তু এ সব কথা উঠছে কেন? বৃন্দাকে তুমি বুঝিয়ে বলো।

—বৃন্দা আমার কথা শুনবে না।

—নিশ্চয় শুনবে। আমি বৃন্দাকে জানি। ট্রুপের যাতে ক্ষতি হয় এমন কাজ সে করতে পারে না।

—আমিও বৃন্দাকে জানি সাধন, নিজেকে ছাড়িয়ে সে অন্য কিছু ভালবাসে না।

—নারায়ণ!

—নইলে আজ আমার সঙ্গে এমন করলো বৃন্দা? সাধন, তোমার বয়স আছে, তুমি ত' বুঝবে না আমার জ্বালা কোথায়। পাঁচবছর আগে যথাসর্বস্ব বাজি রেখে বৃন্দার জন্য ট্রুপ গড়েছিলাম। স্বার্থ দেখিনি, টাকা চাইনি, নিজের কথা একদিন ভাবিনি। আজ বিয়াল্লিশ বছর বয়স আমার—বলো, এই ট্রুপ ছাড়া আমার জীবনে আর কি আছে? আজ আমাকে স্বচ্ছন্দে বললো বৃন্দা চলে যেতে? না সাধন, আমিই যাবো। মন আমার ভেঙে গিয়েছে।

—আমাকে চেষ্টা করতে দাও কৌশিক। তোমাদের এ ঝগড়া এমনিতেই মিটে যাবে।

মাথা নাড়লো নারায়ণ। বললো,—

—সাধন, বৃথাই সান্ত্বনা দিচ্ছ। আমি বৃন্দাকে চিনি না? বৃন্দা তোমায় ভালবাসে তা আমি জানি না? কিন্তু সে ভালবাসা যদি সর্বনেশে হয়ে ওঠে, বলো সাধন, যাকে ভালবাসি তার সর্বনাশ কেমন করে দেখি?

নারায়ণকে যেন প্রথম দেখছে সাধন। নতুন করে চিনছে তাকে। নারায়ণ ধীরে ধীরে গভীর দুঃখের সুরে বললো,—

—দিনের পর দিন তুমি ত' বৃন্দাকে দেখনি সাধন! তার মুখের দিকে চেয়ে পারিবারিক জীবন, সাংসারিক সুখ, সমস্ত ত্যাগ করোনি। একজন মানুষের জন্যে আমি সব করেছি সাধন। আমি আর্টিস্ট নই। আমি তোমাদের মতো আনন্দ পেতে পারিনা। আমি যা করেছি তা বৃন্দার জন্যে। আজ বৃন্দাই যখন আমাকে চায় না—

মন ঠিক করে উঠে পড়লো সাধন। বললো,—

—বৃন্দাকে বুঝতেই হবে। তোমাকেও বুঝতে হবে। যেতে হলে আমিই যাবো!

তারপর সাধন হাসলো একটু। বললো,—

—কৌশিক, কি মজা জানো, ঠিক আসবার আগেই প্ল্যান করেছিলাম অনেক। জীবনটা খুব মজার, তাই নয়? কে জানতো আজই এ সব কথা উঠে পড়বে?

বেরিয়ে এলো যখন, মাথার ভেতরটা টলমল করছে। শরীর যেন কাঁপছে থরথর ক'রে। নিচের ঘরে গিয়ে বসে পড়লো সাধন নিচু চৌকিতে। দেয়াল মাদুর দিয়ে ঢাকা। শীতলপাটির ওপর বাংলাদেশের ছবি আঁকা সরা টাঙানো। এ সাধনের নিজের শখে সাজানো। বাঁশের ফুলদানী জোড়াও সাধনই আনিয়েছিলো শ্যামকে দিয়ে। এই বাড়ীখানার সমস্ত গৃহসজ্জার পেছনে তার অনেক শ্রম

আছে। সমস্ত ট্রুপটার কার জন্যে সে ভাবেনি? কার জন্যে পরিশ্রম করেনি?

বৃন্দা যদি তার কথা না বোঝে, তবে এই সব কিছু তাকে ছেড়ে যেতে হবে। চিরদিনের মতো।

১১

ঘরের দরজা খোলাই ছিল। বৃন্দা বসে ছিলো খাটে। সাধন কি বলে শোনবার জন্যে দুই চোখ তুলে তাকালো বৃন্দা। পাশে বসলো সাধন। বললো,—

—কি হয়েছে বৃন্দা?

—নারায়ণের কাছে ত' শুনেছো।

—সে তার কথা। তুমি বলো বৃন্দা। স্নেহ আর আবেদনে ভরা সাধনের কণ্ঠ। বৃন্দার চোখে মুখে উদ্‌ভ্রান্ত হতাশা আর দুঃখ। সহসা কোনো ঝড়ে নড়ে গিয়েছে দুইজনের আশ্রয়। বিপদের সম্ভাবনা এখনো প্রতীক্ষা করছে দিগন্তে। সাধনের মুখখানাও বেদনার্ত, উদাস। প্রেমের একটা উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ অনুভব করলো বৃন্দা। সাধন কি বোঝে সাধন তার কতখানি? বৃন্দা বললো,—

—কি হবে সাধন? আজকে যা হলো তার পরে নারায়ণের মুখ আমি দেখবো কেমন করে বুঝতে পারছি না।

—এমন কি হলো বৃন্দা, যে তুমি তার মুখই দেখবে না?

—কেমন করে দেখবো বল সাধন? আমার অনেক আশা আকাঙ্ক্ষার ভিতই ভেঙে গিয়েছে। হঠাৎ নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। আমি খেই পাচ্ছিনা সাধন। তবে একটা কথা ঠিক। নারায়ণের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবেই যাবে।

—অমন তাড়াতাড়ি কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয় বৃন্দা।

—তাড়াতাড়ি ? একে তুমি তাড়াতাড়ি বলো ? আমাকে সে যে সব কথা বলেছে !

—রাগের মুখে কি বলেছে না বলেছে তা-ই তুমি সত্যি বলে মেনে নিচ্ছ কেন ? তা ছাড়া···

—তা ছাড়া কি ?

—সম্ভবতঃ নারায়ণ-ও তোমাকে ভালবাসে বৃন্দা !

আঘাতটা এলো অতর্কিতে। বৃন্দা সোজা হয়ে বসে তাকালো। নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেনা যেন। বললো,—

—সাধন, তুমি ! তুমি এই কথা বলছো ?

হাসলো সাধন। বললো,—

—তোমাকে ঘা দেবো ব'লে ত' বলিনি বৃন্দা। তবে কি জানো, কৌশিক যে এ সব কথা বলতে পারে, তা আমি কোনদিন-ও ভাবিনি। আজ যখন বললো,—

—কি বললো ?

—বললো, দিনের পর দিন তোমার মুখের দিকে চেয়ে সে সব কিছু করেছে। বললো, তুমি ছাড়া তার চোখে আর কিছু নেই—

—তারপর ?

—তুমি ছাড়া বোধহয় তার-ও চলবেনা। অন্ততঃ সে তাই বললো।

—তারপর ? এ ত' তার কথা। তোমার কথাটা বলো।

—ছাড়াছাড়ি মানে-ই ট্রুপের ভাঙন ধরা,—সে কথা ভেবেছো বৃন্দা ?

বৃন্দা রেগেছে যতো, দুঃখ পেয়েছে তার চেয়ে-ও বেশী। বললো,—

—সাধন, আমি নীচতা পছন্দ করি না। সোজা কথা আর সোজা ব্যবহার-ই আমার পছন্দ। আমার আড়ালে নারায়ণ তোমাকে যা বললো তুমি তাই বিশ্বাস করলে, এটা আমি ঠিক

বুঝলাম না। তা ছাড়া আমার বিষয়ে আমি যা ঠিক করবো তা-ই হবে। তোমরা দু'জন মিলে হঠাৎ আমার বিষয়ে সিদ্ধান্ত মীমাংসা করছো—ব্যাপারটা প্রহসনের পর্যায়ে গেল না? মানুষের জীবন নিয়ে কথা। তোমরা তা নিয়ে প্রহসন করছো? আমি তোমার কথা বুঝলাম না সাধন!

সাধনের বড় দুঃখ হলো বৃন্দাকে দেখে। বড়ো লজ্জা পেলো সে। বললো,—

—তুমি-ই বলো বৃন্দা। তোমার অজান্তে কোনো কথা-ই আমি বলিনি। আমায় বিশ্বাস করো বৃন্দা।

—তোমাকে আমি যতো বিশ্বাস করি এমনটি আর কারুকে কখনো বিশ্বাস করিনি সাধন। বিশ্বাস করতে চেয়েছি, ভালবাসতে চেয়েছি—মানুষ কোথায় পেয়েছি বলো?

বৃন্দার হাত ধরলো সাধন। সকরুণ মমতায় বললো,—

—মাপ চাইছি বৃন্দা।

নিজের কথাগুলি সাধনকে বিশ্বাস করাবার জন্য বৃন্দা আকুল। তার দুনিয়া ভেঙে খানখান হ'তে চলেছে। রাখতে পারে যে, সে মানুষ এ-ই একজন। এমন করে সাধনের চোখের দিকে তাকালো বৃন্দা, যে তার অসহায়তা দেখে দুঃখে ও করুণায় গলে গেলো সাধন। বৃন্দার গলা ঈষৎ ভাঙ্গা। নিচু গলায়, মনের কথা বলার মতো আন্তরিক হয়ে বললো,—

—সাধন, আমার মতো বন্ধু তোমার নেই। এ-বিপদ আমার-ও, তোমার-ও। কথাগুলোকে ভুল বুঝ না।···নারায়ণ হয়তো তোমাকে বুঝিয়েছে সে আমাকে ভালবাসে, বুঝিয়েছে আমাকে সে ছেড়ে যাবে, যাতে আমি আর তুমি সুখী হই। এই তো?

মাথা নাড়ে সাধন। বলে,—

—বলো।

—একটা কথা সত্যি সাধন যে, আমি তোমায় ভালবাসি। কত

ভালবাসি তা নারায়ণ কথা না বললে বুঝতে-ও পারতাম না। তবে খুব বেশী ত' আমি চাইনি সাধন, তা-ই এই ধরণের কোন সিদ্ধান্ত নেবার কথা আমি ভাবিনি। এ দিকে আমার তোমার বিশ্বাস রাখেনি নারায়ণ।—ট্রুপের!—বলতে বলতে নাকের ডগাটা কাঁপতে লাগলো বৃন্দার রাগে আর উত্তেজনায়। বললো,—

—ট্রুপের টাকাপয়সা নিয়ে তছ্‌নছ্‌ করেছে সে! আমাকে বললো, ফাণ্ডে একটা টাকা-ও নেই। তোমাকে সে বলেছে, সে চলে যেতে চায়। জানে যে, মস্তো একটা ত্যাগের কথা বললে তুমি অভিভূত হবে।. আমার কথা যদি বলো সাধন, এমন একদিন ছিলো যখন নারায়ণের মুখ চেয়ে আমি অপেক্ষা করতাম। না সাধন, মন আমার একদিনে ভাঙেনি। অনেকদিনে তিলে তিলে ভেঙেছে। আমি কোন দোষ ত' করিনি সাধন। শুধু ভালবেসেছি তোমাকে। ভালবাসা কি একটা অপরাধ?

কার কি বিচার করবে সাধন? মানবীয় অনুভূতির বাইরে দাঁড়িয়ে দেবতা ফুল চন্দনে পুজো নেয় মানুষের, তাকে ত' জীবনে দেখতে পাওয়া যায় না। এই জীবনটা-ই যে মস্তো বড়ো সত্যি। এর বাইরে আর কোন স্বর্গের অস্তিত্ব নেই। রক্তমাংসের মানুষ ভুল ভ্রান্তি রাগদ্বেষ প্রেম প্রীতি নিয়ে বাঁচে। কারোই দোষ দেখেনা সাধন। না নারায়ণের, না বৃন্দার। বড় গভীর দুঃখে বলে,—

—না বৃন্দা, কোনো দোষ তুমি করোনি।

—তবে বলো সাধন, এখন তুমিই বলো—তবে কি করবে?

—কিসের কি করবো বৃন্দা?

সাধনের চোখে তাকিয়ে বৃন্দা বলে,—

—এ সব কথা আমাকে বারবার বলতে নেই। বড়ো লজ্জার কথা। তবু বলি সাধন, তোমার কাছে লজ্জা করে কোথায় যাবো বলো? এখন বলো, নারায়ণকে না ছেড়ে আমাদের উপায়

কি? এত কথার পর কেমন ক'রে আর আগের মতো-ই চলি বলো?

—অন্য উপায় ভাবো বৃন্দা। তোমার আর নারায়ণের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হওয়া মানে ট্রুপটা-ই ভেঙে যাওয়া।

—সাধন—!

তীব্র তিরস্কার বৃন্দার গলায়,—

—সাধন, বাস্তবকে স্বীকার করো। তুমি কি মনে করো এখন এই রকম জোড়াতালি দিয়ে চলা সম্ভব? এ কি নিঃসম্পর্কের মানুষের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছে? আমরা কথা কয়ে মিটিয়ে নিলাম আর যেমন ভাবে চলছিলো, তেমনি চলতে থাকলো? পরস্পরকে বিশ্বাস করি না, ঘৃণা করি, তবু আমি নারায়ণের সঙ্গে সম্পর্কের জের টানবো? তুমি পাগল?

—ট্রুপ যে ভেঙে যাবে বৃন্দা!

সাধনের গলা হাহাকার ক'রে উঠলো,—

—ট্রুপটা ভেঙে যাবে, তা দেখতে পারবে?

এ অসম্ভব মানুষকে নিয়ে কি করে বৃন্দা? বলে,—

—ট্রুপ ভাঙবে কেন? আমি তুমি রাখতে পারবো না?

—ছি বৃন্দা, ছি!

তিরস্কার নয়, তীব্র হতাশা। সাধন বলে,—

—তিনজন মিলে মিশে ট্রুপ গড়েছি। তিল তিল করে রক্ত ঢেলে দিয়েছি এর পেছনে। কলাতীর্থমের যাতে ক্ষতি হবে তা কি আমি তুমি করতে পারি?

—ক্ষতি হবে তা-ই বা ভাবছো কেন?

—ক্ষতি হবে না? বৃন্দা, নারায়ণ যেমন মানুষ-ই হোক, এর মধ্যে সে-ও ত' একজন। ট্রুপ ত' কোনো স্বার্থের ওপর গড়িনি বৃন্দা—আদর্শের ওপর গড়েছি। একজনের পরিশ্রমটুকু নিলাম, অথচ শেষ অবধি সরিয়ে দিলাম তাকে, তা কেমন করে হয় বৃন্দা? এ কাজ

করলে ট্রুপের বিশ্বাস তুমি হারাবে। ট্রুপ আর থাকবেনা। তা কখনো ভেবেছ বৃন্দা ?

—ট্রুপ, ট্রুপ, আর ট্রুপ! ট্রুপ কি একটা জড় জিনিষ সাধন? না কি এতোই বড়ো তোমার কাছে ট্রুপ, যে আমার সুখ দুঃখ তার কাছে কিছু নয় ?

—ট্রুপ আমার কাছে অনেক বড়ো বৃন্দা।

—নতুন করে ট্রুপ গড়বো আমরা দরকার হলে, সাধন!

—আমার আর তোমার কথা ভাবছো বৃন্দা, চল্লিশটা ছেলেমেয়ের কথা ভাবছো না ? সেইসব লোকের কথা ভাবছো না, যাঁরা তোমার কথায় বিশ্বাস করে কলাতীর্থম্‌কে দুই হাতে সাহায্য করেছেন ? এতজন মানুষের কাছে কি জবাব দেবে বৃন্দা ? বলবে, আমার নিজের সুখদুঃখটাকে অনেক বড়ো ক'রে দেখলাম ? আমাকে আপনারা মাপ করুন। এমন করে হার স্বীকার করবে বৃন্দা ?

মনের দ্বন্দ্বে ঘা খেয়ে যন্ত্রণায় পাংশু হলো বৃন্দার মুখ। বললো,—

—অত কথা আমি ভাবতে পারি না সাধন। হারজিতের কথা কি বলছো ? আমিই যদি মরে যাই ?

—ভাবতে তোমাকে হবে-ই বৃন্দা। বৃন্দা, তুমি ত' সকলের মতো নও। সকলের সঙ্গে কি তোমার তুলনা হয় ? তুমি তুমি-ই বৃন্দা। তোমার কাছে বড়ো আশা করতে পারি—তুমি অনেক ছাড়তে পারো বৃন্দা—তুমি অনেক পারো।

—তুমি জানো না সাধন, আমি কত দুর্বল হয়ে গেছি।

বৃন্দা এখন এই মুহূর্তে যে কতো দুর্বল তা কি সাধন জানে না ? নিজের বুকখানা-ও কি তার ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে না ? তবু ছাড়েনা সাধন। কাতর অনুনয়ে বলে,—

—সেই দিনের কথা মনে পড়ে বৃন্দা ? সেই যেদিন আমরা কলাতীর্থম্ গড়বার সঙ্কল্প করলাম ?—মনে পড়ে বৃন্দার। ধূলোর

গন্ধমাখা সেই দিনের তপ্ত বাতাস যেন আবার তার মুখে চোখে ঝাপটা দেয়। প্রথম প্রেমের অনুভূতিমাখা সেই নিরুদ্বেগ সুন্দর দিন বৃন্দা ভোলে কি করে? ভোলেনি বৃন্দা সে দিনের কথা! মাথা নেড়ে তা-ই জানায়।

সাধন বলে,—

—তোমার সঙ্গে সেদিন থেকে আমার পরিচয়. বৃন্দা। তুমি আমি একই আদর্শ নিয়ে নেমেছিলাম। কত কথা বলেছিলে বৃন্দা, আজ সব ভুলে গেছ?

—সেদিন বুঝি আজকের মতো ভালবাসিনি সাধন।

—বেসেছিলে বৃন্দা। নিশ্চয় ভালবেসেছিলে। অনেক ভালবাসা ছাড়া কেউ এত ত্যাগ করতে পারে বৃন্দা? এত কষ্ট করতে পারে?

—তোমার মুখ চেয়ে করেছিলাম সাধন।

যা করেছে, সবই ভালবেসে, এ কথা বার বার বলে বৃন্দা। বলে—যা করেছে সবই সাধনের মুখ চেয়ে।

সাধন-ও ভালবাসে। গভীর ভালবাসে। তার ভালবাসা তাকে অন্য কথা বলায়। সাধন বলে,—

—আমার মুখ চেয়ে মানে, আমার শিল্পকে ভালবেসে। তুমি যে সত্যিকারের শিল্পী বৃন্দা, তুমি কখনো এত বড়ো মহৎ প্রচেষ্টা যাতে ভেঙে যায়, তা করতে পারো?

উদ্‌ভ্রান্ত বৃন্দা আত্মসংযম হারায়। চেঁচিয়ে বলে,—

—আদর্শবাদ, মহৎ প্রচেষ্টা, এসব কথা আমি জানতাম না সাধন। তুমি-ই আমায় শেখালে। স্বীকার করছি সব সত্যি। স্বীকার করছি ট্রুপ ভাঙা চলেনা। কিন্তু আমি যদি মরে গেলাম, ট্রুপ দিয়ে কি করবো বল? আমার দিকে তুমি একবার চাও, একবার বোঝ। ট্রুপের আকর্ষণ কে? আমি আর তুমি। আমরা দু'জন থাকলে ট্রুপ থাকবে না?

—তোমার আমার ওপর শ্রদ্ধা থাকবে না ট্রুপের। সে পর্যায়ে যাবে কেন ঘটনা? অতবড় হার মানতে পারবো না আমি বৃন্দা। তারপরে তুমি আর আমি নিরন্তর পরস্পরকে দোষ দেব। তা হয় না। তার আগে আমি চলে যাবো।

—কি বললে?

—তার অনেক আগে আমি চলে যাবো।

—ভয় দেখাচ্ছ সাধন? ভাবছো ভয় দেখালে মেনে নেবো আমি?

—তোমাকে ভয় দেখাবো আমি? না বৃন্দা, তোমাকে আমি এতটুকু অসম্মান করবো না। আমার চোখে তুমি কোথায় বৃন্দা, তা যদি জানতে!

—এ কথা-ও যদি সত্যি হয়, তবে ছেড়ে যেতে চাইছো কেন?

নেমে এলো বৃন্দা। আকুল দুই হাতে জড়িয়ে ধরলো সাধনের পা। চোখের জলে গাল ভেসে যাচ্ছে, এলোমেলো চুল, বেশবাস—প্রেমের নিবিড়তম মুহূর্তে-ও যে মেয়ে রাজরাণী এখন সে-ই সাধনের দিকে চাইলো কাঙালের মতো। সাধন যেন তার দেবতা। বললো,—

—এত কথা সব যদি সত্যি হয়, তবে কেন আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ সাধন? এমন ক'রে আমাকে কষ্ট দিও না। সারা জীবনে-ও ত' আমি নিজের ক'রে একটা মানুষকে পাইনি।

বৃন্দাকে তুলে ধরে একবার দুর্দম আবেগে চেপে ধরলো সাধন। তারপরেই বেরিয়ে গেলো ঘর থেকে। সান্ত্বনার কথা কিন্তু একটা-ও বললো না।

* * * *

টাকাপয়সার হিসেব চেয়ে খোলা মিটিং ডেকে যে কিছু লাভ হবে না তা বুঝতে দেরী হলো না বৃন্দার। এত দুঃখে-ও এ বুদ্ধি তার

ঠিক-ই ছিলো যে, এতে শুধু কেলেঙ্কারী-ই বাড়বে। সে মিটিংটা হলো নারায়ণের ঘরে, দরজা বন্ধ ক'রে।

পাকা কাজ করেছে নারায়ণ। নিখুঁৎ গাঁথুনিতে বন্ধ করেছে চোরা ফুটোফাটা। পরিষ্কার হিসেব খাতায় লেখা। খোলা খাতা ফেলে দিলো নারায়ণ। জমার ঘরে পড়ে আছে মাত্র হাজার তিনেক টাকা। পাইপয়সা অবধি হিসেব মেলানো। নারায়ণ কাগজপত্র টেবিলে ফেলে রেখে সিগারেট ধরালো। কাগজপত্রগুলি ব্যাগ ভরে নিলো বৃন্দা। বললো,—

—এ সম্বন্ধে পরে তোমার সঙ্গে কথাবার্তা কইব আমরা।

—আমরা মানে ?

—আমি আর সাধন। তোমার সঙ্গে আলাদা ক'রে কথা হয়তো আমি আর কইব না নারায়ণ।

*   *   *   *

বৃন্দার ঘরে বৃন্দা আর সাধন ব্যাগটা মাঝখানে রেখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো। সর্বনাশের সত্য রূপ প্রত্যক্ষ করতে দু'জনের আর বাকি নেই। ঘৃণা আর প্রতিশোধ নেবার দৃঢ়সংকল্পে জ্বলতে লাগলো বৃন্দার দুই চোখ। সাধনের চোখে মুখে হতাশ একটা আত্মসমর্পণের ভাব। বললো,—

—নারায়ণই জিতলো বৃন্দা।

—তোমার আমার দু'বছরের শ্রম ও সাধনার এই প্রতিদান সাধন !

—ট্রুপের সর্বনাশ করা হয়েছে।—

ঈষৎ তিক্ত হাসলো বৃন্দা। বললো,—

—এখন এই মুহূর্তে-ও ট্রুপের কথা ভাবছো তুমি, দেখে আমি মুগ্ধ হলাম সাধন। আমি কিন্তু আমাদের দু'জনকে বাদ দিয়ে আর কিছু দেখছি না। আমার তোমার ওপর শোধ নেবার জন্যেই এই সর্বনাশটা করলো নারায়ণ।

—কত টাকার ব্যাপার বৃন্দা ?

—বিশহাজার টাকা শুধু চাঁদা-ই তুলেছি। দু'বারের ট্যুর দিয়ে আমাদের তিনজনের অন্ততঃ পাঁচহাজার করে পাওয়া উচিত। ট্রুপের ছেলেমেয়েদের শেয়ারে-ও কোন্ না হাজার খানেক ক'রে হবে? সব শুদ্ধ আশী হাজার টাকা সাধন।

ম্লান হাসলো সাধন। বললো,—

—কত প্ল্যান-ই করেছিলাম বলো। কত নতুন কম্পোজিশান, কত নতুন রকম বিষয়বস্তু। সে সব আর হলো না বৃন্দা।

বৃন্দা বললো,—

—আমার নাম বৃন্দা জোহারী, সাধন। ওকে ত' আমি ছেড়ে দেবো না, শেষ পাই-টি অবধি আদায় করবো, দেখো।

—কেমন করে পারবে বৃন্দা? কোনো টাকারই তো হিসেব নেই!

তাও ত' বটে। চুপ করে-ই রইলো বৃন্দা। বললো,—এখন উপায়?

—উপায় আছে বৈ-কি বৃন্দা। উপায় আছে। তুমি সে উপায় দেখতে চাও না, তাই দেখতে পাচ্ছ না। বুঝতে পারছ না কি বলছি আমি? নারায়ণ কি টাকা চায় বৃন্দা? আমি তা মানি না। আমার ওপরেই ওর যতো রাগ। ট্রুপটার সর্বনাশ করতে ও এতটুকু দ্বিধা করলো না, দেখছ না? আমি চলে গেলে-ই ও তোমাকে সব দিয়ে দেবে বৃন্দা।

এ সমাধান মানতে চায়না বৃন্দার মন। অসহায় হয়ে চেয়ে থাকে। সাধন বলে,—

—এ ছাড়া ট্রুপ বাঁচানোর আর কোনো পন্থা নেই। একজন দু'জনের কথা নয়, অনেক মানুষের কথা। আমার তোমার স্বার্থের দিকে চেয়ে এতো বড়ো জিনিষটা অবহেলা করবে না তুমি বৃন্দা।

এর পরে আর কথা বলবার জন্যে দাঁড়ালো না সাধন। বেরিয়ে এলো।

এতো বড়ো দুর্দিন আর দেখেনি বৃন্দা। জীবনে সে একবার-ই সুখী হলো। তার সে সুখকে নষ্ট করবার জন্যই নারায়ণ এই প্রতিশোধ নিলো।

সেদিনকার সর্বনাশা রাতটার কথা পরে-ও সাধনের ভালো ক'রেই মনে পড়েছে। কোনদিন-ও ভোলেনি সাধন নারায়ণের মুখের সেই ছুরির ঝিলিকের মতো একটু হাসি। সাধন বলেছিলো,—

—পঞ্চাশ হাজার ব্যাঙ্কে, আর ত্রিশহাজার ক্যাশ, অন্ততঃ আশী-হাজার টাকা থাকবার কথা নারায়ণ। এ টাকাটা তুমি ইচ্ছে করলে দিয়ে দিতে পারো।

—কেমন করে ?

—আমি চলে গেলেই তোমার টাকাটা দিতে ইচ্ছে করবে নারায়ণ। তা ছাড়া বৃন্দাকে তুমি ভালবাসো। তার সঙ্গে ত' তোমার কোনো বিবাদ বিরোধ নেই। থাকলে-ও সে মিটমাট তোমরা পরে-ও করতে পারবে।

—তুমি খুব আশ্চর্য মানুষ সাধন। বেশ ছেড়ে যেতে পারছ তো ?

মিথ্যেকথা বলতে পারে না সাধন। তাই অতি সহজে সত্যি-কথাটা-ই বলেছিলো,—

—কাল অবধি যা ভাবতে পারিনি, আজ তা বেশ ভাবতে পারছি নারায়ণ। আরো কি জানো, তোমাকে দেখে ঘেন্না ধরে গেছে। মনটা ছুটে গেছে আমার। একবার মন ছুটে গেলে আমার আর ভালো লাগে না।

—বৃন্দা জানে ?

—নিশ্চয়।

ব'লে ঘুরে দাঁড়ালো সাধন। বললো,—নইলে ত' তোমাকে

কাগজে সই করতে বলতাম নারায়ণ। সে জানে ব'লেই নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছি।

এ বিষয়ে বৃন্দাকে নতুন ক'রে আর কোনো কথা বলেনি সাধন। তার মুখেই লেখা ছিল সব। দেখে ঘরের ভেতরে গিয়ে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়লো বৃন্দা।

এই যা করলো, এ ভালো হলো কি মন্দ হলো, একথা সে পরে বিচার করবার অনেক সময় পেয়েছিলো। এর পরেই তার অগাধ অবসর মেলে। সে সময় মানুষের থেকে অনেক দূরে, পাহাড় দিয়ে ঘেরা ছোট্ট একখানা কটেজে শুয়ে শুয়ে এক চিন্তা ছাড়া আর কিছু করবার ছিলো না সাধনের। তখন চিন্তা করে করে এই ছুটো বছরকে অনেকভাবে দেখেছে সাধন। তখনও মনে হয়েছে ঠিকই করেছে সে। এ ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু ঘটনা ঘটলো যখন, তখন বিচার বিশ্লেষণ করবার শক্তি ছিলো না সাধনের। কোনো তীব্র তীক্ষ্ণ অনুভূতি নয়—নিবিড় ও সুগভীর দুঃখ অনুভব করলো সে। নিজেকে মনে হলো অনাথ, নিরাশ্রয়। মনে হলো, যা কিছু সে ভালোবেসেছে, যা কিছু তার সৃষ্ট, তার থেকে তাকে ছিঁড়ে সরিয়ে নিয়ে গেলো কোনো দুর্বার শক্তি।

ট্রুপের ছেলেমেয়েরা আন্দাজ করেছিলো। সবটা জানেনি। সবটা তাদের জানায়নি সাধন। তারা বুঝলো মস্ত বড়ো কিছু হয়েছে। বুঝলো কোনো কারণে চলে যাচ্ছে সাধন দাদা। এ-ও সকলে-ই মনে মনে জানলো বৃন্দার সঙ্গে প্রেমের জন্য এই মাশুল দিলো সাধন।

সব কথা যখন হয়ে গেলো—বিধাতার এই নিষ্ঠুর অবিচারে জ্বললো বৃন্দা। নারায়ণের দিক থেকে আশ্চর্য সংযম দেখা গেলো। নিজেকে একেবারেই নেপথ্যে রাখলো সে। এখন ভেঙে চুরে যাক্। পরে ধীরে ধীরে খণ্ডে খণ্ডে গাঁথবার চেষ্টা করা যাবে, সম্ভবতঃ এই-ই ভাবলো সে। বৃন্দার মনে কিন্তু অন্য সঙ্কল্প মাথা তুলে দাঁড়ালো।

তাকে এত বড়ো ঘা দিলো যে, তাকে সে ক্ষমা করবে না। তাকে পাল্টা ঘা দেবে নির্মমভাবে। আজকের এই অদ্ভুত পরিস্থিতির জন্য তাকে স্বীকার করতে হলো এত বড়ো ক্ষতি। ট্রুপের জন্য মহৎ আদর্শ নয়, একান্ত জাগতিক বোধ-ই বাঁচালো বৃন্দাকে। সাধনকে না ছাড়লে নারায়ণ চলে যাবে। বহু মানুষের টাকায় গড়া ট্রুপ, তাদের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সে মস্তো লজ্জা, দুরপনেয় কলঙ্কের কথা। আগুন নিয়ে খেলতে নেমে এখন ভালো লাগছে না বললে তো হবে না। সেই আগুনে পুড়ে পুড়ে কতবার যে মরলো বৃন্দা। মনের আগুনে দগ্ধ হয়, এ নিশ্চয় কবি-কল্পনা। নইলে এখন বৃন্দা মরতো।

একদিকে এত কথা, অন্যদিকে তার প্রেম! সেই অন্ধ, পিপাসিত, দুর্বার অনুভূতি বৃন্দাকে হাজারটা অগ্নিশিখার বেড়াপাকে জড়ালো। বৃন্দাকে দেখে ভয় হলো সবায়ের। মনে হলো বৃন্দা পাগল হয়ে যাবে এবার।

দুই রাত রইলো সাধন এই কথাবার্তার পর। নিদ্রাহীন চোখে—শরীরে জ্বরের জ্বালা নিয়ে বিছানায় পড়ে।

প্রথম রাত নিজের সঙ্গে যুঝে পায়চারি করে কাটালো বৃন্দা। দ্বিতীয় রাতে আর সহ্য করতে পারলো না। এ কি অসম্ভব যন্ত্রণা? ঘড়ির কাঁটায় শব্দ হচ্ছে। পলে পলে রাতের প্রহর কাটছে। সকাল হতে-ই চলে যাবে সাধন? আর তাকে দেখবে না বৃন্দা? দেখে যদি তো দেখবে অপরিচিত মানুষের মতো? হাত মুঠো করে আর বন্ধ করে তালুটা নখ বিঁধে রক্তাক্ত হলো। মনে হলো এ যন্ত্রণা সহ্য করবার চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো। এরই নাম প্রেম? এ-ই যদি প্রেম হয় তবে যেন তার চরম শত্রু-ও প্রেমে না পড়ে। অনেক দূরে পাহারাদারের ডাক শোনা গেলো। একটা কুকুর বুঝি চাঁদ দেখে কেঁদে উঠলো। কাল চলে যাবে সাধন, আর আজ-ও এ সব গতানুগতিক নিয়মে চলেছে পৃথিবী! বৃন্দার

অনুভূতি বৃন্দার চেয়ে অনেক শক্তিশালী। দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বৃন্দা।

সাধন জেগেই ছিলো। দরজা খোলা। অন্ধ আবেগে এসে সাধনের পায়ের ওপর পড়লো বৃন্দা—

—সাধন, তুমি যেয়ো না। তুমি গেলে আমি মরে যাব।

—বৃন্দা, শান্ত হও, শান্ত হও, বৃন্দা, আমার কথা শোনো।

কে কার কথা শুনবে? বৃন্দা কি এখন বৃন্দা আছে? বর্ষার পদ্মার মতো শক্তি তার। সাধনকে ঘিরে সে ফুলে, ফুঁসে, ফেটে ফেটে পড়লো ছুর্দমনীয় আবেগে। মাটিতে লুটিয়ে মাথা ঠুকে কাঁদলো পাগল হয়ে,—

—তুমি গেলে আমি মরে যাব সাধন। তুমি যেয়ো না।

—আমাকে কষ্ট দিয়োনা বৃন্দা। ট্রুপ ছেড়ে যেতে মরে যাচ্ছি আমি, আমার ওপর এতটুকু দয়া নেই তোমার?

—ট্রুপ, ট্রুপ, ট্রুপ! ট্রুপের কথা বলছো তুমি সাধন, মানুষের কোনো দাম নেই? তুমি আর আমি থাকলে আবার ট্রুপ গড়বো সাধন, তুমি যেয়ো না। আমাকে তুমি ভালোবাসো না?

—ভালোবেসেছি বৃন্দা—ভালোবেসে বুকটা আমার ফেটে গেলো।

—শিল্পী বুঝিনা আমি, শিল্প বুঝি না! আমাকে তুমি ভালোবেসেছ, আমাকে তুমি নিয়েছ, আমার আর তোমার মধ্যে এতটুকু ব্যবধান রাখোনি—তবু আজ চলে যাচ্ছ?

বড় যন্ত্রণায় নিশ্বাস রোধ হয়ে আসে। তবু সাধন সত্যি কথা-ই বলে। বলে,—

—রক্তমাংসের একটা মানুষকে-ই ত' শুধু ভালোবাসিনি। আমি যে একজন সত্যিকারের শিল্পীকে ভালোবেসেছি বৃন্দা। আজ যদি সেখানেই বিরোধ লাগল, তবে কি নিয়ে থাকব বল! আমি তুমি যেখানে ফুরিয়ে গেলাম, সেখানে-ও আমাদের শিল্প

রইলো বেঁচে। তোমার মধ্যে যে আমি কতবার বেঁচেছি বৃন্দা। কতবার মরেছি তোমারই সঙ্গে। তা যদি বুঝে থাকো তবে আজ এমন কোরো না। আমাকে কষ্ট দিও না।

—তাই যদি যাবে, তবে এসেছিলে কেন? কেন আমাকে ভালোবাসলে সাধন? আমি যে জীবনে-ও কিছু পাইনি সাধন, তুমি আমায় ভরে রেখেছিলে।

বৃন্দার চুল ধরে ঝাঁকি দিলো সাধন। বললো,—

—তুমি জাননা কেন চলে যাচ্ছি? আবার ভুল বুঝছ? কার কাছে চেঁচিয়ে মরছি আমি? তুমি আমার বৃন্দা। আমার দোসর। তুমি-ও আমার কথা বুঝবে না?

—না-না-না! যে কথা বুঝতে গেলে মরে যাবো আমি, সে কথা বুঝব না।

পাগল হয়ে সাধনের পায়ে মুখ ঘসতে লাগলো বৃন্দা। জড়িয়ে ধরলো, অন্ধ আবেগে আদর করলো বারবার। মাটিতে মাথা কুটতে কুটতে কেবলই বলতে লাগলো,—

—আমি মরে যাবো সাধন! তুমি যেয়ো না।

বৃন্দাকে টেনে নিয়ে সাধন তার চুলগুলো গুছিয়ে দিলো। মুখে জলের ঝাপটা দিলো। সান্ত্বনা দিলো অনেক কথায়। কোনো কথা শুনলো না, বুঝলো না বৃন্দা। শেষকালে জোর করে তাকে তার ঘরে টেনে আনলো সাধন। বিছানায় তাকে শুইয়ে দিলো। পাশে বসলো।

কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে এক সময় চুপ করলো বৃন্দা। জোর করে তাকে ঘুমের ওষুধ দিলো সাধন। শরীরে আর শক্তি ছিলো না বৃন্দার। খেলো একচুমুকে। তার ঘুম না আসা অবধি পাশে বসে রইলো সাধন।

দুপুর নাগাদ যশবন্তের বাড়ীতে যখন পৌঁছলো সাধন, বৃন্দা তখনো ঘুমোচ্ছে। যশবন্ত এসে যে তাকে নামালো, এ পর্যন্ত বেশ

মনে পড়ে সাধনের। তারপর-ই মনে পড়ে একটা অদ্ভুত অনুভূতি। সমস্ত চেতনার ওপর দিয়ে একখানা ভারী কালো পর্দা নামছে। যশবন্তের মুখখানা দূরে চলে যাচ্ছে। কোনো কথা শুনতে পাচ্ছে না সাধন। সব যেন কমে আসছে, নিভে আসছে। বুক থেকে উঠে এলো দুর্দমনীয় একটা কাশি। নিচু হয়ে কাশতে গিয়ে অতি সহজেই গলা দিয়ে কি উঠে এলো।

রক্ত এত লাল হয়? নিচু হয়ে দেখতে দেখতে বড় বিস্মিত হলো সাধন। যশবন্তের হাতের ওপর অজ্ঞান হয়ে গেলো যখন তখন-ও তার মুখে সেই বিস্ময়টা লেখা।

১২

কষ্টিপাথরে না ঘসলে সোনা চেনা যায় না। মানুষকে চিনতে-ও উপযুক্ত সময়ের দরকার। এই সময়ে যশবন্তকে চিনলো সাধন। বেঁটে খাটো চৌকো মানুষটা, যার সমস্ত অনুভূতিগুলোই বহির্মুখী— তার অন্তরে-ও যে রাজার মতো সম্পদ থাকতে পারে, তা জানতো না সাধন। এই অভিজ্ঞতাটা এ যাত্রায় তার মস্তো লাভ। বাকি সবই ক্ষতি, হৃদয়ের, দেহের, মনের। সেই সব ক্ষতির সঙ্গে এই লাভটুকুকে ওজন করে দেখেছে সাধন বারবার। তার লাভ, তার ক্ষতিকে ছাপিয়ে না যাক, সান্ত্বনার প্রলেপে স্নিগ্ধ করেছে।

এই চূড়ান্ত বিপদের সময়ে সাধনকে দুই হাতে ঘিরে ধরলো যশবন্ত। তার খামারের ঘরখানায় রাখলো সাধনকে। জয়পুর থেকে ডাক্তার আনলো। জ্বরের অনুভূতি যার ছয়মাস ধরেই হচ্ছে, সে কেন টেম্পারেচার-ও নেয়নি বুঝলেন না ডাক্তার। বুকে ব্যথা, নিশ্বাসের কষ্ট আর ভোরবেলা ঘাম হবার কথা শুনে ভুরু কোঁচকালেন

তিনি। টি. বি. যে হয়েছে তাতে তাঁর সন্দেহ নেই। তবে এই রাজরোগ সাধনের দেহ থেকে কতখানি রাজকর নিলো জানতে হলে এক্স-রে করানো প্রয়োজন। অনেক টাকার ধাক্কা।

এত টাকা কোথায় পাবে যশবন্ত? তা ছাড়া এই ছোঁয়াচে অসুখ? সাধন বললো,—

—যশবন্ত আমাকে তুমি ছেড়ে দাও। আমি চলে যাই।

—একবার ত' ছেড়ে দিয়েছিলাম সাধন। আমি আগেই জানতাম সর্বনাশ একটা হবে। ও মেয়ের নিঃশ্বাসে বিষ আছে সাধন। ও-ই তোমাকে শেষ করলো।

—ছি যশবন্ত! বৃন্দাকে তুমি জানো না। ওর দুঃখ তুমি জানো না যশবন্ত।

—খবর দেবো একবার? দেখা করতে বলবো?

দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুলো সাধন। বললো,—

—না। তা হ'লে আমি এখনি চলে যাব।

পূর্ণ বিশ্রামের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন ডাক্তার। দরজা জানলা ভারী পর্দা দিয়ে ঢাকে যশবন্ত। ফিনাইল ঢেলে মেঝে পরিষ্কার ক'রে সাধনের পরিচর্যা করে নিজ হাতে। সাধনের কোনো মানা শোনে না যশবন্ত।

এক্স-রের ছবি দেখে রেডিওলজিস্ট অবাক হয়ে যান। পাঁচখানা পাঁজরা আর দুদিকের ফুসফুস ছড়িয়ে সমারোহ করে আসন পেতেছে টি. বি.। এ মানুষ এতদিন ধ'রে চলাফেরা করেছে কি ক'রে ভেবে পান না তিনি। কসৌলীর সীটের জন্যে তদ্বির শুরু করে যশবন্ত।

সব কথা সাধনকে বলবার নয়। তাই সেদিন কিছু বলেনি যশবন্ত। বলেছিলো অনেক পরে। যতদিন চোখের সামনে ছিলো সাধন, ততদিন-ই তাকে মনে রেখেছিলো দুনিয়া। চোখের আড়াল হ'তে না হ'তে-ই ভুলেছিলো ক্রমশঃ। বৃন্দা সাধন আর নারায়ণের নাম জড়িয়ে মুখরোচক গল্প কাহিনীর আস্বাদ-ও ততদিনে পুরোন

হয়ে এসেছে। সাত সমুদ্র তেরোনদীর পারের ছাপমারা টিকিট আঁটা মোটা একখানা নীল খাম সাধনকে খুঁজে খুঁজে এসেছিলো সীতমপুরে ফিরে। কালের অবশ্যম্ভাবী নিয়মে ততদিনে বৃন্দার সম্বন্ধে অনুভূতি অনেক থিতিয়ে এসেছে সাধনের মনে। আধখানা শরীর নিয়ে বেশী কিছু ভাবতে গেলে-ই বুকে কষ্ট হয়। নিঃশ্বাস নিতে পারে না। প্রেমের সে রাজসমারোহ, অভিজ্ঞতার দিক থেকে অনন্য। জীবনে একবার-ই স্বর্গ জেনেছিলো সাধন। কিন্তু সে জিনিষ পুনরাবৃত্তি হবার নয়। বারবার ফিরে ফিরে স্বর্গকে চাওয়া যায়। পাওয়া যায় না। মৃত্যুর সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম ক'রে এক বছরে সে কথা জেনেছিলো সাধন। তাই বৃন্দার কথা মনে হতে একটা গভীর ও পুরোন দুঃখ অনুভব করতো সাধন। তার মনে হতো, সে কথা থাক। সে কথা আর তুলে কি হবে? মনে হতো—

"আর কেন—

দলিত কুসুমে বহে বসন্ত সমীরণ?

আর কেন॥"

চরিত্রের দিক থেকে বৃন্দা সাম্রাজ্ঞী। চিঠিতে সে-ও সব কথা বলেনি সাধনকে। সাধনকে বলেছিলো যশবন্ত। যশবন্ত না বললে সাধন এত কথা কোনদিন-ই জানতো না।

সাধনকে ঘরে রেখে জয়পুরে আসে যশবন্ত। এক্স-রে'র রিপোর্ট দেখে তখন তার মন বৃন্দার ওপর ঘৃণায় বিমুখ। অনেক ঘৃণা আর অভিযোগ নিয়ে বৃন্দার কাছে গেলো যশবন্ত। নিঃশব্দ নিঝুম কলাতীর্থম্। যে বৃন্দার সঙ্গে দেখা হলো তার, তাকে সে চেনে না। নিজের ঘরে বসে অজস্র কাগজপত্রের মাঝখানে কাজ করছিলো বৃন্দা। শীর্ণ দেহ, চোখের নিচে কালি, ঠোঁট চাপা—গম্ভীর মুখ।

সাধনের অসুখের কথা বলে যশবন্ত বলেছিলো,—

—তুমি যদি একটু দেখতে তাকে বৃন্দা! তার কোথাও কেউ নেই।

—তার তুমি আছ যশবন্ত। আমার কেউ নেই।

তারপর-ই যশবন্ত সাধনের টাকার কথা তুলেছিলো। আশ্চর্য হয়ে বৃন্দা জিজ্ঞাসা করে,—

—সে কি? সাধন কিছু বলেনি তোমায়?

—কি বলবে?

—কেন চলে গেলো?

প্রশ্ন করে-ই নিজে-ই নিজেকে জবাব দিয়েছিলো বৃন্দা। আত্মগত হতাশ কণ্ঠে বলেছিলো,—

—না—না। ছি! সে কখনো বলে? সে ত' বলবে না। সে ত' কখনো বলবে না।

তারপর যশবন্তকে বলেছিলো,—

—নারায়ণের কাছ থেকে টাকাটা আমি আদায় করবো যশবন্ত। সেই জন্যে বসে আছি। আসছে সপ্তাহে চলে যাবো বম্বে।

—ট্রুপ নিয়ে?

—ট্রুপের ঝঞ্ঝাট মেটাবো বলেই-ই ত' আটকে পড়লাম যশবন্ত। ট্রুপ তুমি দেখছো কোথায়? ট্রুপ ভেঙে গেছে।

—বুঝলাম না বৃন্দা।

নিচু গলায়, কান্নাবিহীন একরকম অদ্ভুত স্বরে বৃন্দা বলেছিলো,—

—আমি চূড়ান্ত হেরে গেছি যশবন্ত। সাধন ট্রুপের দিকে চেয়ে চলে গেলো, আর আমি-ই সেই ট্রুপ তুলে দিচ্ছি আজ। কেন তা জানো? আমি আমি-ই। আমি সাধন নই। তার মতো সব ভাসিয়ে দিয়ে শুধু ট্রুপের কথা আমি ভাবতে পারলাম না।

তখন বড় সমবেদনা হয়েছিলো যশবন্তের। বৃন্দা বলেছিলো,—

—একদিন বড় আশা ক'রে যা যা করেছি যশবন্ত, এখন দেখছি সে সবই মিথ্যে হয়ে গেলো। যাঁদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছি, তাঁদের জবাব দেবো। ছেলেমেয়েদের টাকা দেবো। দেশে যাবার

বন্দোবস্ত করবো। এখানে-ও যা যা দায় দেনা আছে, শোধ করবো। সব একলা করবো।

একটু করুণ হেসে বলেছিলো,—

—আমার এখন অনেক কাজ, যশবন্ত।

যশবন্ত বলেছিলো,—

—নারায়ণ কোথায় বৃন্দা? তুমি একলা করবে কেন?

তখন সেই পাণ্ডুর মুখে ফুটেছিলো কোনো কঠিন প্রতিজ্ঞা। বৃন্দা বলেছিলো,—

—তার সঙ্গে-ও মেটাবো বৈ-কি।

সাধনের অসুস্থতার কথাটা-ই মানতে পারেনি বৃন্দা। বলেছিলো,—

—এই শেষ চোট্। এতে-ই আমি মরে গেলাম যশবন্ত।

তারপর বলেছিলো,—

—কাল, তাকে না জানিয়ে একবার এসো যশবন্ত। কাল আমি টাকা দেবো।

পরে বৃন্দার সেই সময়কার কথা মনে করে সাধন তার সঙ্গে হাজারবার মরেছিলো। বৃন্দার দুঃখের কথা মনে করে বুকখানা তার ভেঙে গিয়েছিলো। পরম শ্রদ্ধায় মাথা নিচু করেছিলো সাধন। শুধু ততদিনে বৃন্দা অনেক দূরে।

যশবন্ত যাবার পর সেইদিনই নারায়ণ সমস্ত টাকার হিসেব বুঝিয়ে দিয়েছিলো বৃন্দাকে। আশী হাজার টাকার হিসেব। নগদ যা ছিলো প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা, সবই এনে দিয়েছিলো। বৃন্দার সঙ্গে নিবিড় হবার, বিশ্বাসের লেনদেন করবার সময় যে এখনো আসেনি, তা সে বুঝেছিলো। সময়ে-ই সব ঠিক হয়ে যাবে, এ-ই ভেবেছিলো নারায়ণ।

টাকা পয়সা হাতে নিয়ে খোলা মিটিং ডেকেছিলো বৃন্দা। একমাত্র বীণা ছাড়া কেউ তার ঘরে ঢোকার অধিকার পায়নি।

বীণার সঙ্গেই সে তৈরী করেছিলো হিসেব। কলাতীর্থমের ছেলে-মেয়েদের সামনে দুই বছরের হিসেব রেখে বুঝিয়ে দিয়েছিলো। কার কতো পাওনা হয়েছে সে হিসেব ছেলেমেয়েরা জানতো না। প্রত্যেকের প্রাপ্য টাকা তার ওপরে পাঁচশো আর ট্রেণ ভাড়া দিয়ে দেয় বৃন্দা। কলাতীর্থম্ বন্ধ করে দিতে হলো ব'লে ক্ষমা চায়।

কথামতো যশবন্ত এসেছিলো পরদিন। একখানা খাম তার হাতে দিয়ে বৃন্দা বলেছিলো,—

—এতে হাজার টাকা আছে। তোমার এখনি লাগবে। ত্রিশহাজার টাকা তোমার নামে চেকে দিলাম যশবন্ত।

—তোমাদের হিসেব নিকেশ হলো ?—বৃন্দা বলেছিলো,—

—সাধনের সঙ্গে আমার হিসেবের সম্পর্ক নয় যশবন্ত। আর এই মুহূর্তে-ই সাধন কি পাবে না পাবে সে হিসেব করবার মন আমার নেই। সে অসুস্থ, তার প্রয়োজন, তাই তোমাকে-ই দিলাম। আর ত' কিছু করতে পারলাম না।

—এখন কোথায় যাবে বৃন্দা ?

—বম্বে। এত জটে জড়িয়েছি নিজেকে, সেগুলো খুলতে সময় লাগবে না যশবন্ত ? তা ছাড়া আর একটা হিসেব বাকি রইলো আর একজনের জন্যে। তারপরে-ই আমার ছুটি।

—তারপর কি করবে ?

—জানি না যশবন্ত। এখনো ভাবিনি। যা হয় করবো। যদি পারতাম, এখনই সাধনের কাছে যেতাম যশবন্ত। কিন্তু তাতে কোন লাভ-ই হবে না। অযথা উত্তেজনায় ওর অনিষ্ট হবে।—যশবন্ত বলেছিলো,—

—বৃন্দা, কিছুদিনের জন্যে বাইরে চলে যাও।

—তাই ভাবছি।

ব'লে বৃন্দা ঈষৎ হেসেছিলো। বলেছিলো—তুমি সাধনের বন্ধু। তুমি-ই তার কাছে রইলে। তোমার কাছে আমার কৃতজ্ঞতা অনেক

যশবন্ত। আমার কথা মনে করে তুমি এই ঘড়িটা প'রো। সাধনের জন্যে কিনেছিলাম, সে ত' ব্যবহার করলো না।

বৃন্দার মুখের সে হাসি দেখে মরমে মরেছিলো যশবন্ত। তেমন হাসি হাসার চেয়ে কাঁদলো না কেন বৃন্দা ?

বৃন্দা আর নারায়ণ বম্বেতে ফিরলো। বম্বের পৃষ্ঠপোষকদের ডেকে মিটিং ক'রে টাকাপয়সার হিসেব দাখিল করলো বৃন্দা। জানালো সাধন অসুস্থ। সাধনকে ছাড়া কলাতীর্থম্ সে চালাতে পারবে না। সে নিজে-ও অবসর নিচ্ছে কিছুদিনের জন্যে।

এতদিন নারায়ণ ছিলো তার সঙ্গে সঙ্গে। বৃন্দা যা বলেছে তাই-ই করেছে। প্রেসকে ডেকে একটা বিবৃতি দেবার কথা-ও ভেবে রেখেছে সে। কিছুদিন যাক। ও রকম ট্রুপ সে আবার গড়বে ! বরঞ্চ এবার হবে নতুন রকমের। ছোট্ট ট্রুপ। যা নিয়ে দরকার হ'লে ভারতের বাইরে-ও যাওয়া চলে। বৃন্দার নিজের যা টাকা আছে তা-ই যথেষ্ট।

এতদূর বুঝে এখানেই চরম ভুল করেছিলো নারায়ণ।

সকলের সঙ্গে সব কথাবার্তা মিটলো যখন, তখন নারায়ণের সঙ্গে কথা বলার সময় হলো। মনটা খারাপ রয়েছে—সেই পুরোন দিনের মতো খাণ্ডালা লোনাভ্লা অথবা মহাবালেশ্বর চলে যাবে না কি দুজনে, জানতে এসেছিলো নারায়ণ।

নারায়ণের কথা বলবার অবকাশ হলো না। বৃন্দাই শুরু করলো কথা। বললো,—

—নারায়ণ, তারপর কি করছো ?

—চলো বৃন্দা, কোথাও চলে যাই।

ভুরু তুললো বৃন্দা। শীষ দিলো ছোট্ট ক'রে। এক পা-এর ওপর এক পা তুলে বসে ছিলো। সোজা হ'য়ে বসলো। বললো,—

—সাধন বেরিয়ে গেলো, এখন আমাদের যুক্ত জীবনযাপনে আর কোনো বাধা নেই, তাই না নারায়ণ ?

এখনো রাগ পড়েনি বৃন্দার। কি যেন বলতে যাচ্ছিলো নারায়ণ, হাতের ঝাপটা মেরে তাকে থামিয়ে দিলো বৃন্দা। বললো,—

—নারায়ণ, তোমার মিষ্টি হাসি আর মধুর ব্যবহার আমার চোখে খুবই পুরোন হয়ে গিয়েছে। ও সব কথা ছাড়ো। কলাতীর্থম্ থেকে এই দু-বছরে তোমার শেয়ারে ঠিক পাঁচ হাজার টাকা পাওনা হয়েছে। এই খামের মধ্যে সেই টাকা রয়েছে, এই নাও। তোমার সঙ্গে এরপর আমি আর সোজাসুজি কথা বলব না। আমার এ্যাটর্নী তোমার সঙ্গে কথাবার্তা চালাবে। ডিভোর্সের নোটীস পাবে শীঘ্রই।

বিকৃত হাসিতে বেঁকে গেলো নারায়ণের মুখ। বললো,—

—চমৎকার নাটক। তোমার নটবরটি কোথায় গেলেন ?

—তুমি তার নাম করছো ?

উঠে দাঁড়ালো বৃন্দা। তেজে ও উত্তেজনায় টানটান হয়ে দাঁড়ালো। তাকে দেখে আর বুঝতে ভুল রইলো না যে বৃন্দার শরীরে রাজরক্ত আছে। সেই সমুন্নত ও দৃপ্ত ভঙ্গী দেখে গুটিয়ে গেলো নারায়ণ। বৃন্দা বললো,—

—তুমি তার নাম মুখে আনবার যোগ্য নও। তুমি বানিয়া, সাতপুরুষের লোভ আর নীচতা তোমার রক্তে। তুমি তার কথা কি বলবে নারায়ণ ?

এরপরে-ও কিছু বলতো নারায়ণ, কিন্তু তর্জনী নির্দেশে তাকে বের ক'রে দিলো বৃন্দা। বললো,—

—আমার সামনে থেকে বেরিয়ে যাও। এখনি যাও !

এ কাহিনীতে নারায়ণ কৌশিকের ভূমিকা এখানেই সমাপ্ত। বৃন্দার বিরুদ্ধে কিছু কুৎসা ছড়াবার চেষ্টা করে-ও বিশেষ লাভ হলোনা তার। ভাগ্যের চাকা তার তখন নিচের দিকে গড়াতে শুরু করেছে। বৃন্দার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর নিজের পুঁজিপাটা নিয়ে নারায়ণ বম্বেতে ইরাণী চা-এর দোকান দেবার চেষ্টা করলো। তাতে টাকা পয়সা খোয়া গেলো বেশ কিছু। বৃন্দা পাশে নেই। তাকে দেখে

কেউ টাকা ধার দিতে চায়না। অবস্থা ক্রমেই খারাপ হলো। তারপর নারায়ণ সেই সব ভাগ্যহারাদের দলে ভিড়ে গেলো, যারা পৃথিবীর সব সহরের-ই নাগরিক। একদা সুপুরুষ চেহারায় কালিমাখা, জুতোর ভেতর দিয়ে আঙুল বেরিয়ে পড়েছে, রাতে স্টেশানের প্ল্যাটফর্মে থাকে এরা। সকালে ইরাণী স্টলে মশলাদার চা খেয়ে বেরিয়ে পড়ে। খুব কেজো লোকের মতো চট্পট্ হাঁটে। মার্কেট বা চৌরাস্তায় মুখবাছাই করে মানুষ ধ'রে শেয়ার, রেস অথবা অন্য কোনো ব্যবসায়ে টাকা খাটাতে অনুরোধ করে। এরা প্রায়শঃ চমৎকার ইংরেজী বলে। নিজের পূর্বতন আত্মীয় স্বজনের পরিচয় দেয়। অভিজাত, ধনী, ব্যবসায়ী ও সিনেমাস্টার সকলের সঙ্গেই নাকি এদের দারুণ দোস্তি।

এদের দলে-ই ভিড়ে গেলো নারায়ণ কৌশিক। তার মতন ক'রে সে-ও বাঁচতে চেয়েছিলো। জিত্‌ছিলো-ও কিছু দিন। তারপর হেরে গেলো। 'Better luck next time.' এ দফায় আর হলো না।

১৩

ভারতবর্ষ ছেড়ে বৃন্দা বাইরে চলে যাচ্ছে কিছুদিনের মতো, একথা ছড়িয়ে পড়তে দেরী হল না।

ছন্নছাড়া মন নিয়ে এখানেই ঘুরে বেড়ালো বৃন্দা কিছুদিন। সমাজজীবন থেকে একেবারে অবসর নিলো সে। তবু বৃন্দা বহুজনের আলোচনার বস্তু। সাধন আর তার নাম নিয়ে কত কথাবার্তাই যে উঠলো। ডিভোর্সের ব্যাপারটা রহস্য আরো ঘনীভূত করলো। বৃন্দা কোনো কথা-ই বললো না বলে উৎসাহ স্তিমিত হলো ক্রমশঃ।

ভারত ছেড়ে যাবার আগে সাধনকে একবার দেখবার বড় ইচ্ছে ছিলো বৃন্দার। সম্ভব হলো না। পিঠের হাড়ে থোরাকোপ্ল্যাস্টি চলেছে একটা একটা ক'রে পাঁচটায়। বাঁচবে হয়তো। কিন্তু আধখানা মানুষ হয়ে। কিছু করতে পারবে না যখন, গিয়ে কি করবে বৃন্দা? বৃন্দা কি জানেনা যে, পংগু হয়ে বেঁচে থাকবার চেয়ে হাজার বার মৃত্যু কামনা করবে সাধন? জুহুর সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে ঢেউয়ের মাথায় ফস্‌ফরাস দেখতে দেখতে, অথবা মেরিণড্রাইভ ধরে অনেক রাতে হাঁটতে হাঁটতে, অনেক বার ভেবে দেখেছে বৃন্দা। বুঝেছে, যা ভাঙলো, তা আর জোড়া লাগবে না। একথা যে এমন ক'রে বুঝতে হবে তা সে ভাবেনি। তবু ত' বুঝতে হলো। কি দাম দিয়ে কিনলো সে এই অভিজ্ঞতা? দাম দিতে গিয়ে দেউলে হয়ে গেল হৃদয় মন। ঘা খেয়ে ভেঙে চুরে গেলো সব। আবার সে একলা হলো। একলা সে কবে নয়? সেই শৈশব থেকেই সে একলা, নিঃসঙ্গ। জীবন তার সঙ্গে বারবার টক্কর দিয়েছে। হার-জিতের খেলা খেলেছে। আবার সে একলা আজ। তার জীবনে একবারই সব ক্ষতি পূর্ণ করে স্বর্গ নেমেছিলো মর্তে। আবার নির্মম ভাবে সমস্ত শেকড় ছিঁড়ে ফেলতে হলো।

চলে যাবার প্রাক্কালে দেখা করতে এলো বন্ধুজন ভিড় ক'রে। এক জনের পর এক জনকে কথা বলে বিদায় দিতে দিতে অনেক রাত হয়ে যায়। সহানুভূতি জানাতে আসে মানুষ। বৃন্দার অসহ্য লাগে। এমন করে বদলে গেলো বৃন্দা কেমন করে, ভেবে ভেবে বন্ধু সুহৃদ অবাক। বিদায় নেওয়াটা একটা ক্লান্তিকর অধ্যায়।

তার ট্রুপের ছেলেমেয়েদের মধ্যে একমাত্র বীণাই এসেছিলো তার মনের কাছাকাছি। এ সময়ে বীণা-ও এখানে নেই। মায়ের কাছে গিয়েছে ব্যাঙ্গালোরে। তাই বৃন্দা যখন জানলো একটি অল্পবয়সী মেয়ে বারবার তার খোঁজ করেছে হোটেলে এসে, অবাক হলো।

সমস্ত বাঁধা হলো। গুছনো হলো। জাহাজের টিকিট, ছাড়-

পত্রের ব্যাপার সবকিছুই হয়ে গেলো একে একে। পরদিন বিকেলে জাহাজ ছাড়বে। রাতে তাড়াতাড়ি সকলকে বিদায় দিলো বৃন্দা। আজকের রাতটা সে একলা থাকতে চায়। এমনি সময় দরজায় টোকা পড়লো। সুন্দর তরুণ মেয়েলী গলায় কে প্রশ্ন করলো,—

—ভেতরে আসতে পারি ?

—আসুন !

এলো যে মেয়েটি তাকে দেখে অবাক হলো বৃন্দা। বছর তেইশ চব্বিশ বয়স হবে বড়জোর। কোমল লাবণ্যময় সুশ্রী চেহারা। দামী অথচ সাদাসিধা পোষাক। মেয়েটি তাকে করজোড়ে নিচু হয়ে নমস্কার করলো। বললো,—

—ক'দিন ধ'রে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করছি আমি। আমার নাম রাধা। আমি সাধনকে খুঁজছি। তার খোঁজ নিতে, আপনার কথা বললো সবাই। তাই আপনার কাছে এলাম।

দেয়ালের মস্তো আয়নায় দুজনের ছায়া পড়েছে। জীবনের অনেক অভিজ্ঞতার ক্লান্তির ছাপ বৃন্দার চোখে মুখে, ঝুলে পড়া কাঁধে, চোখের নিচের কালিতে। রাধা তরুণ, সুন্দর, উজ্জ্বল। বিশ্বাস আর ভালোবাসা চোখে নিয়ে চেয়ে আছে জগতের দিকে। রাধাকে অবাক হয়ে দেখতে লাগলো বৃন্দা। এমন ধারা নিষ্পাপ, পবিত্র, অনাঘ্রাত সুন্দর যৌবন তার কবে ছিলো ? কবে সে এমন বিশ্বাস-ভরা চোখে চেয়ে থাকতে জানতো ? সে বয়স, যেন বৃন্দা কোথায় কোন্ অতীত যুগে ফেলে এসেছে হাজার বছর আগে। বড় দুঃখে নিঃশ্বাস পড়লো বৃন্দার। বললো,—

—তুমি-ই রাধা ?

—হ্যাঁ। আমার নাম বলেছিলো সাধন ?

রাধার আগ্রহভরা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বড় মায়া হলো বৃন্দার। মমতাভরা চোখে বললো,—

—বলেছিলো। বলেছিলো 'রাস' নাচে তুমি তার সঙ্গে রাধা সাজতে।

সলাজ হাসি ছড়িয়ে গেলো রাধার মুখে। বললো,—

—আর কিছু বলেনি ?

—বাকিটা তুমি-ই বলো রাধা।

এই মেয়ের নাম বৃন্দা কৌশিক? যার নাম রাধা কতবার শুনেছে? সাধন আর বৃন্দার বিচ্ছেদের কথা শুনেছে। সে ভেবে এসেছিলো অন্য কথা। বৃন্দা নিশ্চয় সেই জাতের মেয়ে, যারা পুরুষদের জীবন শুধু ভেঙে দিতে-ই জানে। কিন্তু এখন যাকে দেখলো, তার সঙ্গে দশ জনের মন্তব্যগুলো ত' মেলে না। গম্ভীর, শান্ত, বিষাদগভীর-নয়ন বৃন্দাকে দেখে শ্রদ্ধা হলো রাধার। এতবড় শিল্পী, অথচ এতটুকু অহংকার নেই। এত নাম ধাম তার দেশে বিদেশে, এমন ধনীঘরের মেয়ে সে—কিন্তু পোষাকে, প্রসাধনে সে উগ্র আত্মপ্রচার কই? তাকে মিথ্যে কথা বলেছে সবাই। উচ্ছ্বসিত হলো রাধা। বললো,—

—তোমাকে দেখে আমি সত্যি অবাক হলাম। কতজন যে কত কথা বলেছিলো!

ঈষৎ হাসলো বৃন্দা। বললো,—

—মানুষ ত' অনেক কথা-ই বলে। সে কথা থাক। তোমার কথা বলো।

তারপর কি যেন মনে পড়লো বৃন্দার। বললো,—

—তোমার কথাই না শুনেছি? তুমি-ই কি চিদম্বরম্ আর সূর্যমণির নতুন ছাত্রী ভরতনাট্যমের? চিদম্বরম্ তোমাকে-ই উপাধি দিয়েছেন নটরাজ উৎসব মণ্ডলে?

সহাস্যে মাথা নিচু ক'রে স্বীকার করলো রাধা। সহসা পূর্ব-স্মৃতিতে জল ভরে উঠলো বৃন্দার চোখে। বললো,—

—আমার গুরুর প্রথম শিষ্য চিদম্বরম্। আমার আচার্য তাঁকে বড় ভালোবাসতেন। আজ যদি তিনি থাকতেন!

তারপর ভিজেচোখে-ই হাসলো। বললো,—

—তোমার কথা বলো রাধা। সাধনকে কেন খুঁজছ? তাকে কি তুমি অনেকদিন চেনো?

পুরোন কথা স্মরণ ক'রে কখনো সলাজ হেসে রক্তিম হয়ে, কখনো ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে, কখনো কৌতুকে হেসে রাধা বলে গেলো তার কথা। জানালো কণ্ঠমণির আশ্রম থেকে এসে সে দক্ষিণের নৃত্যগুরুর কাছে শিক্ষা নেয়। তিন বছর ধরে শিক্ষা করেছে সে। তার গুরু সন্তুষ্ট হয়েছেন। একদিন তার সম্মান বাঁচাতে চলে এসেছিলো সাধন। তাকে উপেক্ষা করেছিলো। রাধা সেদিনের কথা মনে রেখেছে। শিল্পী যে, শিল্পসাধনাতে-ই তার মুক্তি এ কথা সাধন তাকে বলেছিলো। সে কথা মনে ক'রে রেখেছে রাধা। এখন তার শিক্ষা শেষ হয়েছে। ট্রুপ গড়তে চায় রাধা। তার বাবা তাকে যা দিয়ে গিয়েছেন, সেই পুঁজিই পর্যাপ্ত হবে।

তার দিকে চেয়ে রইলো বৃন্দা। এমনি করে-ই কি জীবনে এক একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হয়! একদিন সে-ও সাধনের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তাদের দু-জনের গড়া কলাতীর্থম্‌কে মনে করেছিলো, সাধনের মানসের চরিতার্থ রূপ। তাদের সে বিশ্বাস ভেঙে চুরে গেলো। কলাতীর্থমের অস্তিত্ব গেলো মুছে। অসুস্থ সাধন। বাঁচে কি না বাঁচে কে জানে! বাঁচে-ও যদি, ট্রুপ গড়তে না পারলে সে হবে সাধনের পক্ষে জীয়ন্তে মরণ। সাধন বৃন্দা নয়। সাধন আবার ট্রুপ গড়তে চাইবে-ই। না পারলে হয়তো মরে যাবে। সেইজন্যে-ই আজ রাধা সাধনকে খুঁজে খুঁজে এলো? নির্জনে বসে সাধনা ক'রে নিজেকে সাধনের যোগ্য ক'রে তুললো? তারপর এলো সন্ধান করে?

বৃন্দা নিজে ত' এত কষ্ট করেনি। এমন করে নিষ্ঠাভরে সাধনা

করেনি সাধনের যোগ্য হবার জন্যে? হয়তো এ-ই অভিপ্রেত জীবনের। বৃন্দা যা পারেনি, রাধা তা পারবে।

রাধা বলে,—

—দেখিনি, তবে কলাতীর্থমের সম্বন্ধে কাগজে ত' পড়েছি। সাধন বরাবরই নাচের জন্যে নতুন আঙ্গিক খুঁজেছে। যা বাঁধাধরা, যা মামুলী, তা সে কোনও দিনই পছন্দ করেনি। তার শিক্ষাদীক্ষা নিয়ে সে নতুন আঙ্গিক আবিষ্কার করতে চেয়েছে। সে কথার আমি আভাস মাত্র পেয়েছিলাম আমাদের সেই রাস উৎসবের সময়।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় রাধা। পায়চারী শুরু করে ঘরে। অবাক হয়ে তাকে দেখে বৃন্দা।

রাধা বলে,—

—নতুন আঙ্গিকের প্রয়োজন আমি-ও বিশেষ করে অনুভব করেছি। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবার অবকাশ আছে। অনেক পরীক্ষা করবার ইচ্ছে রাখি। সাধনের অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে ইতিমধ্যে। সেগুলো কাজে লাগবে।

বৃন্দা বলে,—

—সাধন অসুস্থ রাধা। সাধন স্যানাটোরিয়ামে। শুনেছি শীঘ্রই আসবে সীতমপুরে। যশবন্তের বাড়ীতে। যশবন্তকে ত' তুমি জানো?

—জানি।

ঈষৎ তীব্রস্বরে বৃন্দা বলে,—

—অসুস্থ শরীর নিয়ে কি নতুন আঙ্গিকের খোঁজ করবে সে রাধা?

রাধা হাসে। বলে,—

—সাধন নৃত্যশিল্পী। অতৃপ্তি আর সৃষ্টি করবার ক্ষুধা তার রক্তে আছে। দেহ অসুস্থ ব'লে তার মনটা তো মরে যাবে না?

সাধনের জন্যে আমি ট্রুপ গড়বো। পরীক্ষা নিরীক্ষা করবার অজস্র অবকাশ দেবো।

—সে পারবে না।

—তার দেহ যেখানে পারবে না, সেখানে আমি তাকে সাহায্য করবো। সে যা বলবে আমি নাচে দেখাবো।

মনের শেষ কোণায় কোথাও অহমিকার পরিশিষ্ট কিছু ছিল না কি? রেণু রেণু হয়ে যায় সে অহমিকা। এতদিনে চূড়ান্ত পরাজয় স্বীকার করে বৃন্দা। এ পরাজয়ে কোনো অগৌরব বোধ করে না। রাগ, দুঃখ বা ব্যর্থতা বোধ নয়, একটা মুক্তির আনন্দবোধ থেকে উৎসারিত হয় অশ্রু। বৃন্দার চোখে জল দেখে মমতা হয় রাধার। বৃন্দা হাসে। বলে,—

—এই ভাষায়-ই সাধন-ও কথা বলে। আমি পারিনি রাধা। আমার চোখে মানুষটা অনেক বড়ো ছিলো। সেখান থেকেই বিরোধ লাগলো।

রাধা বলে,—

—তুমি এত বড়ো শিল্পী বৃন্দা। দূর থেকে কত শ্রদ্ধা করেছি তোমায়। সাধন তোমাকে পেলো। বল, কত সার্থক হতে পারত সে।

—হয়তো পারত না। আমাকে নিয়ে পারত না। আমি অন্য জাতের মানুষ রাধা। তা ছাড়া এর কি শেষ আছে? তুমি পারবে রাধা, আমি পারিনি।

রাধা বলে,—

—সাধনের মতো মানুষ—মনে প্রাণে খাঁটি শিল্পী। তাকে শুধু-ই শিল্প সৃজনের অবকাশ দিতে হবে। তা ছাড়া ত' আমি-ই বাঁচতে পারব না বৃন্দা। সাধন আমাকে সচেতন করেছিলো। সেই থেকে আমি নিজেকে জানলাম। তুমি বিশ্বাস করো বৃন্দা নাচ ছাড়া আমি কিছু ভাবতে পারি না। বাঁচতে পারি না। আমার অন্য কোনো জগৎ নেই। তা-ই সাধনকে চাই আমি। তার-ও অন্য কোনো

কামনা নেই। এখন-ও কি বলবে বৃন্দা? পারবো না আমরা? ও একা হলে পারতো না। ও ত' একা নয় বৃন্দা।

তখন বৃন্দা বললো,—

—রাধা! একটা অনুরোধ করবো। রাখবে?

—কি বলো?

—আমার ট্রুপ যখন ভেঙে দিলাম, তখন ভাবিনি আবার এসব কথা এমন করে ভাববো। তোমার পরিকল্পনার যদি কোন ব্যাঘাত না ঘটে, তবে বলি—কলাতীর্থমে যে সব ছেলেমেয়েরা এসেছিলো তাদের নামের সম্পূর্ণ তালিকা রয়েছে যশবন্তের কাছে। যদি প্রয়োজন মনে করো, তাদের খবর দিও।

—নিশ্চয়।

উৎসাহিত হয়ে ওঠে বৃন্দা। ছুটোছুটি করে বাক্স নামায়। স্যুটকেশ খোলে।

—দেখ, ওদের নাম ঠিকানার একটা কপি আমার কাছে-ও আছে। আর এই বাক্সগুলো—এতে রয়েছে কত পোষাক। বাকি সব রয়েছে যশবন্তের কাছে। তুমি এগুলো নাও রাধা। তোমার কাজে লাগুক।

রাধা আশ্চর্য হয়ে বৃন্দার আনন্দ দেখে। বলে,—

—কি চমৎকার শরীর তোমার বৃন্দা! তোমার মতো শিখতে আমার দেরী আছে।

বৃন্দা হাসে। বলে,—

—নিয়মিত ব্যায়াম কোর রাধা। খাবার বিষয়ে কড়াকড়ি রেখো। আঠারো বছর বয়স থেকে এই আটাশ বছর অবধি খুব নিয়ম আর কড়াকড়ি করে থেকেছি রাধা। জানো ত' দক্ষিণের নৃত্যগুরুরা কি রকম কড়া এ সব বিষয়ে।

দুজনেই হাসলো। তারপর রাধা বললো,—

—তোমার নাচ দেখতে পেলাম না বৃন্দা, আফ্‌শোষ!

—আফ্‌শোষের কথা নয়। কোনদিন সময় মেলে ত' হবে আবার।

ব'লে বৃন্দা তার এ্যালবাম বের ক'রে আনলো। মস্তো একখানা ছবি বের করলো তাঁর নিজের। নাম লিখে দিলো রাধার হাতে। 'নতুনকে—পুরাতন', এই লেখা দেখে দুঃখ পেলো রাধা। বললো,—

—এ কি বৃন্দা ?

বৃন্দা হাসলো। বললো,—তাতে কি হয়েছে ? সত্যিই ত' আমি পুরোন হয়ে গেছি। বুড়িয়ে গিয়েছি। তোমাকে দেখলাম, এখন আর আমার কোনো আফ্‌শোষ নেই রাধা।

পরস্পর পরস্পরের হাত ঝাঁকালো। অনেকদিন পর সেদিন রাতে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোলো বৃন্দা।

১৪

"সাধন,

নেপ্‌লসের জেলে-বসতির পাশের একটা কটেজে ব'সে তোমায় লিখছি। নাম 'ভিলা রিগ্যাটা'। কিন্তু ছোট্ট কটেজটি। দরজা ঢেকে ঝুলে পড়েছে লতানে গোলাপ। পাইপে জল আসে না। চিমনী দিয়ে ধোঁয়া বেরোয় না। বাগানের কোনো যত্ন নেই। কিছু মেরামতের কথা বললেই বুড়ী বাড়ীওয়ালী বলে—সি, সি, সিনোরা! অনেক অব্যবস্থা। তবু ভালোই লাগছে। নীল সমুদ্রে ছোট ছোট নৌকো নিয়ে জেলেরা মাছ ধরতে যায়। বালির ওপর কাঠের পোলে সুতো বেঁধে সারি সারি মাছ শুকোতে দেয়। যেমন নোংরা মানুষগুলো, তেমনি ঢিলে ঢালা জীবনযাত্রা। অনেক মিথ্যে কথা বলে, প্রচুর মদ খায়, চুরি করতে ওস্তাদ। তবু বেশ খোলামেলা মন, আন্তরিকতা আছে, চমৎকার হাসিখুসী। সবশুদ্ধ

এদের সঙ্গে আমাদের বেশ মেলে। একটি সুইডিস পরিবারের সঙ্গে আছি। ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা ছবি তুলতে এসেছেন এখানে।

আমার চিঠি যখন পাবে তখন তুমি স্যানাটোরিয়াম থেকে ছুটি পেয়েছো।

তোমার খোঁজ ক'রে রাধা এসেছিলো আমার কাছে। এতদিনে রাধার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে নিশ্চয়।

সাধন, রাধাকে দেখে তবে আমার শিক্ষা সম্পূর্ণ হলো। তুমি আমাকে শিল্পী বলেছিলে সাধন,—যে অর্থে তুমি বা রাধা 'শিল্পী' কথাটা বলো, সে অর্থে কোনদিন-ও আমি শিল্পী ছিলাম না। স্নেহ ভালোবাসার অভাববোধ ভেতরে ছিলো। ভালোবাসার জন্য কাঙাল ছিলাম। আমার চোখে মানুষ তুমি-ই অনেক বড়ো ছিলে সাধন। তাই তুমি যখন চলে গেলে, কই আমি ত' ট্রুপ নিয়ে বাঁচতে পারলাম না সাধন! আমার নিজের মন প্রাণের ক্ষয় ক্ষতিটা-ই বড় হয়ে উঠলো। সেখানেই আমি ভেঙে গেলাম।

অনেক ভাঙচুর ক'রে এলাম। সে-ও তোমাকেই ভালবেসে। তোমাকে ভালবেসে তবে প্রথম মনটা ঝুটো আর সাঁচ্চা যাচাই করতে শিখলা। মনে হলো অনেক অর্থহীন দায় বন্ধনে বাঁধা পড়েছি। সে সব কাটিয়ে এসেছি তুমি জানো। এখন নিজেকে অনেক পরিষ্কার বোধ হচ্ছে। আবার হয়তো একলা হলাম। কিন্তু এই নিঃসঙ্গতাকে আর ভয় করি না। তোমাকে ভালোবেসে আমার সাহস বেড়েছে সাধন, একটা পূর্ণতার বোধ এসেছে। সবটা-ই ক্ষয় নয়। ক্ষতি নয়। এগুলো মস্তো ক্ষতিপূরণ।

ছেড়ে আসতে কষ্ট হয়েছিলো। কত কত দিন যে দুঃস্বপ্নের মতো গেলো সাধন। আত্মহত্যা করবার কথা যে ভাবিনি তা-ও নয়। তবে সে হতো চূড়ান্ত পরাজয়। তোমাকে ভালোবেসে আর কোনো খেলো বা সস্তা কিছু করতে প্রবৃত্তি হলো না। অত সহজে জট

ছাড়িয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায় না। সহজ-ই হবে কেন বলো? ভালোবাসলাম। অপূর্ব কতো অনুভূতি জানলাম। সে-ই দুটো-বছর আমাকে অনেক কিছু দিলো। বলো, তার দাম দেবো না? বিনামূল্যে কিছু পাওয়া যায় না। আমার সেই দুর্লভ অভিজ্ঞতার দাম দিয়ে যাবো আমি। মিথ্যাচরণ করবো না। তুমি ত' জানো আমি কোনদিন ছলনা করতে পারি না। না নিজেকে, না অপরকে।

সে তীব্র দুঃখ এখন প্রশমিত। তোমার আমার মিলন কোনোদিন হতে পারতো না, তাই হয়নি। যা হলো তার মধ্যে-ই তোমার সার্থকতা আর আমার মুক্তি।

আমার আগেকার মানস হ'লে আত্মসমর্পণ ক'রে সান্ত্বনা খুঁজতাম। সুইন্‌বার্ণের কবিতার কথায় বলতাম—

'From too much love of living,
From hope and fear set free,
We thank with brief thanksgiving
Whatever gods may be
That no life lives for ever;
That dead men rise up never;
That even the weariest river
Winds somewhere safe to sea.'

আজ আমি নিজেকে ক্লান্ত নদী মনে করি না। বাইরের কাব্য সাহিত্য বা ধর্ম থেকে সান্ত্বনা আহরণ করা-ও অসম্ভব আমার পক্ষে। আমার নিজের ভেতর থেকে-ই আমি সান্ত্বনা পেয়েছি।

দুটি বছর আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। তারাই আমাকে ভরে দিয়ে গিয়েছে। জীবন আজ আমার কাছে অনেক অর্থপূর্ণ। বাঁচবার উদ্দেশ্য ও আনন্দ অনেক বেশী। পৃথিবী ও মানুষ আমার চোখে অনেক সুন্দর।

এ দেশে থাকতে পারব না। ভারতে ফিরব। রাধা আর তুমি

ততদিনে হয়তো সার্থকতা খুঁজে পেয়েছ। সে পথে হয়তো অনেক সংগ্রাম। অনেক প্রয়াস। সে অধ্যায়ের কথা আমি জানি না। সে তোমাদের নিজস্ব। তোমরা গড়বে, সৃষ্টি করবে, সার্থক হবে। তোমাদের যুগ্ম ভবিষ্যতের সার্থকতা কামনায়—॥ বৃন্দা ॥"

সীতমনদীর পাশে যেখানে একদিন বাঞ্জারারা তাঁবু ফেলেছিলো, অনেকদিন আগে যেখানে রুক্মিণীদের নাচ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলো সাধন, সেখানে সেই নিমগাছের ছায়ায় বসে সাধন পড়লো চিঠিটা। এ জায়গাটা সাধনের বড় প্রিয়। তার জীবনের অনেকগুলো অধ্যায়ের সঙ্গে এই জায়গাটি জড়িয়ে আছে। একদিন এই সব জায়গায় বৃন্দার সঙ্গে কলাতীর্থম্ নিয়ে কত আলোচনা হতো। সে সব দিন কোথায় চলে গিয়েছে।

চিঠিখানা পড়ে সে ক্ষণিক চুপ ক'রে রইলো। তারপর একাই একটু হাসলো। বললো,—

—বৃন্দা!

উঠে হাঁটতে শুরু করলো সাধন। সাধনকে যারা বছর দুই দেখেনি, দেখলে অবাক হবে। পিঠের দিক থেকে পাঁচখানা পাঁজরের হাড় নেই। শরীর ভারী হয়ে গিয়েছে। নিচু হবার ক্ষমতা নেই। আস্তে আস্তে হাঁটে সাধন।

অনেকদিন আসেনি এখানে। নিমগাছটার গায়ে কেমন কালো হয়ে উঠেছে বাকলগুলো। খাড়া পাথর উঁচু হয়ে রয়েছে দুটো। সাধন জানে ওখানে উটের গাড়ী নামিয়ে রাখবে বাঞ্জারা-রা আরো মাসখানেক বাদে। এখন হেমন্তকাল। এখনি শিরশিরে বাতাসে শীতের আমেজ লেগেছে। নিম গাছের পাতাগুলি পরিণত হয়ে হলদেটে হয়েছে। উত্তুরে বাতাসে ঝরে পড়বার দিন এলো। দেখে দেখে সাধনের মনে বিষণ্ণ উদাস ভাব জাগে। কতদিনের পরিচয়ের এই জায়গা। সাধন কি জানে, আবার কবে ফিরবে? যশবন্তকে ছেড়ে যাবার দুঃখ-ও তার কম নয়। ভাইয়ের ভালোবাসা

পায়নি সাধন, এমন কোনো বন্ধুকে-ও পায়নি। যশবন্ত তার ভাইয়ের চেয়ে-ও অধিক।

বিদায়ের বিষণ্ণতার মধ্যেই ভবিষ্যতের কর্মজীবনের আহ্বান। বিস্ময় আর ফুরোলোনা সাধনের। কতবার কত ভাবে কত যে অভিজ্ঞতা হলো তার। কোনো অভিজ্ঞতা-ই কম দামী নয় তার কাছে। তার জীবনের ভাণ্ডারে এরা হীরে চুনী পান্না।

স্যানাটোরিয়ামে সাধন ছিলো ডাক্তারদের কাছে একটা বিস্ময়। বাঁচবার দুর্মদ আকাঙ্ক্ষা সব টি. বি. রোগীর-ই হয়। সাধন তাদের মধ্যেও একটা ব্যতিক্রম। সাবধানতা আর নিরাপত্তার খাতিরে পাঁচটা পাঁজরই বাদ দিতে হলো। একদিকের ফুসফুস করে দিতে হলো বন্ধ। মৃত্যুর সঙ্গে নিয়ত সাক্ষাৎ হয়েছে সাধনের। তবু তার বাঁচবার আকাঙ্ক্ষা দুর্দম। শরীরের রক্তকণিকায় সে ইচ্ছা সংগ্রাম করতো। ডাক্তার যা বলতেন তাই করেছে সাধন। একদিনের জন্যে একটি কথা-ও অমান্য করেনি। অপারেশানের প্রতিক্রিয়া সামলাতে পারবে কি না ভেবে ডাক্তার যখন চিন্তিত হতেন, সাধন প্রত্যেকবারই হেসে বলেছে,--

—আমি বাঁচবো-ই ডাক্তারবাবু। আমাকে বাঁচতেই হবে।

এতো বড় একজন আর্টিস্ট, দেশের সে গৌরব। ডাক্তার তাকে শুধু শ্রদ্ধাই করেননি, তার তিনি মস্তো বন্ধু হয়ে উঠলেন। পড়তে দিলেন এমন অনেক বই, যাতে মানুষের জয়ের কথা-ই লেখা আছে। দেশবিদেশের মুক্তি-সংগ্রামের কাহিনী। ইয়োরোপের চিত্রশিল্পীদের সংগ্রামী জীবনের কথা। সাধনের বিষয়ে কৌতূহল ছিলো অনেকের-ই। তার সম্বন্ধে খোঁজ নিতে বৃন্দা কৌশিকের চিঠি নিয়মিত এসেছে ডাক্তার সেনের কাছে। দুইলাইনের সংক্ষিপ্ত চিঠি। তাতে সাধনকে বিব্রত না করবার অনুরোধ থাকতো টানা পুরুষালি স্বাক্ষরে। স্যানাটোরি-য়ামে ডাক্তারদের নানারকম অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়। বৃন্দার অনুরোধটুকু রেখেছিলেন ডাক্তার সেন। তার নামের সঙ্গে পরিচিত

ছিলেন সামান্য-ই। তবে সাধনের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে কিছু কিছু কথা এই সুদূর শৈলাবাসে-ও পৌঁছেছিলো। সাধনের আরোগ্য সংবাদ তিনি-ই দিয়েছিলেন বৃন্দাকে। সাধনকে সারিয়ে তিনি সত্যিই আনন্দিত হলেন। এমন আনন্দ তাঁর চিকিৎসক জীবনে খুব বেশী পাননি। চিকিৎসক আর রোগী দুই পক্ষেরই মনে হলো একটা মস্তো জয় হয়েছে।

সাধনকে নিয়ে যশবন্ত এলো সীতমপুরে। মৃত্যুকে এই দু' বছরে খুব নিকট ক'রে দেখেছে সাধন। দেখেছে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কত মানুষের কত মহান্ সংগ্রাম। দেখে বাঁচবার অকাঙ্ক্ষাটা-ই সে শিখলো। এখনো অনেক বাকি রয়েছে তার। কিছুই করেনি। এই দেহ নিয়ে নিজে সে কি করবে? অথচ নতুন নতুন আঙ্গিকে কতো নৃত্যপরিকল্পনা সে সব কি মিথ্যে হয়ে যাবে? দেয়ালে পেনসিল দিয়ে এঁকে দেখতো সাধন। নাচের মানুষদের বিভিন্ন জায়গায় সন্নিবেশ করতো আর কল্পনায় দেখতো কেমন হয়।

কোনো আশার কথা যশবন্তের-ও মনে আসে না। সাধন অল্প অল্প হাসে। বলে,—

—আর কেন যশবন্ত, এবার ছুটি দাও। চলে যাই। এ দেহ নিয়ে তোমার ওপর বোঝা হয়ে আর থাকবো না।

যশবন্ত সজোরে প্রতিবাদ করে। তবু সাধন ঠিক করে ফেলে এখানে আর থাকবে না।

এমনি সময়ে এসে পৌঁছলো রাধা। সাধনের ঘরের পর্দা সরিয়ে ঢুকলো যখন তখন আবছা গোধূলি আঁধারে বিভ্রম হলো সাধনের। বললো,—

—কে, কে তুমি?

ছুটে এসে নতজানু হয়ে বসে পড়লো রাধা পাশে। বললো,—

—আমি রাধা, সাধন। রাধা!

রাধা ? মনে করতে যেটুকু কষ্ট হলো সাধনের, তাতে-ই সে চোখ বুঁজলো। তাকিয়ে দেখলো আবার। না। এখনো রয়েছে। মনের বিভ্রম নয়। বললো,—

—রাধা। রাধা।

এই মুখখানা আড়াল করে যেন চকিতে সেই অনেকদিন আগেকার চন্দনচর্চিত ওড়নী ঢাকা তরুণ সুকুমার মুখখানা হেসে উঠলো একবার চকিতে। স্মৃতির বাষ্পে আবছা চোখে হাসলো রাধা। বললো,—

—তোমাকে নিতে এসেছি সাধন।

রাধা যে খুঁজে খুঁজে এখানে এসেছে তা-ই সাধনের কাছে একটা বিস্ময়।

কোনো ভূমিকা ব্যতিরেকে-ই রাধা সহজে দাবী করলো। বললো,—

—সাধন, তোমার সঙ্গে ট্রুপ করবো ব'লে নিতে এসেছি তোমায়। তুমি চলো।

বললো,—

—তিন চারবছর ধরে একটানা শুধু-ই শিখেছি সাধন। বৃন্দার গুরুভাই আমার গুরু। কলাতীর্থমের ছেলেমেয়েদের প্রায় প্রত্যেককে-ই পাবে। বম্বেতে সহরতলীতে আমার নিজের বাড়ী। টাকার কথা-ও তোমার ভাবতে হবে না সাধন, বাবা আমাকে যা দিয়ে গিয়েছেন তাতে-ই আমাদের যথেষ্ট হবে।

এমন অবাস্তব মনে হলো প্রস্তাবটা, যে রাধাকে সরিয়ে দিলো সাধন। বললো,—

—যাও রাধা যাও। উত্তেজনা আমার মোটেই সয়না। —সন্ত্রস্ত হয়ে বেরিয়ে এলো রাধা। যশবন্তকে ডেকে সাধন বললো,—

—যশবন্ত, ও যাবে কবে ? ওকে এ সব কথা বলতে বারণ কোর

যশবন্ত। কে বলেছে ওকে আমার কাছে এসে এসব কথা বলতে? ওর ভাষা আমি বুঝিনা। আমার কষ্ট হয়। ও যেন আমার ঘরে আর না আসে।

একদিন যে ঘরে বৃন্দা আর নারায়ণকে ঠাঁই দিয়েছিলো, সে-ই ঘরে-ই রাধাকে-ও থাকতে দিয়েছে যশবন্ত। হাজার হলে-ও যশবন্ত আর রাধা পুরোনো দিনের বন্ধু। অনেক দিন ধরে-ই চেনাপরিচয় ছিলো তাদের। তবু যেন রাধাকে চেনা যায় না। অনেক স্বপ্ন রাধার চোখে, অনেক কল্পনা তার। যশবন্তকে বসালো রাধা টুল টেনে এনে। খাটিয়ার ওপরে খুললো তার পোর্টফোলিও। বললো,—

—দেখ, আমি দশবারো জনের সঙ্গে আলাপ করেছি। একটা ট্রুপ চালাতে কতো টাকা লাগতে পারে না পারে, তাদের অভিজ্ঞতা থেকে তারা বলেছে। অনেক দূর ভেবে চিন্তে তৈরী হয়ে-ই নেমেছি আমি। ট্রুপ ভাঙে কিসে যশবন্ত? টাকার জন্যে ত'? আমার বাড়ী আছে। এক বছর লড়বার মতো পুঁজি আমার আছে। তারপরে কে বলতে পারে না, ট্রুপের খরচ চালাবার মতো টাকা আমাদের শো থেকেই উঠবে না? সাধনকে আমি কোনো ভাবে বিব্রত করবো না যশবন্ত। তাকে কিছু করতে হবে না। সে শুধু কম্পোজ করবে।

যশবন্ত বললো,—

—এই দেহ নিয়ে?

—তাকে ও কিছু করতে হবেনা যশবন্ত। সে নির্দেশ দেবে, নাচ তুলব আমি। তার নির্দেশে আমি-ই কম্পোজ করব। কেন পারব না বলো?

—তা কখনো হয়?

অবিশ্বাসের হাসিটা তেমন ক'রে ফুটতে পায়না যশবন্তের চোখে মুখে। ঘুরে দাঁড়ায় রাধা। বলে,—

—কেন হয়না ? কি হয় আর হয় না সে কথার তুমি আমি কি জানি ? অথবা কে-ই বা জানে ? লোকনৃত্য নিয়ে সাধনের যে পরীক্ষা, তা যে সার্থক হতে পারে তা কি ভেবেছিলে কলাতীর্থমের শো দেখবার আগে ? প্রাচীন দিনে সুরকার-রা যে আদি রাগ ও রাগিণী সৃজন করেছিলেন তার ওপর কতো গবেষণা কতো পরীক্ষা নিরীক্ষা আজ-ও চলেছে। নতুন নতুন রাগ ও পদ্ধতির সৃষ্টি চলেছে, নতুন গায়কী ধারা ও শ্রেণীগানের উৎপত্তি কতো হচ্ছে, কতো হবে—রসিকজন বারবার মুগ্ধ ও বিস্মিত হবেন। নাট্যাচার্য ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রমের নির্দেশ মেনেই কি আজ-ও নৃত্যশিল্পীরা চলেন ? যে সৃষ্টি করতে চায় সে-ই ত' নীতি নির্দেশের বেড়া পেরিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে চাইবে। তার ফলেই নতুন নতুন আঙ্গিক রীতি ও নাচের সৃষ্টি হবে। এতো কথা যদি সত্যি হয় তাহ'লে আমাদের পরীক্ষাই বা সফল হবে না কেন বলো ?

কথা বলতে বলতে কোথায় চলে গিয়েছে রাধা। কি এক সংকল্পে দীপ্ত তার মুখ। রাধা বলল,—

—বল যশবন্ত, সাধন আমার কথা বুঝবে না ?

সকালে রাধা আসবার আগে যশবন্তই সাধনকে বললো। বললো,—

—যা করবে তুমি-ই করবে। কিন্তু রাধার কথাগুলি অবহেলা করতে পারলাম না। উড়িয়ে দেবার মতো কথা ত' ও বলছে না !

রাতভোর সাধন-ই কি সে সব কথা ভাবেনি ? তার-ই কি বারবার মনে হয়নি যে এ একটা আশ্চর্য যোগাযোগ ? কিন্তু সে কথা সে স্বীকার করবে কেন যশবন্তের কাছে ? বললো,—

—তুমি একটা গাঁওয়ার, ওকে দেখে ভুলেছো। এখানকার মেয়েগুলো আধা পুরুষ, তাই সুন্দর মুখটি দেখে গলে গিয়েছো। হাজার হলে-ও তোমরা হলে পুরোনো নৃত্যসঙ্গী।

সাধনের মুখের কথা আর মনের কথা বেশ বুঝতে শিখেছে

যশবন্ত। জবাব না দিয়ে সে গুন-গুন করে গান ধরলো। স্টোভে দুধ বসালো, ডিম বানালো—ভূষি শুদ্ধ লাল আটার গরম রুটিতে মোটা ক'রে মাখন লাগালো। সাধন খেতে লাগলো। নিজের জন্যে চা করতে লাগলো যশবন্ত। বললো,—

—বিরক্ত করোনা সাধন!

ভারতীয়-চা-এর নির্দেশ মেনে চা বানালো যত্ন ক'রে। রাধার জন্যে চা বানিয়ে রাখলো টেবিলে। সাধন বলতে শুরু করলো,—

—তা ছাড়া তুমি বাপু আমার টাকাগুলো মেরেছো। এখন দেখছো মানুষটা অকেজো হয়ে গিয়েছে। তাড়িয়ে দিতে চাইছো। তোমার সঙ্গে আমি কেস করবো যশবন্ত।

যশবন্ত বললো,—

—তোমাকে দেখে হিংসে হচ্ছে সাধন। এ রকম ভাগ্য ক'রে কমজন-ই আসে।

—তার মানে ?

—রাধাকে ডাকি এবার। কথা বলো।

পরিহাস ত্যাগ করে গম্ভীর হলো সাধন। বললো,—

—যশবন্ত, ভয় করে যে!

—ভয় কি সাধন!

—তুমি বলছো, ভয় নেই ?

যশবন্ত গভীর করুণা ও মমতায় বললো,—

—আমি ত' সব সময়ই আছি সাধন। ভয় কি ?

সাধন কাছে আসতে বললো যশবন্তকে। বন্ধুর হাত দু'খানি ধরে বললো,—

—যশবন্ত! এতে-ই আমি মরবো। আমার মরণ এতে-ই। কিন্তু না গিয়ে-ও আমার উপায় নেই। তুমি জানোনা কত রাত আমার না ঘুমিয়ে কাটে। খালি মনে হয়, এ কি হলো! মনটা দেখে তুফান গতির স্বপ্ন, দেহটা হলো বিকল। মনে হয় এ একটা

বেড়াপাকে পড়েছি যশবন্ত। শুধু বেরিয়ে আসবার পথ হাতড়াই। চলে যাই, কি বলো? দেখি যদি কিছু করতে পারি। আমাকে ত' শরীরে মেরেছে। তবু ত' মরে যেতে পারি না যশবন্ত! কি জানো, আজ যদি মরে যাই ত' কেউ জিজ্ঞেস অবধি করবে না। দুনিয়ার এ-ই নিয়ম। সেদিকে চেয়ে ত' আমি বাঁচতে পারব না। আমাকে নিজের জোরেই বাঁচতে হবে। মরে যাওয়া খুব সোজা যশবন্ত। ওতে কোন গৌরব নেই।

তারপর একটু হাসলো। বললো,—

—ব্যাপারটা কি রকম জানো? আনন্দটা একান্ত-ই নিজের। আমি চেষ্টা করলাম, আমি সার্থক হলাম, আমি-ই আমার গলায় জয়মাল্য পরালাম। তারপর এই যে সার্থকতা, বিফলতা, ভুলভ্রান্তি জয় পরাজয় নিয়ে আমি, এ সব শুদ্ধই শেষ করে দিয়ে চলে গেলাম। এ বড় জ্বালা যশবন্ত।

মাথা নাড়লো যশবন্ত। বললো,—

—বুঝি সাধন, বুঝি। আগে হয়তো এতটা বুঝতাম না। বৃন্দা আমাকে অনেক শিখিয়েছে সাধন। তোমাকে-ও দেখলাম!

গভীর কোনো পুরোন কথা স্মরণ করে হাসলো সাধন। স্বল্প হাসি—ক্ষোভ ও গ্লানি মুক্ত। বললো,—

—হ্যাঁ, বৃন্দা। বৃন্দা বড় ভালো মেয়ে যশবন্ত। তবে শেষ অবধি দাম-ও দিলো সে মস্তো বড়ো!

এমন করে বৃন্দার কথা আর কোন দিনই বলেনি সাধন। বললো,—

—কি সে নিদারুণ দুঃখ, ভাবতে পারো যশবন্ত? কত একলা, কত নিঃসঙ্গ। এদিকে তার মতো দর্পিতা, আত্মাভিমানী মেয়ে! তাকে আমি শ্রদ্ধা করি যশবন্ত!

চুপ ক'রে রইল দুজনেই। পলকের জন্য স্মৃতিতে জীবন্ত হয়ে উঠলো বৃন্দার স্বাস্থ্যসমুজ্জল প্রাণবন্ত চেহারা, উচ্চকণ্ঠের হাসি!

তারপর সে স্মৃতিও ছায়া হয়ে গেলো পলকে-ই। দুজনেই তাদের পুরোন বন্ধুর জন্য সমবেদনা অনুভব করলো। হঠাৎ মুখে পড়লো রোদ। দরজা ঠেলে ফাঁক করেছে রাধা। ফুলে ভরা কুর্চি গাছের একটা ডাল ভেঙে এনেছে। বললো,—

—দরজাটা খোলো যশবন্ত! সমস্ত কাপড় আমার পিঁপড়ে-তে ভরে গেলো। যশবন্ত চা খেয়েছো? আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। প্রসাদ! চা করো।

পনেরো বছরের একটি গাড়োয়ালী ছেলে, ফর্সা সুন্দর চেহারা —হাসিভরা মুখ এই প্রসাদ। রাধার সঙ্গে এসেছে। রাধা বললো,—

—প্রসাদকে পেয়েছি বাবার অসুখের সময়ে। তারপর আর ছাড়িনি। ও-ই সব করবে সাধনের জন্যে। বড় ভালো ছেলে প্রসাদ।

চা-পর্ব মিটতে সাধন বললো,—

—রাধা, তোমার সঙ্গে আমি কথা কইব। ব'সো। যশবন্ত, ব'সো।

তখন শুরু হলো কথাবার্তা।

সাধন বললো,—

—বেশী কথা আমি বলতে পারবো না। যা বলি শোন। ট্রুপ একবার গড়ে দেখলাম। নিজেদের মধ্যে সমঝোতা আর বিশ্বাসের অভাবে ভাঙলো কলাতীর্থম্। তার মধ্যে অন্য কারণ-ও ছিলো। কিন্তু সে কথা থাক! এখন আমার স্বাস্থ্য নেই, শরীর নেই। আমি নিজে আর কোনদিন-ও নাচতে পারবার ভরসা করি না। তবে কম্পোজ আমি করবো-ই এ জেনো রাধা। আমাকে যদি তুমি চাও, বলো, এই সব অক্ষমতা, অশক্তি সব জেনে-ই চাচ্ছ তো? খানিকটা ঝুঁকি নিচ্ছ, এ কথা-ও বলে রাখা ভালো। কেননা আমি কি পারব আর পারব না তার অনেকটা-ই নির্ভর করবে

তোমাদের ওপরে। সবটা-ই আমি তোমাকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

রাধা বললে,—

—আমার নিজেকে জানতে কিছু সময় লাগলো! এ জীবন ছাড়া অন্য জীবনে আমার মুক্তি নেই সাধন। আজ যদি তুমি না আসো, তাহ'লে-ও ট্রুপ আমি করবো-ই সাধন। এ তুমি জেনো। সে মনের জোর আমার আছে। তবু আমি তোমাকে চাই। তুমি শুধু নির্দেশ দিও, আমি পা-য়ে নাচ তুলব। তুমি যা যা করতে চাইছ, অথচ দেহের জন্যে পারছো না—তার সবই আমি করবো সাধন। তুমি আঙ্গিক নিয়ে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছো, সেটা কাজে লাগবে। দক্ষিণে-ও কিছু কিছু অন্যান্য লোকনৃত্য আছে সাধন। আমার ভাণ্ডারে-ও কিছু পাবে।

প্রেমের কথা নয়। অঙ্গীকারের শপথ। এক-ই ব্রত যুগলে উদ্‌যাপনের সংকল্প। সাধন বলে,—

—কলাতীর্থমের কিছু ছেলেমেয়েকে পেলে হতো।

—সে সব কাজ সমাপ্ত সাধন। বৃন্দা-ই আমাকে তাদের নাম ধাম দেয়। বম্বেতে গেলে তুমি তাদের পাবে। শুধু সুশীলা আর কমলাকে পাবে না। তারা যোগ দিয়েছে সঙ্গীত বিদ্যালয়ে।

—তোমার ট্রুপের পেট্রন কারা রাধা?

—আমি, তুমি, যশবন্ত, আর ছেলেমেয়েরা। সাধন, ওসব ভাষা ভুলে যাও। পেট্রন তোমার দেশের মানুষজন। আমার বাবা অনেক ক্ষয় ক্ষতি দিয়ে একখানা বাড়ী রেখে গিয়েছেন সাধন। এক বছর ধ'রে ট্রুপ নিয়ে লড়বার পুঁজি আছে। তারপরে তোমাকে আমাকে ট্রুপটা এমন করে তুলতে হবে-ই, যাতে ট্রুপ চালাবার খরচটা আমরাই আনতে পারি। এ রোজগারে সকলের সমান অধিকার থাকবে সাধন। ঐ টাকার ব্যাপার নিয়েই গোলমাল বাধে। সে বিষয়ে-ও তুমি নিশ্চিন্ত হলে। তারপর বৃন্দার কথা বলি।

—বৃন্দার কথা ?

—কলাতীর্থমের অনেক পোষাক, সাজ সরঞ্জাম, পর্দা, দৃশ্যপট, লাইট এসব আমাকে দিয়ে গিয়েছে বৃন্দা। আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎকারের কথা ত' শোননি তুমি সাধন।

—আমি শুনবো রাধা। পরে!

সেই অকৃত্রিম বন্ধুর স্মৃতিতে আজ নিঃসঙ্কোচে অশ্রুপাত করলো সাধন। বললো,—

—রাধা, আমি আর ভাববো না। —তার হাতে হাত রাখলো রাধা। বললো—আর একলা ভাববে না বলো! এখন ত' আমি এলাম। কিন্তু আর দেরী করবো না সাধন। প্রতিটি মুহূর্তের দাম আছে। বুঝতে পারছো না ?

পুরনো দিনের মতো অধৈর্য হয়ে উঠলো সাধন। উৎসাহে অস্থির হয়ে বললো,—

—কে দেরী করতে চায়? আজই চলো। এখনই চলো যশবন্ত! সব গুছিয়ে দাও ভাই। সাধনের মুখখানা দেখে আনন্দে প্রীতিতে ভরে উঠলো রাধার হৃদয়।

১৬

বোম্বাই সহর ছাড়িয়ে লম্বা রাস্তা চলে গিয়েছে বাইরে। সমুদ্রের ধারের ব্যাণ্ড্রা, মাহিম, সব ছাড়িয়ে সেই সহরতলী। সমুদ্রের লোণা বাতাস এখানে পৌঁছয় না। এখানকার মাটি সামান্য উঁচু-নিচু। এ সব জায়গা আজ-ও অনেকটা মফঃস্বল ঘেঁষা।

রাধার বাড়ীটি ঈষৎ উঁচু একটা টিলার ওপরে। ঝুরিওয়ালা, তলা-বাঁধানো বটগাছটার জন্যে বাড়ীটা আগে চোখে পড়ে না। নিচু, সেকেলে ঢঙের দোতলা বাড়ী। দেখতে মস্তো বড়ো। ঘরের

সংখ্যা বেশী নয়। চারপাশে টানা বারান্দা। গুজরাটের পুরোন-দিনের মতো কাঠ ও গালার কারুকাজ করা থাম, জাফরি, খিলান। ওপরে দু-খানা ঘর। নিচে চারখানা। একখানা মস্তো হল্। ভেতরে ঘাসের আঙিনা। তার পরে রান্না বাড়ী। বাড়ীর চেয়ে বাগানের পরিধি অনেক বড়ো। সপেদা, কামরাঙা, আম, গাব, বটগাছ—ছায়াচ্ছন্ন শীতল পরিবেশ। নিচে ঘাসের কোমল আস্তরণ। মাঝে মাঝে কাঠের তৈরি পাখির বাসা। পাখি এসে বসে জল খাবে বলে অনেক পাথরের জলাধার ইতস্ততঃ বসানো বাগানে। রাধার মা গ্রামের মানুষ, ভক্তিমতী মহিলা ছিলেন। তরুণ বয়সে-ই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর-ই শখে এই সব করা হয়েছিলো।

বাগানের একপ্রান্তে গুল্মোর আর কৃষ্ণচূড়ায় ঢাকা বিলিতি কটেজ ঢঙের আউট্ হাউস। একখানা ঘর। জাফরি দেওয়া একটি বারান্দা। এই ঘরই সাধনের জন্যে নির্দিষ্ট ক'রে রেখেছে রাধা। কাঠের মেঝে পালিশ করিয়েছে। একখানা খাট সাধনের। একটি আলনা। একটা টেবিল। বাইরের বারান্দায় রাধার বাবার ব্যবহারের মস্তো ডেকচেয়ার। নানাজাতের পাতাবাহারের টব বসানো বারান্দায়। মানুষের কোলাহল সত্যিই এখানে পৌঁছয় না।

এখানে যখন পৌঁছলো সাধন, তখন ঠিক দুপুর। বিশ্রামের ব্যবস্থা করে তখনকার মতো চলে গেল রাধা।

আউট হাউস থেকে বাড়ী অবধি কাঁকর ঢালা রাস্তা। তার দুইপাশের ইঁটের গাঁথনীতে শ্যাওলা ধরেছে। এখন পাতা ঝরবার দিন। সারাদিন হু হু মন-কেমন-করা বাতাসে পাতা ঝরে পড়ছে। ঝর ঝর মর মর শব্দ হচ্ছে। তারই মধ্যে কাঠবিড়ালী আশ্রয় সন্ধানে ব্যস্ত।

সেই পথ ধ'রে রাধা আর প্রসাদের সঙ্গে সাধন এলো। কাঁচ ঢাকা বারান্দার পরে-ই হল্ ঘর। সেখানে ঢুকল সাধন। সস্নেহে রাধা বললো,—

—সাধন, উত্তেজিত হয়ো না কিন্তু।

আয়ার, রেড্ডি, রাজন, কৃষ্ণা, বীণা, সতীশ, প্যাটেল, শান্তা, কুসুম! ঐ যে নগেন, গোপাল, অমিয়, শঙ্কর, মারুতি, মনোহর। তার কলাতীর্থমের ছেলেমেয়েরা। প্রথমে সাধনকে দেখে মুখে কথা সরেনা তাদের। তারপরই ছুটে এগিয়ে আসে সবাই। জড়িয়ে ধরে মোটা রেড্ডি। ছেলেমেয়েরা প্রণাম করে। বীণা হাত হু'খানা ধ'রে কেঁদে ফেলে। আনন্দে, আবেগে কথা জোগায় না সাধনের মুখে।

গর্ব আর আনন্দে উজ্জল মুখ রাধার। সাধনকে নিয়ে আস্তে আস্তে হল্‌টা দেখায়। ছেলেমেয়েরা সঙ্গে সঙ্গে চলে। দেয়ালে কতো পট, ছবি, ঢাল, তরোয়াল, মুখোশ, পুতুল—কতক বা কলাতীর্থমের, কতক রাধার। মাঝখানের দেয়ালে কাঠের তাক, এদিক ওদিক জোড়া। তাতে সারি সারি পুতুল, ফুলদানী, উপজাতির মেয়েদের অলঙ্কার। মাঝখানে কণ্ঠমণি বড়ঠাকুরের ছবি ফ্রেমে বাঁধানো।

তার পাশে বৃন্দার ছবি দেখে সকলে দাঁড়ায়। সাধন ভালো ক'রে দেখে। সংহত গম্ভীর ভাব ছবিখানার। বৃন্দার মুখখানা যেন এই ছবিখানা আড়াল ক'রে শুভেচ্ছা জানায় সাধনকে। ঈষৎ হাসে। যেমন হাসতো, মঞ্চে প্রবেশ করবার ঠিক আগে। তারপর-ই রাধার দিকে চায় সাধন। সস্নেহ হাসে রাধা। সাধনকে নিয়ে চলে পাশের ঘরে। পোশাক ঘর এটা। সেকেলে ধাঁচের বড়ো বড়ো আলমারীগুলিকে পোশাক রাখবার কাজে লাগিয়েছে। বড় বড় কাঠের বাক্স রয়েছে। অনেকগুলো সাধনের চেনা। আবার অনেক-ই অচেনা।

হলঘরের ওপাশের ঘরটির দেয়ালের গা ঘেঁষে সারি সারি হারমোনিয়াম, তবলা, খোল, তানপুরা, ঝাঁঝর, ড্রাম, করতাল, পাখাওয়াজ, বীণ। দেয়ালে এস্রাজ, বেহালা, সারেংগীর ছড় ঝোলানো।

সারি সারি গজালের গায়ে ঘুঙুরের পেটী। বেশ গর্ব ভরে ঈষৎ হেসে হেসে সাধনকে সব দেখায় রাধা। যেন এ তার রাজ্য। কোনো সম্মানিত অতিথিকে সগর্বে নিজের সাম্রাজ্য দেখাচ্ছে সে। সব দেখানো হ'লে বারান্দায় বসে সাধন। ছেলেমেয়েরা সাধনদা-কে ঘিরে এসে বসে। গোপাল সাধনের পায়ে চাপড় মারতে থাকে আনন্দে। বলে,—

—দাদা রে! দাদা হইয়া নির্বাসন দিয়া কই গেছ্লা? —নগেন চিরকালের কাজের মানুষ। যখন কোনো কাজ নেই, তখন-ও সে ভোরবেলা স্নান ক'রে চুল আঁচড়ে একটা অচল ঘড়ি হাতে বেঁধে কাজের মানুষ হয়ে বসে আছে। এখন বললো,—

—রাধা যখন আমারে কন্‌টাকট করলো, আইয়া পরলাম প্রেসের চাকরী ছাইড়া। অহনে লেদ মেসিন চালাক গিয়া গোয়ানিজগুলি!

মোটা রেড্ডি কবে কোন যুগে রিপোর্টার ছিলো, আজ-ও কথা বলবার ধরণ তার একইরকম। যেন রিপোর্ট দিচ্ছে কাগজে। বললো,—

No troop. No job. Unemployed. Invest money laundry business. Bad partner. Money lost. Come Radha. Get a Job. Come here. Now start.

কথা বলতে কারু আগ্রহ-ই কম নয়। সকলেই নিজের কথা বলতে চায়। শঙ্কর বললো,—

—আমি চমৎকার প্ল্যান ঠাউরেছিলাম। এরা রাজী হলো না।

—কি প্ল্যান?

—সকলেই ত' কিছু কিছু টাকা পেয়েছিলাম। বললাম, এসো আমরা সব ছেলেরা সব মেয়েদের বিয়ে করে ফেলি। টাকা নিয়ে একসঙ্গে একটা কিছু স্টার্ট দিই। বীণা বললো,—

—বিয়ের কথাটা বাজে বলছো। তখন শুধু তুমি কোম্পানী

খোলবার তালে ছিলে। তুমি, মারুতি আর মনোহর সব টাকা-ই ঐ ক'রে গচ্ছা দিলে। আমার কাছ থেকে ধার করে নিলে।

—তার কারণ কি ?

ব'লে শঙ্কর বিশাল দেহ নিয়ে কষ্ট করে দাঁড়ালো। বললো,—

—তার কারণ হচ্ছে, তুমি গ্র্যাজুয়েট। চট্ করে চাকরী পেলে ব্যাঙ্গালোরে। আমাদের ওপর তোমার সহানুভূতি হওয়া উচিত ছিলো। বীণা বললো,—

—বুঝলে সাধনদা', তিন মূর্তি গিয়ে আমার ব্যাঙ্গালোরের বাড়ীতে উপস্থিত ! সে কি কাণ্ড ! ভাগ্যে সেই সময়ই রাধার চিঠি পেলাম। নইলে কি যে করতাম !

রাধা বলে,—

—ঘুরে ঘুরে এদের খোঁজ করতে কি কম সময় গিয়েছে ?

—কি করে কি করেছো রাধা ? আমি তো বিশ্বাসই করতে পারছি না। এক একবার মনে হচ্ছে এ স্বপ্ন।

—আর স্বপ্ন নেই সাধন। কাজের মধ্যে এনে ফেলেছি তোমায় !

ঘড়িতে আটটা বাজে দেখে উঠে পড়ে রাধা। সাধনকে নিয়ে আসে তার ঘরে। প্রসাদ খুব ভক্তিভরে সাধনকে সেবাযত্ন করে। বিছানায় সাধনকে শুইয়ে দেয় রাধা। বলে,—

—ঘুমোও সাধন। তোমার অনেক ঘুমের দরকার। কাল থেকে কাজ করতে হবে।

রাধা চলে গেলে পরে প্রসাদ বসে সাধনের পায়ের কাছে। পা মুড়ে বসে আস্তে আস্তে পা দাবিয়ে দেয়। বলে—নিদ্ যাইয়ে সাধনদাদা, কুছ্ না শোচিয়ে—এইটুকু ছেলে-ও চিন্তা করতে বারণ করে তাকে ? হাসে সাধন। এ-ই না কি তার কেউ-ই ছিল না ! এখন দেখ, তার কত শুভানুধ্যায়ী। তাকে এই ছোট্ট ছেলেটা-ও সান্ত্বনা দিচ্ছে। বলছে চিন্তা কোরনা।

প্রসাদ একমনে পা দাবাচ্ছে। সামনের চুলগুলো তার ঝোঁকের তালে সামনে এসে পড়ছে। টেবিল ল্যাম্পের লালচে আলো তার কালো চোখ দুটির তারায় নাচছে। সাধন বলে—

—তোর দেশ কোথায় প্রসাদ ?

—গাড়োয়াল।

—কতদিন এসেছিস্ এখানে ?

—তিনবছর।

—একটা কাজ করবি প্রসাদ ?

—হুকুম করুন।

—রাধাকে ডেকে আনবি একবার ?

—নিশ্চয়।

প্রায় লাফিয়ে বিছানা থেকে নেমে ছুটে চলে যায় প্রসাদ।

বাইরেটা আঁধার। শুকনো পাতা মাড়িয়ে আসছে রাধা। কেমন নিশ্চিন্ত গলায় গান গাইছে রাধা। এই সুরটা কি সে জানে ? নইলে মনে কেন বাজ্ছে ? মনে হচ্ছে চিনি চিনি ? ঘরে ঢুকে রাধা শেষ চরণটি গায়—

—কে বলে দয়াল কৃষ্ণ, ভকতবৎসল !

বলে,—

—মনে পড়ে সাধন ?

মনে পড়েছে সাধনের। প্রতি সন্ধ্যায় আরতি শেষে কণ্ঠমণি গাইতেন এই গান। ভক্তিভরে চোখ বুঁজে গাইতেন,—

—'যদি প্রকৃত দয়াল হওহে প্রভু,—

মরণে দিও হে দেখা !'

—কেন ডেকেছ সাধন ?

উঠে আধশোয়া হয়ে বসে সাধন। বলে—

—ঘুম আসছে না রাধা। কথা কইতে ডাকলাম।

হেসে পাশে বসে রাধা। দুজনে দুজনকে দেখে। হাসে না

রাধা। মিষ্টি একটু হাসি তবু ঠোঁটে লেগে থাকে এই যা! সাধনের দৃষ্টিতে বিস্ময়। সেই রাধা, অথচ এতো বদলে গেছে। দেখে সাধন, আর একটু ভুরু কুঁচকোয়। যেন মাথার মধ্যে নিতে চেষ্টা করে। চেহারাতে কি খুব বদল হয়েছে রাধার? না তো! সেই চেহারা আরো কমনীয় হয়েছে। পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের মেয়ে হয়ে-ও বাংলাদেশে ত' থাকেনি রাধা। তবু এমন সুন্দর সুডৌল কমনীয়তা বুঝি বাঙালী মেয়ে ছাড়া আর কারু চেহারায় ফোটে না। তখন রাধা ছিলো ছিপ্‌ছিপে। তার যৌবন ছিলো সন্ধিক্ষণে। এখন সমস্তটাই বেশ জারিয়েছে। নিজের মনে কোনো একটা পরিণতিতে এসেছে রাধা। আমি কি? আমি কি চাই? এই প্রশ্ন মানুষের চিরন্তন। কি চায় মানুষ, তা-ও বোঝা যায়না সহজে। আবার বুঝলে-ও আকাঙ্ক্ষার স্বর্গে পৌঁছনোর শ্রম সকলে স্বীকার করতে পারে না। এ স্বর্গ-ও এই ধুলোমাটির পৃথিবীতে-ই রয়েছে। সকলের-ই হাতের নাগালে রয়েছে। চাই শুধু মনের ভেতরে একটা জিজ্ঞাসার তাগিদ। যে জিজ্ঞাসা, সর্বদা মানুষকে এগিয়ে চলতে, ও সার্থকতা খুঁজতে উদ্বুদ্ধ করে। যে জিজ্ঞাসা বারবার বলায়—

—"যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্?"

অথবা

"এহ বাহ্য, আগে কহো আর।"

এই আত্মজিজ্ঞাসা সুগভীর হলে মানুষ তখন শুধু নিজের সম্বন্ধে নয়, সমস্ত মানুষের জন্যে সুমহান্ কোনো পরিণতির পন্থা খোঁজে। সে সব মানুষ প্রাতঃস্মরণীয়। তাদের পন্থা-ও হয় বিভিন্ন। কেউ বেরোয় ভিক্ষাপাত্র হাতে, কেউ শাস্ত্র পঠনপাঠন পরিহার করে ভক্তির পথ ধরে, কেউ জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করে, কেউ করে সমাজ সংস্কার।

শিল্পীর বোঝা-পড়াটা নিজের সঙ্গে। কি চাই, তার পক্ষে নির্দিষ্ট করে বলা সব সময় সম্ভব নয়।

রাধাকে দেখে সাধনের মনে হলো, যা চায় তা সে জানতো। এবং এই পথে-ই সে সার্থকতার আশ্বাস পেয়েছে। অন্তর্বিরোধের জটিল পন্থা থেকে সে মুক্তি পেয়েছে। তাই তার মধ্যে একটা পরিপূর্ণতার সৌন্দর্য প্রতিভাত হয়েছে।

তারপরে সাধনের স্মরণ হলো। আগে, যখন রাধা তার কথা শুনতো বসে, অথবা নাচতো, তখনই তার মধ্যে একটা তদ্‌গত আত্মময়তা ফুটে উঠতো। বাইরের ও ভেতরের সম্পূর্ণ সত্তাটাকে গুটিয়ে নিতে জানতো সে। যা-ই করুক না কেন, তার মধ্যে যে ডুবে যেতে হয়, তা-ও সে জানতো।

এ-ই ছিল রাধার চারিত্রিক কাঠামো। এখন সেই কাঠামোতে খড়, মাটি, রং পড়ে প্রতিমাটি সম্পূর্ণ হয়েছে।

সাধনের কপালের রেখাগুলি পরিষ্কার হলো। যেন সে জবাব পেলো তার প্রশ্নের। সংশয়ের নিরসনে নিশ্চিন্ত হয়ে হাসলো সাধন।

আগ্রহের সঙ্গে তাকে দেখছিলো রাধা। স্বল্প হাসির জবাব দিলো সে-ও। সাধন বললো—

—কথা বলো রাধা। ঘুম আসতে চাইছে না। বলো কি ক'রে কি করলে? তোমার বাবা কতদিন মারা গেছেন রাধা?

—বাবা ব্যবসা করতেন ইস্ট আফ্রিকায়। শরীর খারাপ হ'তে তাঁর পার্টনারকে বেচে দিলেন শেয়ার। চলে এলেন এখানে। তুমি আসবার পরে আমি-ও আশ্রম ছেড়ে আসতে চাইছিলাম। চলে এলাম। কণ্ঠমণি বড় দুঃখ পেয়েছিলেন। বাবার সঙ্গে আমার দেখাশোনা এত কম হয়েছে। বোর্ডিংয়ে-ই কেটেছে জীবনের অনেক বছর। দেশ ছেড়ে এসেছিলেন অল্প বয়সে। বাবাকে নিয়ে এখানে ওখানে ঘুরতাম। রাখতে পারলাম না। লিউকোমিয়ায় মারা গেলেন।

—তারপর?

—সেই তুমি যখন চলে এলে সাধন, মনে আছে ?

—মনে আছে।

—সম্মানে ঘা লেগেছিল। ঠিক করেছিলাম, যেমন করে পারি নিজেকে গড়ে তুলব। কণ্ঠমণি কিন্তু তোমার কথা বারবার বলতেন, জানো ?

—কি বলতেন ?

—বলতেন, সে তার নিজের মতো বাঁচবে; তুমি তোমার নিজের পথ সন্ধান কর না কেন ? বলতেন, অন্যের ওপর ভর করে বাঁচতে চাও কেন ? তুমি নিজে একটা সম্পুর্ণ স্বাধীন মানুষ হও। এমনি সব কত কথা।

—তারপর ?

—দেখলাম আমার নিজের অপূর্ণতা অনেক। আমি কিছুই জানি না। ভরতনাট্যম্ শেখবার বাসনা হলো। গেলাম দক্ষিণে চিদম্বরমের কাছে। ততদিন মুথুস্বামী মারা গিয়েছেন। চিদম্বরম বললেন বৃন্দা কৌশিকের নাম। তার মতো কুশলী শিল্পী না কি মুথুস্বামী কমই পেয়েছেন। তাঁর কাছে-ই শিখতে সুরু করলাম আমি। তিনবছর রইলাম সেখানে। তাঁর ছাড়পত্র পেয়ে তবে এলাম তোমার খোঁজে। আঙ্গিক-ই জানি না, কি পরীক্ষা নিরীক্ষা করবো বল ? পরিহার করে যে নতুন আঙ্গিকের সন্ধান করবো, তার জন্যে তো পুরনো আঙ্গিকটা জানা চাই।

—ওটা ভুল কথা রাধা। পরিহার তুমি করতে পারো না। সংমিশ্রণ করতে পারো। একের সঙ্গে আর মেশাতে পারো। তবে পুরনো বলে পরিহার করবার কথাটা ভুল।

—জানি সাধন। সে বুঝতে-ও আমার সময় লেগেছিল।

—তারপর ?

—তারপর তোমার কলাতীর্থম্ গড়ার কথা জানলাম। তোমার কথা-ই আগে মনে হলো। তারপর মুখে মুখে কলাতীর্থম্ ভাঙার

কথা, আরো হাজারটা সত্যি মিথ্যে জড়ানো প্রবাদ শুনলাম। খোঁজ করে বৃন্দার কাছে গেলাম। বৃন্দার সঙ্গে কি কথা হলো না হলো, সে ত' তোমাকে ট্রেনে-ই বলেছি সাধন।

—তোমার এতো কথার কোনটা-ই আমি শুনলাম না রাধা। আমি শুধু একটা কথা মনে ক'রে এসেছি।

—কি কথা?

—ঐ যে তুমি সীতমপুরে আমাকে বললে, তুমি যদি না আসো সাধন তবু ট্রুপ আমি করবোই—সে মনের জোর আমার আছে। ঐ কথাটা-ই ভরসার।

—ভরসা মানে? সে কথাটা আমার মনের কথা।

—ঐ মনের কথাটাই ভরসা।

—তবু ভাগ্য আমার যে মনের কথাটাকে আজ মর্যাদা দিলে। একদিন তো শোনই-নি, সাধন!

—সে কথাটির চেয়ে আজকের কথাটি কতো সুন্দর বলো ত'? সেদিন নিশ্চয় আমার ওপর খুব রাগ করেছিলে, রাধা। তবু বলো, সেদিন যদি ঘটনা অন্যরকম হতো, তাহ'লে কি ভালো হতো?

—ভালো হতো কি মন্দ হতো সে কথা জানিনা সাধন। সে অন্য সাধন আর রাধাকে নিয়ে অন্যরকম কাহিনী হতো। আমি তুমি তার কি বিচার করবো? আর তোমারই বা এ অহংকার কেন সাধন? আজকের আমাকে দেখে নিজের সেদিনের ব্যবহারকে মস্তো একটা কৃতিত্ব মনে করছো?

রাধার কথায় কোনো দংশন নেই। তবু সাধনের মনে হয় সেই অনেকদিন আগেকার ঘটনার জন্যে আজকে এই কথাটুকু শোনাল রাধা। বলে,—

—তুমিও আর সে-ই মানুষ নেই, আমিও বদলে গিয়েছি অনেক। সে সব কথা থাক।

—আমি কি খুব বদলিয়েছি? মনে ত' হয় না।

কি বলতে চায় রাধা ? এই যে এখন বসেছে, কালোপেড়ে সবুজ রঙের একখানা তাঁতের কাপড় পরে, এক হাঁটু চিবুকের কাছে তুলে, অন্য পা-টি মুড়ে। গলায় সোনার সরু হার চিকচিক করছে, চুলের বেণীতে যেন ঢল নেমেছে। কেমন সুন্দর দেখতে। দুনিয়ার সব কিছুর সঙ্গেই যেন এর মিতালী পাতা আছে। মনের আনন্দটি এর সমস্ত ভঙ্গীতে সঞ্চারিত। একেই সে অনেক আগে জানতো না কি ? এত তারুণ্য, এত সৌন্দর্য যে মানুষটি অনায়াসে বহন করছে দেহে মনে, তাকে দেখে সাধনের একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো। বললো,—

—বড় ক্ষয় হয়ে গেছে রাধা—শরীরটা জখম হয়ে গেল।

ভ্রূকুটি করলো রাধা। বললো,—

—তুমি বড় একই কথা বলতে পার সাধন। এই কথা শুনতে আর বলতে এলাম না কি ? আজ ঘুমোও। কাল শুনব বাকি কথা। কাল থেকে কাজ সুরু।

উঠে পড়লো রাধা। সাধনের গায়ে চাদর ঢাকা দিলো। জল খেতে দিলো। বললে

—ঘর পছন্দ হয়েছে সাধন ?

সকৃতজ্ঞ হাসিতে স্বীকৃতি জানাল সাধন।

রাধা চলে গেলে পর বালিশে মুখ গুঁজে ভাবতে লাগলো সাধন, হঠাৎ সে প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। তার দিন, রাত, ঘণ্টা, প্রহর সবই মূল্যহীন হয়ে গিয়েছিলো, আবার তাদের দাম হয়েছে। মনে মনে বলল সে, রাধার কাছে ঋণী হলো সে। তার সময়-গুলোকে দামী করলো রাধা। এ ঋণের শোধ তাকে করতেই হবে।

এ কথা সে আর একজনকেও বলেছিলো। আজ বললো অপর একজনকে। দুজনেই সত্যি তার জীবনে। অতীত আর বর্তমান। বর্তমানের দাবী অনেক বড়ো।

১৭

শুভদিনে নামকরণ হলো 'নিউ ট্রুপ'। কাউকে না জানিয়ে রাধা মহালক্ষ্মী মন্দিরে নারকেল ও মিষ্টান্ন দিয়ে পুজো দিয়ে এলো। বিদেশে এসে-ও তার মা পুজোপাটের চর্চা রেখেছিলেন। এ ভক্তিটুকু আছে রাধার মনে মনে। কতোটা ভক্তি আর কতোটা তার মায়ের প্রতি ভালোবাসা, তা কখনো বিচার করে দেখেনি রাধা। একটা শুভকাজ যখন, তখন না হয় একটু তুষ্ট করলাম-ই দেবতাকে, এই কথা হেসে হেসে বলে বাবাকে খুসী করতো রাধা। বাবা মা'র কথা মনে ক'রে রাধা তাঁদের আশীর্বাদ চাইলো। আজ তার জীবনের মস্তো শুভদিন।

ট্রুপের মধ্যে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হলো।

বিষয় নির্বাচন নিয়ে জোর তুফান উঠলো। মালাবার, ধনুষ্কোটি, অন্ধ্র, রত্নগিরি, সাতারা, রাজকোট, সুরাট, বরোদা, জালন্ধর, লুধিয়ানা, কুমিল্লা, চট্টল নানা জায়গা থেকে এসেছে ছেলেমেয়েরা। নিজের দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে যার যেটুকু পরিচয় আছে তারই ওপর নির্ভর করে আলোচনা চলে। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দেওয়াতে রেড্ডির উৎসাহ বরাবরই প্রচুর। কেটলী কেটলী চা এবং প্যাকেট প্যাকেট বিড়ি খরচ না হলে নাকি তার ভালো লাগে না। মনেই হয় না এটা শিল্পীদের মিটিং।

এত গোলমালের মধ্যে সাধনকে থাকতে দেয় না রাধা। সাধনের ঘরে ব'সে দুজনে আলোচনা করে। বইপত্র দেখবার দরকার আছে না কি? এ কথা শুনে অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে সাধন। বলে,—

—রাধা, আমার তোমার এই শো দেখবে সাধারণ মানুষ। এমন জিনিষ নেবো রাধা, যাতে তাদের জীবনের ছায়া পড়ে। তারা যেন মনের দিক থেকে একটা সাড়া পায়। পুঁথি আর শাস্ত্র ঘাঁটতে আমার আপত্তি নেই। তবু মনে হয় পুরনো কথাকাহিনীকে আমাদের নতুন ছাঁচে ঢালতে হবে। বক্তব্য একটা ফোটাতে হবে। না কি বলো রাধা ?

রাধা মাথা নাড়ে। সাধন বলে,—

—বিষয়বস্তুর জন্যে আমি ভাবিনা রাধা। আমার ভাবনা আঙ্গিক নিয়ে। পরীক্ষা-নিরীক্ষার এত বড়ো সুযোগ রয়েছে ছেড়ে দেবো ?

—ভরতনাট্যমের মাধ্যম খারাপ হবে ?

—সে কি কথা রাধা। তা নয়। তবু আমি একটা নিজের ভাষা খুঁজছি রাধা। আমি আমার কথা আমার নিজের ভাষাতে-ই বলতে চাই।

অস্বস্তি সুরু হলো মনে। আমি মানুষটা এই রকম। আমার ধ্যান ধারণা অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি আমি-ই। আমি নৃত্যশিল্পী। এদিকে আমার দেহ অক্ষম। নাচার কথা দূরে থাক, আমি নিচু হতে অবধি পারিনা। আমার পিঠে হাড় নেই পাঁচটা। একটা ফুসফুস বন্ধ। আমার পক্ষে নাচা দুরাশা। সে স্বপ্নকথা।

তবু নৃত্য ছাড়া আমার মুক্তি কোথায় ? নিজে আমি নাচতে পারব না। তবু আঙ্গিক সৃজন করতে চাই। তৈরি করতে চাই এক নতুন ও নিজস্ব নৃত্যধারা।

অনেক ভাবে সাধন। দিনরাত। আকাশপাতাল। রাধাকে সমানে ফরমাস করে। বলে,—

—মণিপুরী নাচের চতুর্থ চালটি দেখাও ত' ?

—মুদ্রায় দুঃখ ও অনুশোচনা কেমন করে প্রকাশ করবে ?

—বাংলাদেশের মেয়ে চাষী ঝি বৌ দেখনি ? তেমনি করে

এসো ত', রাধা। মাথায় যেন বোঝা রয়েছে, তাই ঝুঁকে রয়েছো, এমনি ভাবে এসো।

সাধন যা বলে, তাই পায়ে তোলে রাধা। রাধাকে নৃত্যপর দেখে মুগ্ধ সাধন। ছন্দটা একনিমেষেই কেমন বশ করে ফেলে রাধাকে। কি সুন্দর তার পদক্ষেপ! কি ললিত ব্যঞ্জনা তার প্রতিটি ভঙ্গীতে! শ্যাম দেখে মুগ্ধ হয়। বলে,—

—সাধন দাদা হে, বড় খাঁটিসোনা এই রাধা দিদি। উঁচু দরের আর্টিস্ট!

এক এক সময় সাধন নিজেই দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। তার নিজের-ই মনে থাকেনা, কখন কি বলেছিল। চেঁচিয়ে বলে—

—কেন ভুলে গেলে? সেই যে বললাম! —এতটুকু চটেনা রাধা। ধীরে ধীরে, অভিনিবেশ সহকারে মনে করবার চেষ্টা করে।

মাঝে মাঝে সাধনকে বকতে আসে বীণা। বলে,—

—তুমি কি চেঁচিয়ে মরবে সাধনদাদা? তোমার চীৎকার যে আমরা ও বাড়ী থেকেই শুনতে পাচ্ছি। কি হচ্ছে কি? তুমি স্নান করবে না, খাবে না? —তখন ভারী আশ্চর্য হয়ে যায় সাধন। বলে,—

—আমি কি জোরে কথা বলছি? কই, রাধা—তুমি ত' আমাকে কিছু বলোনি। তা ছাড়া আমার খাবার সময় হয়ে গিয়েছে? সেই জন্যেই অনেকক্ষণ থেকে আমার ক্ষিদে পেয়েছে। —প্রসাদ! ছুটি পেয়ে চলে যায় রাধা। বীণা তাকে বলে,—

—জয়পুরেও আমি ছাড়া কেউ ওকে মানাতে পারতো না এক-এক সময়। ওর যদি নিজের সম্বন্ধে জ্ঞান-ই থাকবে, তাহ'লে কখনো এত বড়ো অসুখটা করে?

ট্রুপের পঁচিশজনের সঙ্গে রাধা নিজের কোনো তফাৎ করেনি। শুধু সাধনের বিষয়ে সমস্ত নিয়ম আলাদা। রান্নাঘরের একপ্রান্তে রাধার মা'র জন্য আলাদা একটু জায়গা আছে। রাধা কখনো কখনো

আবদার করতো তাঁর কাছে। রাধার বাবা-ও বলতেন—সব যে ভুলে গেলে বিদেশে এসে। তখন এখানে বসে তিনি যত্ন ক'রে রান্নাবান্না করতেন এক একদিন। মিসেস গাঙ্গুলীর হাতের বাংলা রান্না খাওয়ার ফরমাস এক একদিন রাধার বাবার ব্যবসার পার্টনার বা বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে-ও আসতো।

মা-কে রাধা ইচ্ছেমতো কাছে পায়নি। হার্টের অসুখে ভুগে মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে মারা যান তিনি। তারপর-ই রাধার জীবনটা কেমন যেন হয়ে গেল। সে গেল বোর্ডিঙে। বাবা ব্যবসার জন্যে ইস্ট আফ্রিকা আর আরব হতে আসা যাওয়া করতে লাগলেন। রাধাকে কাছ ছাড়া করতে ইচ্ছে ছিল না তাঁর। কিশোরী রাধাকে দেখে তাঁর মনে হতো, এই রকম বয়সে রাধার মা বৌ হয়ে এসেছিলেন তাঁদের বাড়ীতে। অমনই লক্ষ্মীর মতো চেহারা। অমনই স্নেহকোমল স্বভাব। বছরে দুইবার দেখা হতো বাবা আর মেয়ের। রাধা তখন মায়ের শাড়ী প'রে গিন্নীপনা করে বেড়াতো। বাবাকে বলতো,—

—তুমি-ও কাজ ছেড়ে দাও বাবা, আমি-ও বোর্ডিং থেকে চলে আসি।

—হবে, হবে রে, নিশ্চয় হবে।

সে সময় আর হলো না। একেবারে ব্যবসাবাণিজ্য গুটিয়ে আসতে হলো অসুস্থতার জন্যে। বাবাকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করলো রাধা। কিন্তু কিছুতে-ই কিছু হলো না। অসুখের কাছে হার মানছেন বলে বিদ্রোহী হয়ে উঠতেন গাঙ্গুলী সাহেব। প্রতি-বন্ধকতার বিরুদ্ধে লড়বার নেশাতে একদিন তিনি মস্তো জুয়া খেলেছিলেন। দেশঘর ছেড়ে তরুণী স্ত্রী-কে নিয়ে বোম্বাই এসেছিলেন ব্যবসা করতে। বাঙালীর সাহস কম? বাঙালী লড়তে পারে না? গামছা পেতে থান ইঁট মাথায় দিয়ে ফুটপাথে শুয়ে আর চানা জল চিবিয়ে ভাগ্যকে জয় করবার নজীর শুধু অন্যত্র

মেলে? এ সব অপবাদ। এ-ই অপবাদ খণ্ডন করলেন তিনি জীবনভোর লড়ে। প্রথম চোট খেলেন স্ত্রীর মৃত্যুতে। স্ত্রী ছিলেন তাঁর কাছে বন্ধু, মিত্র, সহায়। আঠারো বছর বিবাহিত জীবনে আঠারো দিন-ও বিচ্ছেদ সয়নি তাঁর। দুর্ভাগ্যক্রমে রাধার মা'কে ধরলো দুরারোগ্য এ্যাঞ্জিনা-তে। বুড়ো পার্শী ডাক্তার পেরেইরা সায়েব কার্ডিওগ্রাফের ছবিখানা দেখে এতটুকু ভরসা দিতে পারলেন না গাঙ্গুলী-কে। ঈষৎ দীর্ঘ একহারা মানুষ ছিলেন রাধার মা। মনে তাঁর আশ্চর্য জোর ছিলো। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও এতটুকু ভয় পাননি তিনি।

তিনি যেখানে গিয়েছেন, সেখানে যেতে রাধার বাবার এতটুকু আপত্তি ছিলো না। দুশ্চিন্তা ছিলো মেয়ের জন্যে। বিয়ে করলো না। নাচ শেখবার দিকে ঝুঁকলো। মৃত্যুর পদক্ষেপ নিয়ত আসন্ন হচ্ছে জেনে, সে-ও তাঁর মনে হতো একটা অবিচার। জীবনে কি কি প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়েছেন, মেয়েকে বলতেন। বলতেন,—

—বুঝলি খুকি, ডারবানে তখন সে কি কম্পিটিশান! একে আমি ভারতীয়, তাতে নিজেদের মধ্যেই রেষারেষি। মগনদাস ডিনারে ডাকলে। তা আমার পার্টনার বললে, গাঙ্গুলী, ওখানে যেয়ো না। আমি বললুম আমার প্রেস্টিজ আমার ওপর নির্ভর করছে দেশাই। আমি কাপুরুষ নই। সেই ডিনারে-ই ত' ড্রিঙ্ক ক'রে মারামারি হলো। আমার এই হাতটা—জানিস-ই তো?

—জানি বাবা।

—কি জানিস, তোর মা কোনদিন কোনো দোষ দেয়নি। মনটা খুব বড়ো ছিল, জানলি? নইলে তাকে আমি যে সব অবস্থায় ফেলেছি—!

অনেক প্রতিকূল অবস্থায় লড়াইটা তিনি বুঝতেন। মৃত্যু মানেই পরাজয়। সেটা ঠিক বুঝলেন না। ইদানীং একটু পরলোক-চর্চার ঝোঁক হয়েছিল। বন্ধুবান্ধবদের বলতেন,—

—যদি তোমরা কথা দিতে পার, তাকে আমি দেখতে পাব তবে আর আমার কোন ভয় নেই। কথা দিতে পার না?

রাধা শুধু বলতো,—বাবা, চিন্তা কোর না। ও-সব বাজে কথা ভেবো না।

রাধাকে বলে গেলেন,—

—খুকি, মস্ত আফশোষ যে তুই আমার ছেলে নোস। তবু ভাবনা করি না। তুই আমার মেয়ে। সাহসের সঙ্গে বাঁচবি। ভয় পাস না। টাকা পয়সা যা রেখে গেলাম তোর বেশ চলে যাবে। একটা ভালো ছেলেকে বিয়ে করিস খুকি। আমার ভালো লাগবে। ভালোভাবে বাঁচবি। একলা পড়ে গেলি একেবারে। সাহসের দরকার হবে। ভয় পাস না।

বাবার দুর্দম সাহস, সংগ্রাম করবার ক্ষমতা, আর মায়ের মনের জোর, অন্তর্মুখী গভীরতা, সহনশীলতা দুই-ই সমৃদ্ধ করেছে রাধার চরিত্রকে। এই উত্তরাধিকার না থাকলে তার কি হতো কে জানে। রাধার রুচিটা বড় ভালো। প্রচারবিমুখ মন তার। কি পোশাকে, কি ব্যবহারে খুব হৈ হৈ করতে সে নারাজ। মর্যাদার মানটা খুব উঁচু তার কাছে। খেলো বা সস্তা কিছু সে দেখতে পারে না।

মা'র কথা মনে পড়ে রাধার, যখন এইখানে বসে সাধনের জন্যে স্টোভে খাবার বানায় বা তত্ত্বাবধান করে। মনে পড়ে সেই স্বচ্ছ জ্যোৎস্নার মতো পাণ্ডুর গৌর মুখখানা ঘিরে পড়েছে দেশী শাড়ীর কালোপাড়। এইখানে চৌকি পেতে বসেছেন তার বাবা। মা স্টোভে রান্না করছেন। রাধা লুচি বেলে দিচ্ছে, তরকারী কুটে দিচ্ছে। চাকর দাসীদের সরিয়ে দিয়েছে জোর ক'রে। খুব ভালো লাগছে তার। মনে হচ্ছে তারা তিনজন যেন পিকনিক করছে। মা'র চেহারা ছিল কোমল, ক্ষীণ। তবু রাধা জানে কত শক্তি রাখতেন তিনি মনে।

সাধনের জন্যে থালায় খাবার সাজিয়ে কাপড় ঢেকে নিয়ে যায় রাধা। বাইরে থেকে অনেক রান্নার স্বাদ-ই ভুলেছে সাধন। দেখে অবাক হয়ে যায়। বলে,—

—বা রে রাধা, কোথায় শিখলে এ সব রান্না? সেই দেশ ছেড়েছি, তার পরে আর খাইনি জানো?

একটু একটু হাসে রাধা। বলে,—

—মা'র কাছে শিখেছি। দেশের কথাই শুনেছি শুধু। দেখিনি ত'!

সাধন বলে,—

—দেশ বড় ভালো, জানো রাধা? আমার দেশ যে কি সুন্দর, তা বলতে পারি না।

যে মানুষ এতদিন দেশঘর ছেড়ে আছে তার মুখে এই কথা শুনে অবাক হয় রাধা। বলে,—

—দেশে ত' বহুদিন যাওনি সাধন!

আবার একটু অবাক হয়ে থাকে সাধন। ভাবে। দেশে যাদের ফেলে এসেছিলো তাদের জন্যে মনে খুব মমতাবোধ হয় সহসা। সত্যি-ই ত'! বলে,—

—ভুল হয়ে গিয়েছে রাধা। একবার যেতে হবে।

—এখন বিশ্রাম করো সাধন।

রাধা চলে গেলে পরে অনুগত লক্ষ্মণটির মতো প্রসাদ বসে পায়ের কাছে। পা টিপে দেয়। ভালো ক'রে পা টিপে সে রাধাদিদির বাবাকে খুশী করেছিলো। তার ধারণা এই এক গুণের জন্যেই তার চাকরী রয়েছে আজও। সাধনকে খুশী রাখা খুবই দরকার তার। বেশী কথা জানে না প্রসাদ। শুধু বলে,—

—সাধন দাদা, নিদ্ যাইয়ে। কুছ্ না শোচিয়ে।

সাধন বলে,—

—প্রসাদ রে! তুই বুঝবি না। এ বড় জ্বালা।

প্রসাদ হাসে। বলে,—

—কুছ্ না শোচিয়ে সাধন দাদা।

প্রসাদের কথাতেই কি চিন্তার নিরসন হয়? বড় অস্বস্তি সাধনের। কি যে করে, শুধু সেই চিন্তা করে। এত কিছু শেখবার জানবার আছে, যার কিছুই জানে না সাধন। তার অধীত বিদ্যা সামান্য। আঙ্গিকের কি শেষ আছে এ দেশে? মণিপুরী, কথাকলি বা ভরতনাট্যম্ ত' হলো মোটা দাগের ভাগ। তা ছাড়া এই বৃহৎ দেশের নানা জাতি উপজাতির মধ্যে নিজের নিজের ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাব রীতি অনুযায়ী কত আঙ্গিকের নাচ-ই রয়েছে—এমন কোন্ শিল্পী আছে যার এই সবটুকু সম্বন্ধে বিশদ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা আছে? তা কখনো হয়? যদি না ঘুরতো, না দেখতো, না জানতো সাধন, তা হ'লে মনে করতো সে যা জেনেছে তা-ই যথেষ্ট। কিন্তু নিজের গণ্ডি ছাড়িয়ে বাইরে এসে সামান্যতম অভিজ্ঞতা থেকেই বুঝলো তার অজ্ঞানতার শেষ নেই। তা' সমুদ্রপ্রমাণ। তাতে তার দুঃখ নেই। কি কি হয়ে গিয়েছে তা-ই মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে না কোন শিল্পী। শিল্পী সৃজন করতে চাইবে-ই। জ্ঞাত আর অজ্ঞাত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অবকাশ কোনদিন শেষ হবে না।

শিল্পী সৃজন করবে নিজের আনন্দে।

কার সৃষ্টি হলো হীরে পান্না, আর কার সৃষ্টি হলো মাটির ঢেলা সে বিচার-ও অবান্তর। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনের দাম আছে। প্রতিটি মানুষের সামান্যতম প্রচেষ্টার মূল্যায়ন যদি কোথাও হয়ে থাকে, সেখানে সমস্ত সার্থক এবং অসার্থক প্রচেষ্টা একই মালায় গাঁথা হবে।

এত কথা যে সাধন ভাবলো, তা নয়। সে শুধু ভাবলো নিজের কথা। সে কি জানেনা তার নিজের ক্ষমতা কত সীমাবদ্ধ? তার

শরীরের কথা কি সে জানেনা? সব জানে সাধন। জানে এই শরীর নিয়ে সক্রিয় হয়ে ওঠা মানে মৃত্যুকে এগিয়ে আনা।

এতো কথা সে নতুন জানেনি। সবই জানতো সাধন। জেনে-শুনে-ই এসেছে রাধার সঙ্গে। রাধার প্রস্তাবে যখনই সে রাজী হলো, তখনই সে নিজের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলো। তবু এলো। কেননা অন্য উপায় ছিলো না সাধনের।

এ সব কথা ত' কারুকে বলতে পারে না সাধন। নিজের সঙ্গে মুকাবিলা করতে পারে বারবার।

কিছু একটা তাকে করতেই হবে। নৃত্যশিল্পী সাধন। একবার লড়তে নেমে তবে সে নিজেকে জানলো। একটা কিছু করবার আকাঙ্ক্ষাটা তার জাগলো তারপর। এক একজন এক এক ঢঙে বাঁচে। খেয়ে পরে বিছানায় শুয়ে সুখী জীবন কাটাতে হলে সাধন মরে যাবে। তার বাঁচবার ধারণা-ই অন্যরকম। নিজেকে সে প্রকাশ করতে চায় নৃত্যছন্দে, অঙ্গের ব্যঞ্জনায়। অন্য কোনো ভাষা ত' সে জানে না। কলাতীর্থমে বৃন্দা তাকে যে সুযোগ দিলো, তাতে-ই সে নিজেকে জানলো।

শরীরটা জখম হয়ে যখন পড়ে ছিলো স্যানাটোরিয়ামে, বহুবার কি তার মনে হয়নি, এর চেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো? আবার মৃত্যুর সঙ্গে নিয়ত বাস ক'রে তবে সে বুঝলো কত অর্থহীন সে কথা। মৃত্যুর কোন শক্তি নেই। মৃত্যু অর্থহীন। মনটা মরে যায় যদি, দেহের মৃত্যু তার কাছে কিছু নয়।

জীবনবোধ এবং মূল্যায়নের এই জটিল প্রক্রিয়াকে কখনো, কোনদিন অস্বীকার করেনি সাধন। তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ সে উপনীত হলো সিদ্ধান্তে। তার পক্ষে সে সিদ্ধান্ত-ই চূড়ান্ত। কেননা নিজের বা পরের সম্পর্কে কোন মোহ নেই সাধনের। নিজের ক্ষমতা দিয়ে সে বুঝলো, সে এতটুকু পারবে। দেহ দিয়ে বুঝলো আর বেশীদিন বাঁচবে না। তার মনে হলো, এতদিন সে কিছুই

করেনি। যা করেছে, তা কিছুই নয়। এখনো সে নিজের ভাষা খুঁজে পায়নি। এমন কোনো কিছু সে সৃজন করেনি যা তার একান্ত-ই নিজস্ব। একটা কিছু তাকে করতেই হবে। যা তার নিজস্ব, একান্ত। নইলে তার দায়িত্ব রয়ে যাবে অসমাপ্ত। নিজের কাছে কোন জবাবদিহি-ই সে করতে পারবে না। সে ঈশ্বর জানে না। মৃত্যুর পর কোনো বিরাট শক্তির কাছে গিয়ে সে পরিপূর্ণতা পাবে অন্য কোনো দেহাতীত লোকে, এ কথা সে ঠিক বোঝে না। যা চোখে দেখা যায়, যা বুদ্ধি, জ্ঞান, অনুভূতি দিয়ে মাপা যায়, সে-ই তার স্বর্গ মর্ত্য। এর মধ্যে-ই তাকে যা করবার করতে হবে।

এই বোধ, প্রথমে ছিল একটি ছোট্ট অংকুর। স্যানাটোরিয়ামে, অপারেসানের পর ক্লোরোফর্মের ঘোর কাটতে কাটতে যখন বারবার বমি আসে, তুলোর প্যাডে রক্তের চাপগুলোর আঁষটে গন্ধটা পীড়া দেয়, চারিদিকে বাতাস থাকা সত্ত্বে-ও যখন নিশ্বাস নিতে এতটুকু বাতাস পাওয়া যায় না, এমনি সব সময়ে সাধনের মনের সেই বোধটা অংকুর ছেড়ে পাতা মেলল। পাতা দুটি মেলে দুই পাশে কিছু জায়গা নিল। নিচে চালিয়ে দিল তার শিকড়। সাধনের মনের পরতে পরতে সেই শিকড়টা আঁকড়ে ধরলো। এদিকে ডালপালা মেলে সমস্ত সত্তাটাকে ভরে ফেললো সেই আশ্চর্য বোধটা। গাঢ় সবুজ রোদ-ঝলমলে পাতা, নিচের দিকে ছায়াঘন সবুজ, ওপরের দিকে কচি সবুজ নতুন নতুন পাতা, এর মতোই প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো সেই আশ্চর্য বোধের অংকুর। সাধনের কটেজের সামনে পাইন গাছটা যেমন সত্যি ছিলো, তাকালেই দেখা যেতো, সাধনের মনের এই বোধ তার চেয়ে কিছু মাত্র কম জোরালো, কম জীবন্ত নয়। এতখানি জীবন্ত, যে তার কাছে সাধনের মৃত্যুর সম্ভাবনা মরে গেলো। মৃত্যুকে সরিয়ে দিয়ে এই বোধটাকে জড়িয়ে বেঁচে উঠলো সাধন।

সেই জন্যেই রাধার আমন্ত্রণ সে অগ্রাহ্য করেনি।

রাধার সঙ্গে তার অন্তরের যোগাযোগ আছে। সম্ভবতঃ রাধা

তাকে বোঝে। তাই সাধনের সূক্ষ্মতম ইচ্ছা-ও সে নাচের ছন্দে ফুটিয়ে তুলতে পারে। স্থির হয়ে বুঝতে চেষ্টা করে রাধা। সাধনের অনুক্ত কথা নৃত্যে রূপায়িত করতে কতো তার আগ্রহ।

রাতের পর রাত কাটে জেগে। শুধুই ভাবে সাধন। কি ক'রে, কোন্ আঙ্গিক ধ'রে কেমন ক'রে মনের চিন্তাগুলোকে রূপ দেয়।

অনেক চিন্তা, অনেক কল্পনা তার। রাতের কালো পটভূমিতে বিভ্রম সৃষ্টি ক'রে তারা উড়ে বেড়ায় সাধনকে ঘিরে। সাধন তাদের নাগাল পায় না।

আগে হ'লে এ সব সময়ে অস্থির হয়ে রেগে উঠতো সাধন। ছট্‌ফট্ করতো। এখন তার সে মানস নেই। চুপ ক'রে বালিশে মাথা গুঁজে শুধুই ভাবে সাধন। কখনো পায়চারি করে বেড়ায় রাত ভোর। রাধাকে বলে—

—এ কি হলো রাধা? পারব তো?

—নিশ্চয় পারবে।

—রাতে ঘুম হয়না রাধা।

—তুমি শোও সাধন, আমি তোমার পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। বিব্রত হয়ে ওঠে সাধন। বলে,—

—কোন দরকার নেই রাধা। তুমি যাও। যাও, একলা থাকলেই আমার ভালো লাগবে।

পর্দা খুলে দিয়ে বাতি নিভিয়ে চলে যায় রাধা।

অপরূপ বর্ণ-সমারোহ নিয়ে হাজার হাজার চিত্র সাধনের মাথায় বাসা বেঁধেছিলো। এখন তারা বেরিয়ে এসেছে। সাধনকে উপহাস ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার সামনে দিয়ে আঁধার দৃশ্যপটে। নিরবয়ব, অথচ যেন অবয়ব আছে। সাধন তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নজর করে দেখে তাদের। তারা তাকেই ডাকছে। কৌতুক করে ডেকে আবার হেসে ভেসে কোথায় চলে যাচ্ছে। তাদের জায়গায় আসছে নতুন নতুন সব ছবি। তাদের কৌতুক দেখে অস্থির হয় সাধন।

সে পঙ্গু, সে অক্ষম, তার সাড়া দেবার ক্ষমতা নেই, তাই কি এই কৌতুক? না কি তাদের অন্য বক্তব্য আছে?

কতগুলো ভাব, ভঙ্গী, ব্যঞ্জনা, গতি,—তারা ঝড়ের মুখের কুটোপাতার মতো ওড়ে ঘূর্ণিপাকে। উঠে বসে সাধন।

এ কি স্বপ্ন? অপরূপ কোনো বিভ্রম? অবাক হয়ে দেখে সাধন।

দেশে পুজোর পরে জারি নাচতে এসেছিলো যে সব বলিষ্ঠদেহ কিষাণ—তারা এসেছে দলে দলে। নারকেল তেলে ভেজা চক্‌চকে চুল চেরাসিঁথির দুপাশ দিয়ে নামিয়েছে। মাথায় বেঁধেছে লাল-রুমাল। সড়কীর আগায় ঘুঙুর বাঁধা। তাদের পায়েও ঘুঙুর। সারি বেঁধে তাল ঠুকে দৃপ্ত ভঙ্গীতে নাচছে তারা। নাচতে নাচতে এগিয়ে এসে নাচের ঝোঁকের মাথায় নিচু হয়ে সেলাম করে আবার হাসতে হাসতে পিছিয়ে যাচ্ছে। শরতের রোদে চক্‌চক্ করছে সড়কীর ফলা। গান গাইছে উচ্চকণ্ঠে—

'সপ্তমী অষ্টমী তিথি আনন্দেতে গেল
দুরন্ত নবমী এসে উমা হরে নিল॥'

তাদের কোথায় হটিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল শত শত বাঞ্জারা ও লম্বার্ডি ছেলেমেয়ে। নাচছে তারা লাঠি ঘুরিয়ে। মেয়েদের বলিষ্ঠ ও তামাটে রঙের পায়ের গোছা কেমন সুন্দর দেখাচ্ছে। অনেক জোড়া তামাটে রঙের পা তালে তালে নাচছে। এই সমস্ত কিছুর ভেতর দিয়ে বিচিত্র বর্ণালী ছড়িয়ে এগিয়ে এলো বৃন্দা কৌশিক। ময়ুর যেমন অনায়াস লীলায় উড়ে যায় এ গাছ থেকে ও গাছে, তেমনি ক'রে বৃন্দা আবীর ছড়িয়ে লাল চুণটের ওড়নী উড়িয়ে নেচে গেল। কমনীয় একগাছি মালার মতোই সাদা পোশাকে নাচতে নাচতে এলো একদল মণিপুরী মেয়ে।

সহসা সমস্ত মানসপটখানার চারিদিক থেকে বিচিত্র রূপের অনেকগুলো পুতুল কাঠ-কাঠ ভঙ্গীতে নেচে এগিয়ে এলো। কোটা-

ওয়ারী সম্প্রদায়ের সেই অপরূপ শিল্পসৃষ্টি—পুতুলনাচ। পুতুলগুলো সাধনের সামনে অদ্ভুত কাঠ-কাঠ ভঙ্গীতে এসে নেচে নেচে বলতে লাগলো,—

—আমাদের দেহ নেই, তবু আমরা নাচি বাঁচি, গান গাই। নাচো সাধন, নাচো, নাচো।

উত্তেজিত সাধন উঠে বসলো। অমনি সমস্ত কল্পনা তার কাঠ পুতুল হয়ে নাচতে শুরু করলো,—

—নাচ রহো কাঠ পুতলোঁসে
নাচ রহো কাঠ পুতলোঁসে
কাঠ পুতলোঁসে—কাঠ পুতলোঁসে॥

সেই জারি সারি নাচের মানুষগুলো, মণিপুরী নাচের মেয়েরা, জিপসী ছেলেমেয়েরা সবাই পাগল হয়ে উঠলো। কাঠপুতুলের সঙ্গে তারা-ও কাঠকাঠ ভঙ্গীতে নাচতে শুরু করলো। বহু কাঠ পুতুল, আবার মানুষরা-ও নাচছে কাঠপুতুলের ঢঙে। নাচছে আর সাধনকে হাত তুলে ইশারা জানাচ্ছে।

দেখতে দেখতে চীৎকার করে উঠলো সাধন। ঘর তার নিস্তব্ধ। কেউ নেই। কোনো শব্দ নেই। পায়ের কাছে মেঝেতে পড়ে প্রসাদ ঘুমুচ্ছে। কোন্‌টা সত্যি, আর কোন্‌টা স্বপ্ন?

কোনমতে বিছানা থেকে নেমে দরজাটা খুলে বেরিয়ে এলো সাধন। পুব আকাশের রং ফিকে। ভোরের তারা দপ্‌ দপ্‌ করছে। বাগানের সুঁড়ি পথটার আশেপাশে আঁধার এখনো জমে আছে।

রাধার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো সাধন—রাধা! দরজা খোল।

শাড়ীর আঁচলটা কোনোমতে গায়ে জড়িয়ে দরজা খুললো রাধা—

—কি হয়েছে সাধন?

হাসতে লাগলো সাধন, রাধার দুই কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিতে লাগলো। বললো,—

—পেয়েছি রাধা, পেয়েছি। নাচো নাচো কাঠপুতলোঁসে। নাচো নাচো কাঠপুতলোঁসে। রাধা, ভাবতে পারো হাজার হাজার লাখ লাখ কাঠপুতলী নেচে বেড়াচ্ছে ?

কোনমতে নিজেকে ছাড়ালো রাধা। সাধনকে হুমদাম ক'রে কাঠের সিঁড়ি ধ'রে উঠতে দেখে পেছনে পেছনে উঠে এসেছিলো মোটা রেড্ডি। বললো,—

—Anything wrong রাধা ?

এবার চট্ করে ঘুরে রেড্ডিকে ধরলো সাধন। পুরনো দিনের মতো ক্ষ্যাপামিতে পেয়েছে তাকে। আগেকার মতো-ই রেড্ডিকে জড়িয়ে ধরে চ্যাঁচাতে শুরু করলো সাধন—

—রেড্ডি, রেড্ডি, দি গ্রেট জার্নালিস্ট অফ্ দি ইস্ট! তুমি কি বুঝবে রেড্ডি—দাঁড়িয়ে কথা শুনো না। নাচো নাচো!

আর এক হাতে রাধাকে-ও জড়িয়ে ধরলো সাধন। তারপর তিনজনই হাসতে হাসতে বসে পড়লো রাধার খাটে।

১৮

এমনি ক'রে-ই গড়ে উঠলো সাধনের কাঠপুতলীদল। রাধাকৃষ্ণের জীবন-ই বেছে নিলো সাধন।

তার কৃষ্ণলীলায় কৃষ্ণ একান্তই মাটির মানুষ। বৃন্দাবনের লীলা অভিরামের প্রথম অধ্যায় ব্রজপুরী কর্মসমারোহে মুখর। ধনী ও সম্পন্ন গোপগৃহে গো-পালন, লালন, দোহনের কর্মব্যস্ততা। কৃষ্ণের মা নানান কাজে নিয়ত ব্যস্ত। তারই মধ্যে শিশু কৃষ্ণের কত লীলা। ব্রজরমণীরা এই শিশুকে ঘিরে নিয়ত উৎসবে ব্যাপৃত।

বালক কৃষ্ণ বন্ধুজনের সঙ্গে কৌতুক ক্রীড়ায় বিভোর। দুরন্ত ছেলেকে শাস্তি দিতে গিয়ে হেসে কেঁদে আকুল যশোদা।

বাল্যের সুমধুর লীলা শেষ হতে না হতে কৈশোর।

যমুনার তীরে জল আনতে গিয়ে উন্মনা রাধা। আকুল শরীর তার, ব্যাকুল মন। ভিজেকাঠে আগুন জ্বেলে ধোঁয়ার জ্বালায় কেঁদে মরে রাধা। প্রেম যে এমন, তা'ও সে জানতো না। সখীজন পরিহাস করে,—

—'তুমি জানিতে বাঁধিতে কেশ, যার হাজার টাকা মূল
তুমি জানিতে বান্ধিতে বেণী বিন্ধা সোনার ফুল॥
জল ফেলিয়া জল আনিতে শুনলে শ্যামের বাঁশী
পথ রুধিয়া দাঁড়াতো শ্যাম কুঞ্জবনে আসি॥
বৃন্দাবনে নিন্দা শুনে কানুর উপর রোষে
তুমি কান্দ্‌তে জানতে ভিজা কাষ্ঠে আগুন দিয়া বসে॥
শুধু্‌ জানিতে না রাধা তুমি হায়!
কালিন্দীতে হৃদয় দিলে আর না ফিরান যায়॥'

যৌবনের মধুর দিন। বৃন্দাবনে নিত্য উৎসব—বসন্তে শরতে বর্ষায়।

তারপরে কৃষ্ণের মথুরাগমন। রাধাবিরহের সকরুণ অধ্যায়।

নাট্যশেষ ভাবসম্মিলনে।

রাধা ও কৃষ্ণ, গোপ ও গোপিনী ব্যতীত অনেক চরিত্রের সমাবেশ সাধনের 'কৃষ্ণলীলা'য়। পাখি, হরিণ, গোরু। রাধা ও কৃষ্ণ ছাড়া সকলেরই কাঠপুতলার সজ্জা। অভিনব এই নৃত্যনাট্য শুরু হয় কৃষ্ণ বন্দনা দিয়ে—

'জয় বৃন্দাবনরাজ নন্দনন্দন জয় দেবকীনন্দনম্‌
জয় ভক্তহৃদয় লাঞ্ছন মাধব জয় জয় রুক্মিণীপতিম্‌॥'

ছেলেমেয়েদের যার যতটুকু পুঁজি ছিলো, এনে উজাড় করলো এই কৃষ্ণলীলায়। মহারাষ্ট্রের 'রুসালে মাধব, রুসালী রাধা, রুসালে গোকুল সারে'; রাজস্থানের 'কাঁহি চরাবত গাবইয়া'; যুক্ত প্রদেশের কৃষ্ণলীলা সবই যোজনা হলো কৃষ্ণলীলায়।

বাল্যপর্বে বাংলা থেকে,

'যাবনা গো আর যাবনা ওদের বাড়ী আর যাবনা
ক্ষীর ছানা সর ননী আমি চুরি ক'রে আর খাবনা
কেঁদে কেঁদে ডাকে আমায় তাই ত' আমি খেলাতে যাই
হাতের বাঁধন লাগছে বড়, দুটি পায়ে মিনতি মা'—

আর—

'বড় দুষ্ট হইয়েছে গোপাল, চল্ যশোদায় শোনাব—
ভাঁড় ভেঙ্গে যেমন ননী খেইয়েছে তেমনি কয়েদ খাটাব
হাতে দিব প্রেমের দড়ি পায়ে দিব প্রেমের বেড়ী
বুকে দিব প্রেমের পাষাণ—দুষ্টামি তার ঘুচাব—'

এনে সংযোজন করলো নগেন। কৈশোরে ও যৌবনে বাংলার ও ব্রজভাষার পদ পদাবলী সমৃদ্ধ করলো কৃষ্ণলীলা। যৌবনের অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হলো মণিপুরের রাস কীর্তন।

'কি বা নব রে নবরে
নব নব নব রে—
কালিন্দী পুলিন বনে'—

এই যৌবন বন্দনা গানে এক অধ্যায় শেষ ক'রে আবার পদকর্তাদের প্রসাদ ভরসা ক'রে ভাবসম্মিলন অন্তে রাসনৃত্যে ফিরে এসে কৃষ্ণলীলা সমাপ্তি।

পাঞ্জাবের মাঠঘাট থেকে 'হীর' ও শোহ্নী মহীওয়ালের গান কণ্ঠে ক'রে বয়ে আনল ধেয়ান। পাঞ্জাবের 'হীর'-এর মধুর ও করুণ উদাত্ত সুর-ও সংযোজিত হলো কৃষ্ণলীলায়। বিরহিণী রাধা বর্ষা দেখে, তাল তমাল যমুনা ও মেঘ সবাইকে দেখেই কৃষ্ণের কথা স্মরণ করছেন—এইখানে একটি সুন্দর 'হীর' গাইলো ধেয়ান। বিহারের গ্রাম থেকে এলেন প্রবীণ ঢোলবাজিয়ে অযোধ্যা প্রসাদ।

কৃষ্ণলীলার নাট্যাংশ ঠিক করলো রাধা আর সাধন।

মারুতি চিথলকার হলো বৃন্দার আবিষ্কার। সেই কবে এই

ছেলেটি যখন কিশোর, তাকে মুখুস্বামীর ট্রুপে দেখেছিলো বৃন্দা। কলাতীর্থমে এনেছিলো তাকে। টানা টানা চোখ আর ভুরু, টিকলো নাক, খঞ্জন পাখীর মতো চকিত চঞ্চল চাহনি আর সুন্দর ছিপ্‌ছিপে গড়ন মারুতির। ভরা চব্বিশে দেখতে ভারী সুন্দর হয়েছে সে। সে-ই হলো কৃষ্ণ। সকলে-ই বললো, তাকে কৃষ্ণ হলেই মানাবে। দাঁড়িয়ে লাজুক হেসে মারুতি বললো,—

—সাধনদাদা যা বলেন!

মারুতির মনের ইচ্ছের ওপর ছেড়ে দিলে, শান্তা-কে রাধা হতে হতো। অবশ্য দুই পক্ষের-ই মনের কথা মনে-ই রয়েছে। আর দশজনে দেখে ঠাট্টা তামাসা শুরু করেছে সবে। সবই এখনো অ-জানা, গোপনে।

কথার মধ্যে কথা নেই, শঙ্কর দাঁড়িয়ে চ্যাঁচামেচি ক'রে বললে,—

—শান্তা রাধা সাজলে হবে না। —কে বলেছে শান্তার নাম? অবাক হয়ে সাধন জিজ্ঞাসা করলো। লজ্জায় শান্তা আর মারুতি মাথা নিচু করলো।

শঙ্কর বললো,—

—মারুতির খুবই ইচ্ছে। কিন্তু কি করবো বল মারুতি? তা সম্ভব নয়।

সবাই হাসতে শুরু করলো। লাল হয়ে গেল শান্তা। রেড্ডি শঙ্করকে অবহিত করতে চেষ্টা করলো। স্রেফ ঝেড়ে ফেলে দিলো রেড্ডিকে শঙ্কর। বললো,—

—খাটে শুয়ে দেয়ালে শান্তার নাম লিখছে মারুতি, কি বলছো কি?

সাধন বললো,—

—শঙ্কর, তুমি গোয়ালাদের সর্দার হবে। আর কিছু মানাবে না তোমাকে। রাধা, তুমি তোমার নামে-ই বিরাজ করবে। তুমি-ই হবে রাধিকা।

পায়ে নাচার ক্ষমতা নেই। আঙুলের ভঙ্গীতে নাচ বানায় সাধন। সে যা বলে, রাধা তা-ই ক'রে দেখায়। মনোহর, অমিয়, আর সতীশ-ও ভালো শিল্পী। এই সময় রাধাকে আশ্চর্য সাহায্য করে শঙ্কর। বরাবর-ই ক্ষমতা ছিলো তার। তবে খানিকটা খেয়ালী, খানিকটা পাগলাটে মানুষ শঙ্কর। খুব একটা মন দিতো না। একটু মজলিশ, একটু ফূর্তির পক্ষপাতী শঙ্কর।

সাধনের নির্দেশ যতো-ই নিখুঁত ক'রে তুলুক রাধা, সাধনকে খুশী করা সহজ নয়। পদ্ধতি-ও কষ্টসাধ্য। একবার সে সাধনের কাছে শিখবে। আবার সে-ই শেখাবে ছেলেমেয়েদের। এইখানে শঙ্কর এলো মারুতিকে নিয়ে। সাধনের কথা বুঝে বুঝে নাচ তুললো। প্রচুর বকুনি খেলো, এবং তার বদলে সাধনকে-ও প্রচুর কথা শোনালো। শঙ্কর রাগে না। তবে যখন সে বকতে আরম্ভ করে সাধনকে, অনর্গল ইংরিজি বলে। তার মধ্যে বাংলার বকুনি-ও থাকে। ইংরিজিটা আবার রেড্ডির কাছে শেখা। সাধনকে সে অনায়াসে 'Mad as hatter', বা 'Crazy fool' বলে বসলো একদিন। ভয় পেয়ে মারুতি বললো,—

—শঙ্কর তুমি ইংরিজি জান না। ও কথাগুলো গালাগালি।

সতেজে শঙ্কর বললো—

—জেনেশুনেই বলেছি। সাধনদাদা কেন আমাকে গাধা বললো? ও যা বলবে তার ডবল না চ্যাঁচালে ও থামবে?

বলে হাসতে লাগলো। সাধনকে বললো—

—বেশী ক্ষেপে যাচ্ছ কেন? শেখাচ্ছ তো নাচ। পাগল হয়ে লাভ আছে কোন?

সাধন, রাধা, শঙ্কর আর মারুতির সহযোগিতায় সমাপ্ত হলো কোরিওগ্রাফি। রাধার ভূমিকা সম্পর্কে কারো বলবার কিছু রইলো না। কি প্রথম পরিচয়ের সলজ্জ সরমে, কি পরিপূর্ণ প্রেমলীলায়, কি বিরহে, কি মিলনে, কি ভাবসম্মিলনে কিছু বলবার রাখলো না রাধা।

রাধা যখনই হলের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো, খোলের শব্দ শোনবার সঙ্গে সঙ্গেই তার আশ্চর্য পরিবর্তন। সে ছাড়া আর যেন কিছু নেই, কেউ নেই। ভক্ত মানুষ শ্যাম। রাধার সঙ্গে খোল সঙ্গত করতে করতে এক একদিন ভাবাশ্রু এসে পড়ে তার চোখে। বলে—

—রাধাদিদি, বড়কর্তা ঠিকই বুঝেছিলো। আমাকে বলতো, দেখে নিস শ্যাম ওর মধ্যে ঠিক জিনিষটি আছে। ও ঠিক পারবে।

মারুতির একটু মুশকিল হলো। তার চেয়ে রাধা সত্যিই এত ভালো নাচে, যে রাধার সামনে সে বারবারই ম্লান হয়ে যায়। মারুতির অসুবিধে বোঝেনা সাধন। সে শুধু চ্যাঁচামেচি করে। বলে,

—হচ্ছে না মারুতি, হচ্ছে না!

রাধাকে সাধন বললো—

—ও ছেলেটাকে দিয়ে ত' হচ্ছেনা রাধা। ওকে তুমি একটু বোঝাও। ওর সঙ্গে মেশো। ওকে ভাল করে বলো।

কিছুতে পারছে না মারুতি। বড় মনখারাপ তার। তাকে ডেকে নিয়ে গেলো রাধা। বাগানের নিরালায় বসে বললো,—

—কি মারুতি? কোথায় আটকাচ্ছে বলো ত'? সস্নেহ কণ্ঠে বললো,—

—আমার সঙ্গে বেশী ক'রে রিহার্সাল করে এসো। সাধন যা বলে, তার বাইরেও নিজে ভাবতে চেষ্টা করো।

রিহার্সালের সময়ে মারুতিকে সাহায্য করলো নানাভাবে রাধা। আস্তে আস্তে জড়তা ভাঙলো মারুতির।

সকলেই প্রাণপণ সহযোগিতা করে। তবু সাধনের মন ওঠে না। মানসপটে যে নৃত্যলীলার বিচিত্ররূপ দেখছে, তার কল্পনার সঙ্গে তাল ফেলে চলবে কে? প্রথমে রাধার ধারণা ছিলো, সাধনের হয়ে সেই পরিচালনা করবে রিহার্সাল। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেলো সকলের সব ধারণা ভেঙে দিলো সাধন। এ তার ট্রুপ। তার নৃত্যপরিকল্পনা। রিহার্সালের প্রথম থেকে শেষ অবধি সে-ই পরিচালনা করবে।

আগে সাধনের বাঁচবার পদ্ধতিটাই ছিলো ছটফটে অস্থির। অত্যন্ত জীবন্ত ছিলো সে। তার দুর্দম প্রাণশক্তি নিয়ে বাঁচতে বাঁচতে সে ঘূর্ণ্যমান একটা নীহারিকার মতো অস্থির প্রাণছ্যুতি বিকিরণ করতো। তার চরিত্রটাই ছিল সেই ধাঁচের। নাচ শেখাবার সময়ে বা নাচবার সময়ও এই অস্থিরতা তাকে ক্ষেপিয়ে তুলতো। ঝড়-তুফানের মতোই হৈ হৈ করতো সাধন।

এখন তার চরিত্রের আদলটা অনেকটা বদলেছে। খানিকটা নিজের জন্যে। খানিকটা রাধার প্রভাবে। এ কথা সে আজ বোঝে যে অযথা অস্থির হয়ে উঠলে ক্ষয় হয়ে যেতে হবে। ধৈর্য এসেছে তার।

সকাল আটটার সময়ে রিহার্সাল নিতে আসে সাধন। বেলা একটা অবধি চলে রিহার্সাল। নাচতে পারে না নিজে। তবু প্রত্যেকটি ছেলেমেয়েকে নির্দেশ দেয় সযত্নে। এদিকে সে নির্মম। তার নির্দেশ মতো নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত সে ছাড়ে না। প্রত্যেকটা ভুল ত্রুটি দেখে তার মুখখানা এমন দেখায় যেন এ ভুল তারই দোষে হলো। আবার যখন ভালো হয় কারো, তখন সে আনন্দও যেন তারই প্রাপ্য।

নাচতে নাচতে ঘন ঘন বুক ওঠানামা করে রাধার। মেয়েরা ক্লান্ত হয়ে যায়। ছেলেরা ঘনঘন ঘাম মোছে। সাধনও অপর্যাপ্ত ঘামতে থাকে। মস্তো একটা তোয়ালে নিয়ে বসে সে। প্রসাদ ঘাম মুছে দেয় আর সাধন চ্যাঁচায়—

—স্টার্ট দাও—এক-দুই-তিন-চার! বীণা বাড়তে রহো না! ধেয়ান, সুর উঠাও! ও কি করছো। গিধোড়ের মতো চেঁচিও না—আবার করো—এক-দুই-তিন-চার—এক-দুই-তিন-চার!

বলে,—

—এত সহজে হবে বলে ভাবো কেন? এই যে হাত ঘুরিয়ে আনছো সামনে—মনে করছো খুব সুন্দর হলো? এই দেখ—

সাধন যেটুকু দেখায় তা' মেনে নেয় ছেলেমেয়েরা হাসিমুখে। মাথা নিচু করে। স্নেহময় পিতার মতো সাধন উপদেশ দিয়ে বোঝায়। বলে,—

—যখন নিচু হলে, ঘুরলে, পাশে বেঁকলে, হাতে কোনো মুদ্রা করলে সবসময় লক্ষ্য করবে ভেতরে কোনো বাধা রাখছ কি না। শরীরের ভেতর কোন জড়তা রাখবে না। কেন রাজন্, জয়পুরে কতোবার দেখিয়েছি তোমাদের, ভুলে গিয়েছ ?

পরিশ্রম যে হচ্ছে সাধনের তাতে কোন সন্দেহ নেই। শরীর বাঁচিয়ে চলবার কথা বলতে গিয়ে একদিন ধমক খেলো রাধা। সাধন বললো,—

—কেমন করে এ সব কথা বলো রাধা ? এ কথা তুমি নিজে বিশ্বাস করো ? শরীরকে আরাম দিলে চলে ? কষ্ট না করলে হয় ? এ সব কথা আমায় বলো না। সময় কোথায় দেখছ তুমি ? সময় একেবারে নেই রাধা।

সেইদিন থেকে আর রাধা কিছু বললো না মুখে। নিজে খুব সচেতন হয়ে উঠলো। রিহার্সাল যাতে ভালো হয়। ছেলেমেয়েদের ভুলত্রুটি যাতে কম হয়, সে সব দেখলো। সাধনকে আরাম দিতে হলে অন্য কোন পন্থা সম্ভব নয়।

সাধনের নির্দেশকে রূপ দেবার জন্যে রাধার এই ঐকান্তিক আগ্রহটাকে শ্রদ্ধাভরে নিলো ছেলেমেয়েরা। রাধার আড়ালে আলোচনা করলো তারা। শঙ্কর বললো আন্তরিক আফশোষের সঙ্গে,—

—সাধনদাদা কতবড়ো আর্টিস্ট, আমরা তো দেখেছি! ঐ মানুষ যখন স্টেজে নেমেছে, সকলকে একেবারে জ্বালিয়ে দিয়েছে। ওর মধ্যে একটা আগুন আছে। ও কি পারে না পারে আমরা হাজারবার দেখেছি। এখন সেই মানুষ নিজে নাচতে পারে না। ওর দুঃখ আমি তুমি কি বুঝব বল ?

রাজন্ বলে—তবু ভাগ্যে রাধা ছিলো।

—নিশ্চয়।

বলে চুপ করে যায় শঙ্কর।

১৭

কৃষ্ণলীলা যেমন একটা পরিণত রূপ নিলো, বাড়িটা গুঞ্জরণ করতে শুরু করলো নানারকম কাজের সুরে। মঞ্চসজ্জা ও পোশাকের অনেকখানি অভাবই মিটিয়েছে বৃন্দা। তবু আরো অনেক দরকার। পিস্‌বোর্ড, কাঠ, গঁদ, নানারকম কাপড়, কাগজ, রং, তুলি, চট, হার্ডমেসোনাইট বোর্ড, মেলা বসে যায় হল ঘরে। মালাবারের ছেলে রেড্ডির সহজাত একটা ক্ষমতা আছে। তার নির্দেশে কাঁচি ধরলো ছেলেরা। অতি সুন্দর গাছ, কুঁড়েঘর, লতাকুঞ্জ বানালো রেড্ডি। চটের ওপর রং করে বানালো দৃশ্যপট। কাঠপুতলী সাজবে যারা তাদের মুখোস বানাবার দায়িত্ব-ও কম নয়। সে কাজ নিলো রাজন্ আর শঙ্কর।

মেয়েরা হাসিমুখে ছুঁচসুতো তুলে নিলো হাতে। তৈরী হলো বিচিত্র কাথিওয়াড়ী কারুকাজে রাধা ও গোপিনীদের পোশাক। ভেলভেটে পুঁতি গেঁথে তৈরী হলো রাধার গহনা—সিঁথি, বাজু, কঙ্কণ। চামড়ার পেটিতে ঘুঙুর গাঁথে কেউ। টুকরো টুকরো আয়নার কাঁচ বসিয়ে জমকালো ক'রে তোলা হয় মেয়েদের চোলি। গোলাপী, সবুজ, লাল ও হলুদ রঙে পাত্‌লা ওড়না রাঙিয়ে ছায়াতে শুকোতে দেওয়া হয়। তাতে অভ্রের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলে পরে ঝকঝক করে।

এমনি ব্যস্ততার সময় একদিন সাধন ও রাধার কাছে এসে দাঁড়ালো রাজন্। বললো,—

—একটা কথা ছিলো।

—কি কথা?

—বীণা আর অপেক্ষা করতে চাইছে না। আমার বাড়ীতে জানিয়েছিলাম। চিঠির জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। বাবার আশীর্বাদ পেয়েছি। এখন আর দেরী করবার কোন মানে হয় না।

খুব আনন্দিত হলো সাধন। বললো—

—তোমাদের বিয়েতে আমার-ও একটা মস্ত কর্তব্য আছে। কলাতীর্থমে যে গোলমালটা বাধিয়েছিলে! সেখানে তবু বীণার দর্শন মিলতো, এখানে তো দেখাই পাওয়া যায় না রিহার্সালের সময় ছাড়া।

—তুমি এখন ভালো হয়ে গিয়েছো সাধনদাদা। তা ছাড়া রাধাদিদি তোমার সব দেখাশোনা করে।

—তা ছাড়া-ও বীণা খুব-ই ব্যস্ত—সে কথাটা বলো?

রাধার কথায় বীণা একটু লজ্জা পেল। সাধন বললো—

—তুমি রেজিস্ট্রারকে নোটিশ দাও রাজন্।

বীণা আর রাজনের বিয়েতে ট্রুপের সকলেরই খুব আনন্দ হলো। শঙ্কর প্রথমে রাজন্‌কে বিয়ে করার অনুপযোগিতা সম্বন্ধে অনেক বোঝালো। বীণাকে যথেষ্ট ঠাট্টা করলো। কার্যকালে সে-ই ছেলেদের সাহায্যে দেবদারু পাতা দিয়ে হলঘর সাজালো।

বিয়ের সন্ধ্যায় শঙ্কর, মারুতি, মনোহর, রেড্ডি, সতীশ, নরসিং, সবাই মিলে নতুন স্যুটকেশ বোঝাই করে বরকনের জিনিষ কিনে আনলো। গ্রামোফোনে সানাই-এর রেকর্ড বসালো রেড্ডি। চা আর খাবারের বন্দোবস্ত দেখতে লাগলো ছেলেরা।

বীণা আর রাজন্ দু'জনের বাড়ীর অবস্থাই খুব ভালো নয়। বিয়েতে দূরদেশ থেকে শুভাশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু পাঠাতে পারলেন না তাঁরা। স্বভাবতঃ দুজনেই স্বল্পভাষী, ভদ্র এবং আত্মমর্যাদা-সম্পন্ন। তাদের কারোই কিছু প্রয়োজন নেই, এ কথাই জানালো বারবার। রাজন্ বলল,—

—ভেবেছিলাম খানিকটা আর্থিক সংগতি না হ'লে বিয়ে করা উচিত হবে না। কিন্তু এখন দেখছি অপেক্ষা ক'রে ক'রে বয়সটাই বেড়ে যাবে।

বললো, ট্রুপের শুভকামনাই মস্তো জিনিষ তাদের কাছে।

বিয়ে ব্যাপারটা সকলেরই পছন্দ। প্রথম ট্রুপ ভাঙলো, তাতে সকলেরই মন খারাপ ছিলো। আবার নতুন করে ট্রুপ হলো। বন্ধুবান্ধব যারা ছড়িয়ে গিয়েছিলো একত্র হলো। রাজন্ আর বীণার বিয়েতে সকলেই খুশী হলো। খুবই আনন্দিত হলো। দোতলার ছোট একখানা ঘর ছেড়ে দিলো রাধা। নিজেরাই সেই ঘর রং করলো রাজন্ আর বীণা। একখানা নিচু চৌকি-ও পাওয়া গেলো।

সাধন আনলো নতুন বিছানা একপ্রস্থ। অযোধ্যাপ্রসাদের একখানা শৌখিন আয়না আছে। ফ্রেম করিয়ে সেটা-ই তিনি উপহার দিলেন। মেয়েরা একজোট হ'য়ে কনের জামাকাপড় উপহার দিলো। বীণা আর রাজন্ কুণ্ঠিত কৃতজ্ঞতায় বারবার বললো—

—কেন এত করছো তোমরা? কি দরকার!

সকালে হলো রেজিস্ট্রেশান। সন্ধ্যেবেলা বর বৌ-কে গালিচা পেতে বসানো হলো। উলু দিলো রাধা। শাঁখ বাজালো। মালা বদল করিয়ে দিলো। বরকনে-কে আশীর্বাদ করলো সাধন। বিয়ে হয়ে বীণার একটু পদমর্যাদা বেড়েছে। ছোট বোনটির মতোই আবদার ক'রে সে সাধনের কাছে এসে দাঁড়ালো। সস্নেহে তার মুখ তুলে দেখলো সাধন। বীণার পরনে লাল রঙের ভারি সুরাটী বেণারসী। গলায় সোনার মঙ্গলসূত্র। সস্নেহে হেসে বীণা বললো,—

—রাধাদিদি দিয়েছে। বললো এ আমার কোন্ কাজে লাগবে বীণা? বাক্সে-ই পড়ে থাকবে।

সেজেগুজে মেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। বীণাকে ধরে নিয়ে গেলো তারা। হলঘরে হৈ হৈ শুরু হলো।

আশপাশের প্রতিবেশী গোয়ানিজ, মারাঠি ও পার্শী কয়েকটি পরিবারকে নেমন্তন্ন করেছিলো রাধা। সবাইকে আদর আপ্যায়ন করে সে খুশী করলো। তার পর এলো সাধনের কাছে। বললো—

—কিছু খেয়েছো সাধন ?

হালকা নীলের ওপর সোনালী টানা দেওয়া একখানা ঢাকাই শাড়ী পরেছে রাধা। চুলে পরেছে ফুল। সাধনের জন্যে ট্রে নিয়ে এলো একটা। পাশে বসে গুন্‌গুন্ করে গান গাইতে গাইতে কফি ঢাললো পেয়ালায়।

রেকর্ডে সানাই মূলতান বাজাচ্ছে। হলঘরের আনন্দ কোলাহল কানে আসছে। উৎসবের একটা সুন্দর পরিবেশ।

আলো আঁধারিতে রাধার মুখখানা দেখা যায় না। সাধনের মনে হয় মুখ ফিরিয়ে আছে রাধা। বলে,—

—কি ভাবছ রাধা ?

জবাব দেয় না রাধা।

—এদিকে চাও রাধা।

তাকায় রাধা। পরিপূর্ণ দৃষ্টি।

সাধন বলে—ট্যাক্সি ডাকতে বলো রাধা। বেড়াতে যাব। অনেক দূরে। টাকা নিও সঙ্গে।

ভারসোভার সমুদ্রতট। আরব সমুদ্রকে বেঁধে বেঁধে সহরের সীমানা বাড়ানো হয়েছে অন্য জায়গায়। এখানে খোলা সমুদ্র। জেলেদের ছাউনি রাতের আঁধারে দেখা যায় না। টিমটিমে আলো-গুলো নজরে পড়ে। সমুদ্র এখানে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। পাথর ও বালির বেলাভূমিতে আছ্‌ড়ে পড়েই পিছিয়ে চলে যাচ্ছে। রাত ক'রে জেলেরা ডিঙি নিয়ে মাছ ধরতে যায় সমুদ্রে। কালো আঁধার। কালো জল। এই আকাশ আর জলের নিকষ কালোয় আলোর ফোঁটা কতগুলো উঠছে আর নামছে। মাছধরা নৌকোর আলো

সেগুলো। এমনি ধারা রাতে জেলেরা মাছ ধরতে যায়। অনেক দূরে গভীর সমুদ্রে জলের তলায় লুকোন পাহাড়ের গায়ে শাল কাঠের খুঁটি পোঁতা আছে। তার গায়ে লোহার চেনে বাঁধা লম্বা ছিপছিপে নৌকো। জেলেরা তাদের ডিঙি নৌকো সেখানে বাঁধে। বেঁধে সেই নৌকো নিয়ে মাছ ধরতে যায়।

পাশাপাশি বসে সাধন আর রাধা। রাধার শাড়ীর পাতলা আঁচল ফুলে ফুলে উঠছে বাতাসে। মুখে চোখে লাগছে ভেজা বাতাসের ঝাপটা।

অনেক কথা হয়নি। তবু সে সব কথা হয়েছে। বলা হয়েছে মনে মনে। একজন বলেছে, আর একজন শুনেছে। সে সব কথা যদি না-ই হবে, তো আজ কেন এখন, এই লগ্নে বসে হৃদয় পরিপূর্ণ হলো প্রশান্তিতে? এই পরিপূর্ণতার নাম-ই কি প্রেম নয়? কোন একটা মহাসাগর যেন তাদের মনে-ও ভরে উঠেছিলো। এর ঢেউ ভেঙেছিলো ওর হৃদয়ের তটে। সাগর ও বেলাভূমি দুজনেই দুজনের গান শুনে নিলো।

তাই কথা শুরু হলো যেন অনেক কথার পর থেকে।

সাধন বললো,—

—দেখ রাধা, এমন সময়ে এলে তুমি আমার জীবনে, যখন ভাঙাচোরা আমার দেহ, অক্ষম অশক্ত আমি। আমার অধিকার নেই। তবু এতখানি ঐশ্বর্য ত' অস্বীকার-ও করতে পারব না রাধা।

—তোমার দেহটাকে আমি দেখিনি সাধন। এইসব অক্ষমতা আমার চোখে নেই।

—সে কথা জানি। জানি তোমার অনেক ঐশ্বর্য। তুমি রাজ-রাজেশ্বরী।

—এমন কি ঐশ্বর্য আমার সাধন?

—অনেক আছে, তাই আমার এত ক্ষয় ক্ষতি তোমার চোখে পড়ে না।

—আমার চোখে তোমার অতুল বৈভব।

রাধার সুন্দর সুকুমার হাতখানা ঘামে ভিজে ওঠে। মুখের কথা নয়, সান্ত্বনা দেবার কথা নয়, অন্তর থেকে সাধন বলে—আমারই সৌভাগ্য।

সাধনের কাঁধে রাধা মাথা রাখে নিঃসঙ্কোচে। পরম ঘনিষ্ঠ দুটি হৃদয়ে একই মন্ত্রোচ্চার। রাধার মুখে হাসি, চোখে জল। সাধন বলে,—

—এত সুন্দর তুমি রাধা। তোমার মন এত সুন্দর, হৃদয় এত সুন্দর—এমন আমি আর দেখিনি। তোমার তুলনা নেই।

—কথা বলো না সাধন।

বাতাস আড়াল ক'রে সিগারেট ধরায় সাধন। একলহমা আলোয় মুখখানা দেখা যায়।

সমুদ্রের মতো রহস্যময়ী দেখায় রাধাকে। অতল রহস্য তার দুই চোখে। সাধনের দিকে তাকিয়ে থাকে। দুই চোখ জিজ্ঞাসা করে, তারপর?

রাধার হাতখানি নিয়ে কপালে ছোঁয়ায় সাধন।

প্রসন্ন কণ্ঠে রাধা বলে,—

—আজকে আমার বৃন্দার কথা বড় মনে পড়ছে সাধন। তাকে-ও তুমি ভালোবাসতে?

—নিশ্চয়। তাকে ভালোবাসিনি এতবড় মিথ্যাকথা কি বলতে পারি রাধা? ভালোবেসেছিলাম তাকে। এত ভালোবাসা এত প্রাণশক্তি নিয়েও ত' বৃন্দা পারল না! তার কথা থাক রাধা।

—বৃন্দাকে আমি কিন্তু বেশ বুঝি। আমার দুঃখ হয়।

—বৃন্দার জন্যে আমার বড় শ্রদ্ধা আছে মনে। একলা একলা সে এমন কষ্ট করেছে!

বৃন্দার কথা এখন ভাবে কে? এত প্রেম, এত আগুন, এত সংকল্প নিয়ে-ও বৃন্দা আজ কতো অবাস্তব হয়ে গেছে সাধনের মনে।

কত দূরে চলে গেছে সে। বাইরের দূরত্ব ত' দূর নয়। মনের বিচ্ছেদে যে একত্র বসবাসের মানুষ-ও পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। একদিন যে বৃন্দা তার আকাশ বাতাস ভ'রে রেখেছিলো, সে আজ কোথায় চলে গেছে। কত দূরে। ছায়া হয়ে গেছে।

সাধনের সমস্ত অক্ষমতা, দোষ, ত্রুটি, রোগের গ্লানি সমস্ত স্বীকার ক'রে যে মেয়ে এসে দাঁড়ালো তার পাশে, সে-ই আজকে সত্যি। জীবনের দাবী নিয়ে এলো রাধা। নিজের তরুণ, সুন্দর দেহমনে সাহস ও আশ্বাস বহন করে আনলো। সঞ্জীবিত করলো সাধনকে। অনেক ক্ষয়ক্ষতি তার চোখে পড়লো না। সাধনের শিল্পী সত্তাটাকেই দেখল সে! সাধনের জীবনে রাধা অমৃত আনলো লক্ষ্মীর মতো। আজ প্রথম যৌবনের সে উন্মাদনা নেই, ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে বাঁচবার কামনা অতন্দ্র জেগে নেই। বিশ্বপ্রকৃতির সমস্ত কিছু সুন্দরের সঙ্গে প্রেয়সীকে মিলিয়ে দেখবার আনন্দ নেই। নারীর মধ্যে শুধু উর্বশীকে দেখবার রোমাঞ্চ-ও নেই।

ভরাফসল তুলে নেবার পর-ও ধূ ধূ মাঠ যেমন আগামী ফসলের সম্ভাবনা বুকে নিয়ে অপেক্ষা করে—তেমনই এক প্রশান্ত প্রতীক্ষায় জাগর মন প্রাণ। একদিন ভেবেছিলো সাধন, এই যা হলো এখানেই শেষ। এরপরে আর কিছু হয় না, হতে পারে না। সে ভুল তার ভাঙলো। সে শেষ হয়ে গেলো বা বৃন্দা পরাজিত হলো বলে-ই দুনিয়া ফুরিয়ে গেলো না। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বেঁচে রইলো। বাঁচবার জন্য তাদের সংগ্রামের কাছে মৃত্যু বারবার পরাজিত হলো। সেই মহান্ অতৃপ্তি বেঁচে রইলো, যা মানুষকে উত্তরোত্তর নতুন নতুন সৃজনের কাজে উদ্বুদ্ধ করে। এই অতৃপ্তি জীবনসঞ্জাত। এই অতৃপ্তি-ই বাঁচায় মানুষকে। একদিনে সুন্দর হবার নয় পৃথিবী, তাই তার পুরনো পরিচিত চেহারাখানার অন্তরালেই সার্থক ও সুন্দর এক পরিণতির সাধনা চলে। দৈনন্দিন জীবনে কত ক্ষয়, ক্ষতি, তুচ্ছতা, গ্লানি—এসব স্বীকার করে-ই মানুষ

বাঁচে। এরই মধ্যে মানুষ শিল্প সৃজন করে, বিজ্ঞানের আরাধনা করে—মহৎ সৃষ্টি সম্ভব করে। কোনো অদ্ভুত, দেহাতীত, অলৌকিক শক্তি এই সব বিস্ময়কে নিয়ত সম্ভব করছে না। অজস্র অক্ষমতা, ত্রুটি, সংস্কারে ভরা যে সাধারণ মানুষ, তার দু'খানা দুর্বল হাতের নিয়ত চেষ্টাতে-ই সম্ভব হচ্ছে এই মহান্ রূপান্তর।

এত কথা যদি সত্যি হয়, তার কাছে একজন সাধন, বা বৃন্দার জীবনের জয় পরাজয়ে কি এসে যায়? সেই সত্য যেন কথা না কয়েই শেখালো রাধা।

সেই শেষ থেকেই রাধা শুরু করলো। অপরিসীম ধৈর্য, শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সেই সব টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া সাধনকে তুলে নিলো। সাধন না থাকলে-ও ট্রুপ চলবে। শিল্প সাধনা চলবে। এই কথা বুঝিয়ে তাকে সচেতন করলো। সাধন বুঝলো—সে থাকা না থাকা সমান—তাই তার মনে এলো বাঁচবার দুর্মদ আকাঙ্ক্ষা। জীবন বড় নিষ্ঠুর। বড় সহজে পরিহার করতে পারে পরাজয়প্রেমী মানুষগুলোকে। তাই বুঝলো সাধন। বুঝে তার অন্তরের-ও অন্তরে যে স্ফুলিঙ্গ ভস্মাচ্ছাদিত ছিল, তা জ্বলে উঠলো। সার্থক ভাবে বাঁচবার পথটাই বেছে নিলো সাধন।

জীবনের মন্ত্র তাকে শেখালো রাধা। রাধা তার গুরু। রাধার ব্যক্তিত্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ। সাধনকে সে সঙ্গে চলবার জন্যে আহ্বান করেছিলো মাত্র। একজন বাঁচলে অপরের ভালো লাগে। একে অপরকে সার্থক হতে দেখতে চায়, এই তো শিল্পীর ধর্ম। স্বার্থপরের মতো অপর সকলকে দাবিয়ে দিয়ে নিজে বেঁচে, নিজে জয়মাল্য আহরণ করে যে বাঁচা, সে ধর্ম প্রকৃত শিল্পীর নয়। প্রকৃত শিল্পী সর্বদাই চাইবে, আরো অনেক জন শিল্পী বেড়ে উঠুক—তা ছাড়া সৃজনশীল শিল্প বাঁচতে পারে না।

এই ধর্মের অনুশাসনে রাধা আর সাধনের হৃদয় এক হলো। রাধা

তার জীবনে মস্ত বড়ো সত্যি। এত বড়ো সত্যিকে কেমন করে অস্বীকার করবে সাধন ?

রাধার পাশে ব'সে, সমুদ্র ও বিশ্বপ্রকৃতিকে সাক্ষী রেখে সাধনের হৃদয় বললো,—তুমি আমায় শান্তি দিলে, সার্থকতা দিলে, বিভ্রান্তির হাত থেকে বাঁচিয়ে আমাকে আমার মধ্যে ফিরিয়ে দিলে। শেষ সময় আমাকে আর এ জবাবদিহি করতে হবে না যে, আমি ভুল করেছি। স্বার্থপরের মতো বেঁচেছি। শিল্পী হয়ে-ও নিজের দায়িত্ব পালন করিনি। সেইসব অসত্যাচরণ আমাকে করতে দিলে না তুমি। আমার পাশে থেকে আমায় সাহায্য করলে। তোমাকে তাই আমি হৃদয়ে বরণ করলাম। বরণ ক'রে ধন্য হ'লাম। তুমি আমার জীবনে পরম কল্যাণ এনেছ। তুমি আমার কল্যাণকামী বন্ধু। তুমি আমার বধূ।

এ কথা বললো মন। বললো যখন, তখন ভালো করে রাধার মুখখানি দেখতে বাধলো না সাধনের। সেই শুভদৃষ্টির মুহূর্তে দুজনের-ই অনেক কথা মনে পড়লো। পবিত্র অশ্রুতে ভরে উঠলো দুজনের-ই চোখ। দুজনে দুজনকে অনেক সুন্দর দেখলো সেই টলটলে জলের আড়ালে।

তারপর উঠে দাঁড়ালো তারা। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হাতে হাত রেখে সাধন বললো,—

—ভালো ক'রে বেঁচে নেওয়া যাক একবার, কি বলো।

—নিশ্চয়।

হাত ধরাধরি ক'রে শিশুর মতো নিশ্চিন্তে ফিরলো তারা।

২০

শো-এর দিন এগিয়ে এলো। হল ঠিক করা, প্যাম্ফ্লেট ছাপানো, টিকিট বিক্রীর বন্দোবস্ত করা—হাজারটা কাজ নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে রাধা।

আর কোন ধ্যানজ্ঞান নেই সাধনের। সে রয়েছে রিহার্সাল নিয়ে। তার আর রাধার মধ্যে কোন অঙ্গীকার স্থাপিত হয়েছে। এই শো-টা সাধনের কাছে ত' শুধুই শো নয়। এটা তার কাছে তার চেয়ে অনেক বড় কিছু। তার এক চরম পরীক্ষা এই কৃষ্ণলীলা।

কলাতীর্থমের সময়ও যারা সাধনকে দেখেছিলো, তারাও অবাক হলো এখন। তখনও সাধন উৎসাহিত হয়ে উঠতো। ছটফট করতো, জ্বলতো নিজের আবেগে। এখন যেন তার মধ্যে একটা গতিবেগ এসেছে। এ যেন নদী মোহনায় এসেছে।

সাধনকে ভালোবাসে ছেলেমেয়েরা। চার পাঁচ বছর ধরে দেখে দেখে, তার ওপরে ভালোবাসা তাদের আন্তরিক। সাধনের মনের এই ভাবটা তারা বুঝলো। এখন আর শরীরের কথা বললেও শুনবে না সাধন। মানবে না কারো বারণ। সেখানে রাধার শাসনও মিথ্যে হয়ে যাবে।

রাধা-ও বারণ করেনা কখনো। যা করতে চায় করুক সাধন। সে এতটুকু বাধা দেবে না।

হঠাৎ কেমন করে সময় ফুরিয়ে গেল, এমন তাড়া পড়ল? সে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেও কোন উত্তর মিলবে না। কেননা বাইরের হিসেব দেখেনি সাধন। কতো দিন, প্রহর, ঘণ্টা, পল খসে গেল সাধনের জীবন থেকে সে হিসেব করেনি সাধন কোনদিনও। আসলে তাড়াটা

আসছে ভেতর থেকে। মনে হয়েছে যখন, তখন আর সে তাগিদটাকে উপেক্ষা করতে পারবে না সাধন। তার কাজ তাকে শেষ করতেই হবে। সময় কেন এমন দামী হলো সাধনের কাছে সে কথা সাধন অন্যকে বোঝাতে পারবেনা।

বুকের ভেতরটার শ্বাসরোধকারী অনুভূতি, অসহ্য যন্ত্রণা, ক্রমশঃ শক্তি কমে আসবার উপলব্ধি—এসব কথা কারুকে বলবার নয়। রাতে ঘুম না এলে উঠে বসে থাকতে পারো। আস্তে আস্তে পায়চারী করতে পারো বারান্দা দিয়ে। গলা শুকিয়ে যায়, পুড়ে যায় ভেতরটা অসহ দাবদাহে। তখন গেলাসের পর গেলাস জল খেতে পারো। নিশ্বাসের কষ্ট শুরু হলে কোরামিন, সে-ও নিজে নিতে পারো। এ কথা অপরকে জানাবার নয়। আমি অসুস্থ, আমি নিজেকে নিয়ে আর পারি না, এ কথা কারুকে বলবার নয়। রোগ, সে ত' পরাজয়েরই নামান্তর। অপরকে বিব্রত বা ক্লিষ্ট করবার কোন্ প্রয়োজন? এই দেহের ইন্দ্রিয় দিয়ে পৃথিবীর সঙ্গে যতো লেনদেন ঘ্রাণে, স্পর্শে, দর্শনে, সেই সবই ত' বিকল হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। সব হারিয়ে একটা জড় হয়ে বেঁচে থাকতে হবে শেষে? তারচেয়ে মৃত্যু অনেক ভালো।

আবার ঐ মৃত্যুর কথাটা কিছুতে স্বীকার করতে পারে না সাধন। মনে হয়, বাঁচবার মতো ক'রে বাঁচলাম কোথায় যে মৃত্যুর কথা ভাব্‌ব? মনটা ত' মরেনি। দেহটাই বিকল হয়েছে। কত কিছুই যে বাকি রয়ে গেল। বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে মনে হতো প্রত্যেকটা ফোঁটাকে আনন্দে উত্তর দিচ্ছে তার প্রতি রোমকূপ। মরুভূমিতে রাতের বেলা রিমঝিম শব্দ ক'রে বালির মধ্যে দিয়ে বাতাস বইতো। বালিতে গড়াগড়ি দিয়ে, মুখ ডুবিয়ে, আঘ্রাণ নিয়ে কিছুতে তৃপ্তি হতো না। সে সব জীবন সে আর জানবে না।

নাচ হলো তার নিজের ভাষা। সেই ভাষাতে যা বলবার ইচ্ছে তাই বা বলা হলো কোথায়?

এত কথা অনুক্ত রেখে যেতে পারবে না সাধন। এই জীবন এক বিচিত্র মহাপট। এক একজন তার জীবন দিয়ে সেই পটে এতটুকু রং লাগিয়ে যায়। সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে চিত্র দিনে দিনে। সাধন-ও তার ভাগটুকু ক'রে যেতে চায়। কেমন করে সে বোঝাবে কেন তার অস্থিরতা? কে তার কথা বুঝবে?

রাধার এত দান সে নিতে পারে না। অকৃতজ্ঞ হতে পারে না। অসত্যাচরণ করতে পারে না।

রাধাকেও পেলো সাধন। এত নিয়ে চলে যাবে কিছু না দিয়ে-ই?

সাধন তাই অস্থির হলো। এ অস্থিরতা দেহের নয়। ভাসাভাসা নয়—অদ্ভুত, প্রাণবন্ত একটা অস্থিরতা তাকে পেয়ে বসলো।

অতীব প্রত্যূষে প্রসাদ উঠে যখন গান গায়—

"কৃষ্ণহরি ভজো কৃষ্ণহরি
দুখিয়াকে দুখ দূর করো
ভজো ভজো কৃষ্ণহরি ॥"

তখনই উঠে পড়ে সাধন। সেই নিরুদ্বেগ সুন্দর কিশোর কণ্ঠ শুনতে শুনতে তার ঘুম ভাঙে। আর একটা দিন শুরু হলো ভাবতেই সে কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে।

প্রসাদ এখন সবে বড় হচ্ছে। সতেজ একটা কিশোর গাছের মতো আনন্দ আহরণ করতে করতে বাড়ছে সে। কাজ করতে তার বড় আনন্দ। সাধনের জন্যে সে স্নানের আয়োজন করে। গুনগুন করে গান গাইতে গাইতে তেল মাখায়। মালিশ করে। বলে,—

—সাধনদাদা, আমার দেশে একবার চলুন। কালাঢুঙ্গি ছাড়িয়ে ছোটাহলদোয়ানী পেরিয়ে আমার গ্রাম। মধু খাওয়াব চাক ভেঙে। আমার দাদা শিকার করবে। হরিণ খাওয়াব।

সাধন বলে,—যাব, যাব।

মনের খুশীতে জোরে জোরে মালিশ করে প্রসাদ। সাধন বলে,—

—তুই সব ছেড়ে এখানে রয়েছিস প্রসাদ, খারাপ লাগে না ?

—রাধাদিদি আছে। আপনি আছেন।

প্রসাদের চোখের নীলচে কালো তারায় কি প্রশান্তি। তার পাহাড় জঙ্গল ঘেরা গরীব গাঁয়ের জীবনে কোনো নিরাপত্তার আশ্বাসই নেই। তবু প্রসাদকে দেখলে মনে হয় না কোনো উদ্বেগ আছে তার জীবনে। দেখে দেখে সাধনের নিশ্বাস পড়ে।

স্নান হলে পরে প্রসাদ স্টোভ ধরিয়ে কফি বানিয়ে দেয়।

সাধন যখন এ বাড়ীতে আসে, তখন সাড়ে ছটা-ও বাজেনি। তখন থেকেই শুরু হয় রিহার্সাল। ছেলেমেয়েরা হাঁপিয়ে যায়। সাধনের ক্লান্তি নেই। কোনোদিন পরপর দু'বার রিহার্সালও হয়। মাঝখানে সামান্য বিরতি মাত্র। তাতেও মন ওঠে না সাধনের। না হয় নিজে নাচতে পারছে না সাধন। প্রথম থেকে শেষ অবধি সমস্ত নৃত্যনাট্যটি যে তার মনে সে ধরে রেখেছে। প্রত্যেকটি চরিত্র কে কখন কেমন করে নাচবে, সবই সে জানে। কার নাচ কতটা সুন্দর, নিখুঁত ও সম্পূর্ণ হতে পারে তাও সে জানে।

এতো যে জানে, তাকে খুশী করা সোজা নয়। ঘনঘন বুক ওঠানামা করে রাধার। নাচের ঘূর্ণি দেখতে দেখতে ঘূর্ণি লেগে যায় অযোধ্যাপ্রসাদের। ছেলেমেয়েদের মনে হয় মেঝেটাও যেন দুলছে তাদের সঙ্গে সঙ্গে তালে তালে। সাধনের পরিশ্রম হচ্ছে কিনা বোঝা যায়না মুখ দেখে। ঘামে সাধন। ঘাম মুছে দেয় প্রসাদ, বাতাস করে। একটু একটু জল খায় সাধন আর নির্দেশ দিয়ে চলে —প্রথম থেকে! আবার করো! বীণা স্টার্ট দাও এক-দুই-তিন-চার—

ঘাম মুছে শুরু করে বীণা। ওদিকে ধমক দেয় সাধন। বলে,—

—সুর উঠাও খেয়ান, সুর উঠাও! শান্তা, ঝিমিয়ে গেলে কেন? শ্যাম! কিচ্ছু হচ্ছে না।

বীণার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েরা কাঠপুতুলের ভঙ্গীতে নেচে নেচে আসে। কৃষ্ণকে ঘিরে ব্রজ বালকরা নাচে।—

'কাহ্না চরাবত গাই।
কাহ্না চরাবত গাই!'

বৈষ্ণব পদাবলীতে পদকর্তারা ভাবসম্মিলনকেই সমাপনী বলেছেন। তারপরেও রাসনৃত্য সংযোজনা করেছে সাধন। ভাব-সম্মিলনের পদাবলীতে বিরহের অধ্যায়। বিরহে সমাপ্তি মানতে চাইল না সাধন। পরিপূর্ণ মিলনে শেষ তার কৃষ্ণলীলা। সেই মিলন পর্বে যুগ্ম হৃদয়ের মিলনানন্দকে নন্দিত করে রাসনৃত্য।

রাসনৃত্যের পর্বে এসে আর তৃপ্তি হয় না সাধনের। তার মনের কথাটি রাধা ধরতে চেষ্টা করে। প্রাণপণ চেষ্টা করে যাতে এই শেষ অধ্যায়টি নিখুঁত হয়।

মিলিত কণ্ঠে ঝঙ্কৃত হয় রাসের বৃন্দাবন বন্দনাগীতি—

'শ্রীমন্ মধু্ বৃন্দাবন মণিমন্দিরে শোভন
যাঁহা রতন সিংহাসন
তাহাপর দুইজন
ললিতাদি সখীসঙ্গে
নানালীলা করি রঙ্গে॥'

শুনে অস্থির হয়ে ওঠে সাধন। বলে,—

—কণ্ঠমণির কণ্ঠে এই গান শুনেছি—যেন সুরটা তাঁর হাতের মুঠোয় থাকতো। তোমাদের গলায় কেন দরদ আসে না বলতো অমিয়?

গুরুর তিরস্কার ছাড়া আত্মোন্নতির উপায় নেই। এই আপ্তবাক্য স্মরণ করে চুপ করে গোপাল ও অমিয়। এক এক সময় চোখে

জল আসে ছেলেমেয়েদের। শঙ্করের সদাপ্রফুল্ল ব্যক্তিত্বেও চিড় ধরে। তখন সাধন-ই সান্ত্বনা দেয় পরম স্নেহে। বলে,—

—তোমাদের প্রশংসা আমি সহজেই করতে পারি। তাতে ত' ভাল হবে না। বারবার চেষ্টা করতে হবে। মনে একটা অতৃপ্তি রাখতে হবে। তাহ'লেই ত' সর্বাঙ্গসুন্দর হবে—বল তোমরা?

সাধনের দিকে চেয়ে তখন ছেলেমেয়েরা মনে করে এ সেই সাধন। কলাতীর্থমে যাকে নাচতে দেখে আশ্চর্য হতো সবাই। যার নিত্য-নতুন কম্পোজিশন পায়ে তুলতে বৃন্দাও হাঁপিয়ে যেতো। বলতো, সাধন, তুমি যদি বিদেশে জন্মাতে।

সাধনের পাণ্ডুর মুখ, চোখের নিচের কালি, গালভাঙা লম্বাটে মুখ, একদিকের হাড়বিহীন পিঠটা ভেঙে-চুরে জড় হয়ে বসে থাকবার অসহায়তা দেখে তখন তাদের মন গলে যায়। যার ভাষা ছিল গতি, বেগ, নৃত্য, ছন্দ—সে আজ বোবা হয়ে গিয়েছে। তার ভাষা আজ আর তার নয়। কোনো নির্মম পরিহাসে তাকে পঙ্গু ক'রে রাখা হয়েছে।

এত বড় ট্র্যাজেডিকে বীরের মতো সহ্য করেছে সাধন। উপেক্ষা করেছে। আজ অপরের গতিচ্ছন্দের মধ্যেই তার মুক্তি।

বুঝে ছেলেমেয়েরা রাগ করে না। আবার শুরু করে দাঁতে ঠোঁট কামড়ে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অবিচল হয়ে।

সাধনের মধ্য থেকে এই কঠোর সংকল্প যেন বিচ্ছুরিত হয়। দেখে ছেলেমেয়েরা। তারাও সেই ধনে ধনী হয়ে ওঠে। পর্দায় পর্দায় উঠতে থাকে নৃত্যলীলার মান।

রাধা যে কেমন করে নিজেকে ভেঙে ভেঙে গড়বে, তাই ভেবে পায় না। রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে—ছোট বাতি জ্বেলে বসে থাকে রাধা। স্থির হয়ে বসে মনটাকে গুটিয়ে আনতে চেষ্টা করে।

মনে মনে ভাবে, বিন্দু বিন্দু জলে যদি মহাসাগর হতে পারে, আপ্রাণ চেষ্টা দিনরাত করলে কি সে পারবে না ? রাতের পর রাত সাধন যদি ঘুম হারিয়ে পায়চারি করে কাটাতে পারে, সে অস্থিরতার এতটুকু কি সে পাবে না ?

একলাই ধ্যানে বসে রাধা। গালে হাত দিয়ে একমনে ভাবে কোথায় আমার সেই অতৃপ্তি, সেই জিজ্ঞাসা ?

সাধন বলে,—

—তুমি কি বাঁশী শোন রাধা ?

—কোন্ বাঁশী ?

রাধার দিকে চেয়ে-ও রাধাকে দেখে না সাধন। বলে—

—তুমি রাধিকা হবে,—সেই বাঁশী শোনবার সাধনা করবে না ?— আকুল শরীর, বেয়াকুল মন—যুগযুগ শ্রবণে-ও কর্ণ তবু পিপাসিত ? নইলে কেমন করে শিল্পী হবে রাধা ?

এই কথাটি যেদিন শুনলো রাধা, সেদিন আহারনিদ্রা তার কাছে বিস্বাদ হলো। নিজের ওপর ধিক্কার এলো তার।

নিজের ঘরটিতে বসে রাধা সেদিন ভাবতে লাগলো। কি সে অপরূপ প্রেম, যার কথা যুগে যুগে গেয়ে-ও ফুরোল না ? কবির কল্পনা, চিত্রীর তূলি যে রূপকে ফুটোতে পারল না বর্ণনা ক'রে ক'রে ?

মনটা তার কত চিন্তা জুড়ে ছড়িয়ে ছিলো। আস্তে আস্তে সমস্ত চিন্তা ছেড়ে মনটা তার গুটিয়ে এই এক চিন্তায় এসে পৌঁছলো। সেই মনটি হলো নিটোল একটি মুক্তোর মতো। মনটিকে মুঠোয় ধ'রে নিজের ধ্যানের নীলসমুদ্রে ডুবে গেলো রাধা। বিভোর হয়ে বসে রইলো। এমন এক অনুভূতি এলো তার মনে, যার স্বাদ সে আগে কখনো জানেনি। সমুদ্রের পার থেকে যেমন ধীরে ধীরে সূর্য উঠে, প্লাবিত করে দেয় বিশ্বচরাচর আলোকের অজস্র ধারায় তেমনই অপরূপ এক আনন্দ জাগলো রাধার মনে। বিভাসিত হলো

অন্তরের প্রতিটি কোণা। এরই নাম তাহ'লে সেই বাঁশী? অথবা কণ্ঠমণির কণ্ঠে শোনা সেই 'রোমে রোমে হরখিলা আনন্দ লহরী'?

নামে কি আসে যায়? ধ্যানটি রূপ নিলো অন্তরে। এক অপার আনন্দে ডুবে বসে রইলো রাধা চিত্রার্পিতার মতোই ধ্যানমগ্ন হয়ে। রাত কেটে গেলো।

সেদিন তার নৃত্য দেখে আর কিছু বলবার রইলো না। হংসবরণে কনকবরণী গোরী হয়ে যখন প্রবেশ করলো রাধা দিব্যরূপে পথ উজ্জ্বল ক'রে, তখন,—

'মর্তে এ কি শোভা মরি মরি!' ব'লে সত্যিই মুগ্ধ হলো সবাই। ভ্রূক্ষেপ নেই রাধার। আত্মস্থ সে, ধীর, নয়ন আনত। তাকে দেখে মারুতি-ও অনুভব করলো প্রেরণা। বড় সুন্দর ভঙ্গীতে সে দেখালো—

'কঠিন পথে কোমল চরণ রাখলে ব্যথা পাব
কুসুম দিয়ে এ পথ আমি কোমল ক'রে যাব॥'

মনে হলো সত্যিই হৃদয়খানি পেতে দিলো মারুতি।

কৃষ্ণ বিরহে রাধা মৃদু ছন্দে ধীরে ধীরে কানন পরিক্রমার ভঙ্গীতে বললো,—

—'কানড় কুসুম করে পরশ না করি ডরে
এ বড়ি মরমে মনোব্যথা।'

এই বেদনা মেঘের মতো গলে গলে নামলো ভরা বাদর, মাহ ভাদরে। রাধার মুখে যেন সত্যিই বিদ্যুতের অস্থির ছটা খেলে গেলো।

যুগ্মমিলনে তাই রাস নৃত্যে সেদিন উৎসব নেমে এলো। সকলে এমন উত্তাল হয়ে উঠলো, যে মনে হলো সত্যিই বৃন্দাবন পর্ব আবার অভিনয় হচ্ছে এখানে।

"কি বা নব রে, নবরে, নব নব নব রে!
কালিন্দী পুলিন বনে কুঞ্জবন সাজে।"

দেখতে দেখতে সাধন ভাবানুভূতিতে কি রকম হয়ে গেলো। রাধা এমন আত্মগত হয়ে কোনদিন-ও নাচেনি। রাধাকে দেখতে দেখতে

আনন্দে অশ্রুসিক্ত হলো সাধনের চোখ। বড় কষ্ট হলো বুকে। সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটা যেন ঘুরে গেলো সামান্য।

নাচ শেষ করে সবাই যখন স্তব্ধ, তখন এগিয়ে এলো রাধা। সাধনের সামনে বসলো নতজানু হয়ে।

তারা দু'জনে ছাড়া কেউ যেন কোথাও নেই। দর্শকজন মুগ্ধ হয়ে, কিছু বুঝে কিছু না বুঝে, এই নাটকের ভেতরের নাটক দেখতে লাগলো। সাধন ঈষৎ নিচু হলো। বললো,—

—তুমি শুনেছ রাধা। তুমি পেয়েছ।

উঠতে পারে না, তবু ভগ্নপঞ্জর সিংহের মতো উঠল সাধন। বললো,—

—আর আমার দরকার হবে না রাধা।

রাধার কাঁধে হাত রেখে সাধন চলতে শুরু করলো। বললো,—

—মারুতি, শঙ্কর, ভাই সব—আমাকে মাপ করো। আমি বড় থকে গিয়েছি আজ। এতদিন বুঝতে পারিনি। ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি আমি।

ভাঙা পাঁজর আর স্থবির দেহ টেনে টেনে চলেছে সাধন—তার পাশে সন্তর্পণে টানটান হয়ে চলেছে রাধা—দুজনে চলে যাচ্ছে সরু পথ ধ'রে বাগানের দিকে—দেখতে দেখতে শঙ্কর সহসা বালকের মতো কণ্ঠে বলে উঠলো,—

—আমার একটা কথা দেখে নিও ভাই। সাধনদাদাকে আর বেশীদিন রাখতে পারব না আমরা।

—শঙ্কর!

বীণার কণ্ঠের তীব্র ভর্ৎসনা উপেক্ষা করলো শঙ্কর। ঘাম মুছতে মুছতে গলাটা পরিষ্কার করলো। আবেগে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলো গলা। বললো,—

—আমি এ সব মানুষকে বুঝি। কতক্ষণ মানুষ বাঁচে বলো? যতক্ষণ তার তৃষ্ণা থাকে। যখন সব তৃষ্ণা মিটে গেল, তখন বল

বীণা বহিন্, এই কথাটা আমায় বুঝিয়ে দাও—কি জন্যে বেঁচে থাকবে মানুষ ? লাখ মানুষের এক মানুষ যে ?

* * * * *

শঙ্করের আশঙ্কাকে উপেক্ষা করলো সাধন। সে কথা মিথ্যে হয়ে গেলো। যে মানুষটাকে ডাক্তার চব্বিশঘণ্টা বিশ্রামে থাকতে বলে, সে যদি আঠারো ঘণ্টা ক'রে পরিশ্রম করে—তাতে-ই ত' বোঝা যায় আশঙ্কাটার কোন ভিৎ নেই। অন্ততঃ কলাতীর্থমের ছেলেমেয়েরা তাই মনে করলো। সকালে পাঁচটা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত শুধুই বসে থাকে সাধন। দুপুরে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নেয় ট্রুপ। তখন সাধন বসে সাহায্য করে রাধাকে। প্রোগ্রাম দেখে, বিজ্ঞাপনের কি ব্যবস্থা হলো না হলো হিসেব করে। চারটে থেকে রাত এগারোটা অবধি বসে রিহার্সাল চালায়। রাধার আন্তরিক কুশলজিজ্ঞাসার উত্তরে সে একটা কথাই বলে,—

—ভালো আছি। এত ভালো আমার অনেকদিন লাগেনি।

পরে অবশ্য শঙ্কর রাধাকেই অনুযোগ করেছিল। বলেছিল কেন একটু সতর্ক হলো না রাধা। কেন বুঝতে চেষ্টা করলো না।

রাধা তার জবাবে বলেছিল,—

—কে বললো আমি বুঝিনি ? তাই বলে ওকে বারণ করবো ? কি বলো, শঙ্কর ? তুমি কিছু বোঝ না।

অনেক কথাই বোঝে না শঙ্কর, এ কথা ঠিক। তবু সাধনের বিষয়ে শঙ্করের সতর্কবাণীটা যদিচ এক আবেগঘন মুহূর্তেই বলা, তবু কথাগুলো সত্যি হয়ে উঠলো। পুরোপুরি নয়। তবু সত্যি।

শো-এর মাত্র চারদিন আগে ঘটলো অঘটন। রাতের রিহার্সাল শেষ হলে পরে-ও চেয়ারেই বসে ছিল সাধন। মারুতি পাশে দাঁড়িয়ে কথা কইছিল। প্রসাদ পায়ের কাছে নতজানু হয়ে ব'সে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল পায়ে। কথা কইতে কইতে হঠাৎ সাধন বললো,—

—মারুতি, আমায় ধর।

কি হলো সাধনের ? মারুতি কিছু বুঝতে না বুঝতে সাধন একটু হাসলো। বলল,—

—রাধাকে ডাকো।

অজ্ঞান হয়ে গেলো সাধন।

অদ্ভুত যন্ত্রণা শরীরে। বুকটা যেন কেউ লোহার আঙুলে চেপে ধরেছে। নিশ্বাস নিতে দেবে না। উঠতে দেবে না। একবার তাকিয়ে রাধার মুখখানা চোখে পড়লো। আবার নামলো ক্লান্তি। অসাধারণ ক্লান্তি। শরীরের প্রতি রোমকূপে নিদ্রা সঞ্চার করলো সেই ক্লান্তি। কোথায় কোন্ অতলে তলিয়ে গেল সাধন।

একটানা বাইশঘণ্টা ঘুমিয়ে তবে জাগলো সাধন। রাধা মুখ নিচু করলো। বললো—এখন কেমন ?

ভ্রূ কুঁচকে রাধাকে দেখেই উঠে বসতে চেষ্টা করলো সাধন। বললো,—

—শো-এর কি করলে রাধা ?

রাধা বললো,—

—সে কথা ভাবতে হবে না সাধন।

—ভাবতে হবে না ? সে কি বলছো ?

—তুমি উঠো না সাধন। ডাক্তার মানা করেছেন।

—ডাক্তার কি জানেন রাধা ? কি বলেছেন ডাক্তার ?

রাধা মাথা নাড়ল। বললো,—

—কিছু নয়।

—তবে আমি উঠব না কেন ?

রাধা বললো,—

—দরকার নেই। শো পরশুদিন। টিকিট বিক্রী হয়ে গিয়েছে। যা করবার আমি করবো। তুমি অস্থির হয়োনা সাধন। তোমার এতটুকু অমর্যাদা করবো না আমি। তুমি সম্পূর্ণ বিশ্রামে থাকো।

—ডাক্তার কি বলেছে রাধা ?

—কিছু নয় সাধন। তুমি মিছামিছি বকিও না আমায়।

একটু একটু করে একপেয়ালা দুধ খাওয়াল রাধা। পর্দা টেনে বাতি নিভিয়ে দিল। বললো,—

—তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে যা হতো তার চেয়ে এতটুকু খারাপ হবে না শো। আমি-ই ত' রইলাম।

রাধা এত ভরসা দিলো, যে স্বচ্ছন্দে ঘুম আসতে পারতো সাধনের।

তবু ঘুম এলো না। শরীরের কথা অবশ্য মনেই এলো না। খুব হাল্কা, খুব ভালো লাগল নিজেকে। এই যে বুকের ভেতরে অসহ ব্যথা, শ্বাসরোধের অনুভূতি, এ যেন অন্য কারো দেহে হচ্ছে। তাকে যখন অভিভূত করতে পারছে না, তখন কেমন ক'রে সে অভিযোগ করবে ?

বিনিদ্র রজনী। এই সব কথা ভেবে ভেবেই কেটে গেলো রাত।

২১

শো-এর দিন। ভোর পাঁচটা সবে বেজেছে। ঘণ্টার ঢং ঢং শব্দে চমকে জেগে উঠল সবাই। ঢং ঢং করে বাজছে ঘণ্টা। তাদের জাগতে বলছে। নেমে এলো সবাই। চেয়ারে বসে আছে সাধন। ছেলেমেয়েদের দেখে হাসতে লাগলো। বললো,—

—আমি এই শেষ রিহার্সালটি শুধু নেব।

ডাক্তারের কথাগুলি মনে ক'রে ভয় পেলো রাধা। অনুনয় করলো—জোর করলো। হাতের এক ঝট্‌কায় তাকে হটিয়ে দিলো সাধন। এ রিহার্সাল তাকে নিতেই হবে। হাসতে লাগলো সাধন। বললো,—

—ওসব বাজে কথা রাখো।

শুরু হলো রিহার্সাল। পরম অভিনিবেশে সমস্তটা দেখলো সাধন। রিহার্সাল শেষ হলো বেলা বারোটায়।

সমস্ত ট্রুপকে সামনে বসালো সাধন। বললো,—

—তোমরা আমার জন্যে অনেক কষ্ট করেছো। তোমাদের শুধু এই কথাটি জানাতে চাই—বড় কৃতজ্ঞ আমি তোমাদের কাছে। পরম সুকৃতি আমার যে, তোমাদের মতো বন্ধু পেয়েছি। যা করেছো, তোমরাই করেছো। ত্রুটিগুলোর জন্যে আমি-ই দায়ী—এই কথাটি ভুলো না।

বলতে বলতে গলা বন্ধ হয়ে এলো সাধনের। বললো,—

—আর কিছু বলতে পারি না আমি। যা করো, প্রাণ দিয়ে কোর। প্রাণ ঢেলে দিতে কখনো নারাজ হয়ো না। প্রাণ দিয়ে না করলে কিছু হয় না, এ কথাটা আমি জীবন দিয়ে শিখেছি। যতটুকুর মধ্যে মনপ্রাণ ঢেলে দেবে, ততটুকু-ই তোমার নিজস্ব থাকবে।

দুপুর বেলাই চলে যাবে ট্রুপ জিনিষ পত্র নিয়ে। 'শো' শেষ ক'রে ফিরবে। সব কথা শুনলো সাধন। তার কাছে থাকবে প্রসাদ।

ঘরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়াবার আগে সাধন মারুতিকে ডাকলো। বললো,—

—মারুতি, আর কোনো ভয় নেই ত'? —সস্নেহে বললো,—

—কোন কথা ভেবো না। শুধু নিজের ভূমিকাটুকুর সম্পর্কে খেয়াল কোরো।

ঘরে এসে বিছানায় শুয়ে পড়লো সাধন। পাশে বসলো রাধা। সাধন বললো,—

—রাধা, তোমার এখন অনেক কাজ। সব ভালোভাবে চালিয়ে নিও।

—নিশ্চয়।

তখন বারবার রাধাকে ধন্যবাদ দিলো সাধন। রাধা বললো,—

—এত কেন ঘামছো, সাধন ?

—ও কিছু নয় রাধা। তুমি যাও।

—প্রসাদকে রেখে গেলাম সাধন।

—নিশ্চয়। কিছু ভেবো না। চলে যাও!

চলে গেলো রাধা। প্রসাদ এসে পাশে বসলো। সাধন ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে। মুছিয়ে দিলো প্রসাদ। অতি কষ্টে কোরামিন খেল সাধন।

ঘুম আসবার মতো একটা অনুভূতি। তার কাছে আত্মসমর্পণ না ক'রে উপায় নেই সাধনের। সেই অচেতনে ডুবে যেতে যেতে আবার তাকালো সাধন। ডাকলো প্রসাদকে। বললো,—

—আমার কাছে একটু বোস্।

বসলো প্রসাদ হাঁটু ভেঙে। তখন সাধন নিমীলিত চোখে হেসে বললো,—

—ত্থাখ্, প্রসাদ! আমার যদি অনেক টাকা হয়, তাহ'লে তোকে আমি হাজার টাকা দিয়ে যাবো। কখনো ভুলব না। দেখিস! টাকা নিয়ে তুই গাঁয়ে চলে যাস প্রসাদ। তখন তোর ঘরে গিয়ে আমি-ও থাকবো।

তারপরই ঘুমিয়ে পড়লো সাধন।

২২

পায়ের কাছে বসে আছে প্রসাদ। খুব ঘুমোচ্ছে সাধনদা। ঘামছে-ও খুব। ঘামে ভিজে যাচ্ছে জামা। গা-টা মুছিয়ে দিল প্রসাদ কষ্ট ক'রে। তুলতে পারে না, পাশ ফেরাতে পারে না সাধনকে। তবু ফতুয়াটা খুললো টেনেটুনে। এমন কি ঘুম যে, এলিয়ে পড়েছে সাধনদাদা? ঘুমের ওষুধের জন্যে হয়তো! ভাল ক'রে গা মুছিয়ে দিয়ে প্রসাদ ফ্যানটা বাড়িয়ে দিল। কেমন যেন অস্পষ্ট কথা কইল সাধনদাদা, বোঝা গেলো না। প্রসাদ ডাকলো,—

—সাধনদাদা! সাধনদাদা!

আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। সাড়া নেই। অগোছালো ঘরটা দিশা করলো প্রসাদ। আস্তে আস্তে ফিনাইল দিয়ে মুছে নিলো। কুঁজোতে জল ভরলো। জানলার ক্যাকটাস আর অর্কিডগুলোতে জল ছিটিয়ে দিলো! বারান্দাটা পরিষ্কার ক'রে মুছে টবের গাছগুলোতে জল দিলো। তার শখে সাধনদাদা একজোড়া পাখি কিনে দিয়েছিলো। তাদের জল, ছাতু খেতে দিলো। ঘরের কোণে বাঁশের ওপর গালার কাজ করা ফুলদানী, তাতে বালি ঢেলে ধূপকাঠি গুঁজে দিলো ক'টা।

আবার কি যেন বললো সাধনদাদা? প্রসাদ ঝুঁকে পড়ে ডাকলো। অনেক কষ্ট করে তাকালো সাধনদাদা। কিছুক্ষণ যেন প্রসাদকে চিনতে-ই পারলো না। তাকিয়ে রইলো ভ্রূ কুঁচকে। হাসলো প্রসাদ। বললো,—

—সাধনদাদা, কিছু চাই?

কপালের রেখাগুলো সরল হলো সাধনের। বললো,—

—বাতাস, বাতাস দে প্রসাদ।

ফ্যানের বাতাসে কপালের চুলগুলো ঝাপটাচ্ছে। আরো কত বাতাস চায় সাধনদাদা? মাথার কাছের পর্দাটা খুলে দিলো প্রসাদ। আবার ঘুমিয়ে পড়ছে সাধনদাদা। সস্নেহে প্রসাদ জিজ্ঞাসা করলো,—

—সাধনদাদা, কিছু আরাম হচ্ছে?

চমকে তাকালো সাধন। ঈষৎ ভ্রূ কুঁচকে দেখলো। তারপর প্রায় অস্ফুট কণ্ঠে বললো,—

—যা প্রসাদ, ঘুমোতে দে!

হাত সামান্য নেড়ে চলে যেতে ইঙ্গিত করলো সাধন। পা টিপে টিপে সরে এলো প্রসাদ। আলো নিভিয়ে দিলো। দরজাটা ভেজিয়ে দিলো। দরজার বাইরে তার ছোট মাদুরটি পেতে বসলো। সন্ধ্যার মুখে ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস বইছে। চুপ ক'রে বসে রইলো প্রসাদ।

ঠিক ঘুমোয়নি সাধন। ঘুম আর জাগরণের মাঝখানের কোন অনির্দিষ্ট সীমায় বুড়ী ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘুরে মরছে তার চেতনা। একবার স্পষ্ট বুঝছে, এই তার ঘর, এখানে সে শুয়ে আছে, পাশে রয়েছে প্রসাদ। বুঝতে না বুঝতে বুক ভেঙে চেপে ধরছে শ্বাসরোধের যন্ত্রণা। জলে ডুবে তলিয়ে গেলে যেমন শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে—কান, মাথা ঝিমঝিম করে; মনে হয় সব ফেটে গেল; এ-ও ঠিক তেমনই। জল থেকে বাঁচবার যেমন মর্মান্তিক চেষ্টা আসে, তেমনই প্রয়াস করছে সাধন এই যন্ত্রণা থেকে ছাড়া পাবার জন্যে। মনে হচ্ছে বাতাস নেই, আলো নেই, একটা নাম না জানা নিরবয়ব ভীষণ কিছু তাকে একেবারে গ্রাস করে ফেলছে।

আবার সমস্ত বোধ কোথায় চলে যাচ্ছে। অতল, শীতল কোন নীল প্রশান্তির হিম সরোবরে ডুবে যাচ্ছে সাধন। কি যে শান্তি, কি যে আরাম! মনে হচ্ছে নিজেকে যদি ছেড়ে দিতে পারে, তাহ'লে এর বুকে ডুবে গেলে বড় আরাম পাবে সাধন। তবু সে পারছেনা। কেন যেন ফিরে ফিরে আসছে। এই প্রশান্তি চায় সাধন। ঘুমের

বড় প্রয়োজন হয়েছে তার। বড় ক্লান্ত সে। এখন তার ঘুমিয়ে পড়তেই ভালো লাগবে। এখন যেন বিশ্রামের সময়, ঘুমের সময়, ফিরে আসবার সময়। অনেকদিন আগে, যখন তার মা ছিল একজন —মা ছিল না কি সাধনের? তবে এতদিন কেন সে কথা মনে পড়েনি? ভেবে অবাক হলো সাধন। সেই চৌরিঘরে বসে সন্ধ্যেবেলা তার মা সুপুরি কাটতো পিদীম জ্বেলে। আবছা আবছা সেই পিদীমের আলো, ফর্সা পায়ের আলতার বেড়ের ওপর ঘিরে পড়া শাড়ীর পাড়, নারকেল তেল আর মশলার একটা সুবাস, আর ওপেলের দুলের চিকমিকি একটু মনে পড়ে। সেই সময় সাধন শীতলপাটিতে শুয়ে আছে মায়ের পাশে। শুয়ে শুয়ে শুনছে বাড়ীর রাখাল তার ভাইকে ডাকছে—মাণিক রে! মাণিক রে! সেই বালককণ্ঠ একটু উদাস, একটু করুণ। এখন আবার সেই ডাক মনে পড়লো সাধনের। সঙ্গে সঙ্গে কানে বাজল ঘরফিরতি গরুর গলার টুংটাং শব্দ। এই শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তে চায় সাধন।

ঘুম নেই। সেই অতল থেকে চেতনাটাকে ছিঁড়ে এনে সজাগ হয়ে উঠলো সাধন। গোয়ানিজদের গির্জার ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে বাজল সাতটা। সমস্ত চেতনটাকে ডাকল সেই ঢং ঢং আওয়াজ। জাগতে হবে। এখন কি ঘুমোবার সময়? জাগতে-ই হবে। রঙ্গমঞ্চে কেমন তাড়াহুড়ো পড়ে গেছে। পরিষ্কার দেখছে সাধন। সে-ও একজন দর্শক কিনা! ঐ যে কে মোটা গলায় হেঁকে গেলো—শুরু হলো! শুরু হলো! চুপ করো।

এই তো কৃষ্ণলীলা শুরু হলো। তাড়াতাড়ি সজাগ হলো সাধন। বসলো সোজা হয়ে। এত বড়ো প্রেক্ষাগৃহে শুধু সে একা? অনেক মানুষ থাকবার কথা ছিলো না? এই সুবিশাল প্রেক্ষাগৃহ কেমন নীল আর ধূসর আলো আঁধারিতে ভরা। আলোগুলো আবার সচল। যেন জীবন্ত।

পর্দা উঠলো। হাসতে হাসতে এগিয়ে এসেছে ধেয়ান আর

শঙ্কর। কৃষ্ণলীলার ভূমিকা গাইছে ধেয়ান। কি সুন্দর উঁচু গলায় গান ধরেছে ধেয়ান। 'হীর'-এর সুরে গাইছে ধেয়ান—

'সুনো সুনো রে বতাওঁ কৃষ্ণ প্রভুকে অপারলীলা

যৈসে উধার ভয়ে সন্তাপী—'

স্টেজের সামনে এসেছে ধেয়ান। তার মুখের ঘাম চিক্‌চিক্ করছে দেখা যাচ্ছে। এত সামনে এসে-ও ধেয়ান সাধনকে দেখতে পেলোনা। ঈষৎ হেসে নমস্কার করতে করতে পিছু হটে গেলো। কি যেন বলতে চাইলো সাধন। শ্‌শ্‌শ্‌ ক'রে চুপ করতে বললো কারা। আশ্চর্য হয়ে তাকালো সাধন এদিকে ওদিকে। এখানে সে এলো কেমন ক'রে? সে যে শুয়েছিলো ঘরে, ভাবতে চেষ্টা করলো সাধন। টুকরো টুকরো চিন্তাকে জোড়া দিয়ে সম্পূর্ণ করে ধরবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তখন স্টেজে ঢুকেছে নগেন, গোপাল, সতীশ। শাদা ধুতিচাদর পরে, সাদা ফুলের মালা গলায় কৃষ্ণবন্দনা মঙ্গলাচরণ গেয়ে যাচ্ছে গম্ভীর সুরে—স্তোত্রের মতো গম্‌গমে উচ্চারণে—

"জয় বৃন্দাবনরাজ নন্দনন্দন জয়তু দেবকীনন্দনম্

জয় ভক্তহৃদয়লাঞ্ছন মাধব জয় জয় রুক্মিণীপতিম্॥"

স্টেজভরা কাঠপুত্‌লারা নীরব নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। গরুবাছুর, ময়ুর, হরিণ, পাখী। ব্রজের গোপ গোপিনীরা দাঁড়িয়ে আছে চিত্রার্পিত। অযোধ্যাপ্রসাদ ঢোল বাজাতে বাজাতে ঢুকলেন। পিছনে যশোদা এলেন শিশুকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে। অমনই সবাই আনন্দে নাচতে শুরু করলো। গোপগোপিনীদের নৃত্যছন্দে গরবার তাল,—

"—দেখ আকাশের চাঁদ এসে মাটিতে উদয়,

দেখ দেখ রে!

বৃন্দাবনে নন্দপুরী হলো শোভাময়,

দেখ দেখরে!"

উত্তাল আনন্দের কোলাহল। মনের আনন্দে নন্দ মিষ্টান্ন বিতরণ

করছে সকলকে। নন্দ হয়েছে মনোহর। মনোহর ত' কোনদিন-ও ভালো নাচে না। আজ সে কি চমৎকার নাচছে। চারতাল আটতাল চমৎকার ঘুরেঘুরে আসছে হাততালি দিয়ে। মাথায় লালচাদর বাঁধা, হাতে একখানা ছোট লাঠি—সমৃদ্ধ কোন গোপ গৃহস্থ যেন মনোহর।

বৃন্দাবনের বাল্যলীলায় বীণা হয়েছে বালক কৃষ্ণ। সুন্দর মানিয়েছে বীণাকে। কেমন ক'রে তাকে শাসন করছে কুসুম। হলুদরঙা কাপড়, রূপোর গহনা আর মোরগঝুঁটি খোঁপায় যশোমতীর সাজে সুন্দর দেখাচ্ছে কুসুমকে। ব্রজের গোপিনীরা দেখো তালে তালে এলো নালিশ করতে। হাতে দড়ি বাঁধা কৃষ্ণের। এদিকে আর ওদিকে চাইছে কাতর ভাবে। কাঠপুত্‌লার ঢঙের কাটা কাটা তালে লাফিয়ে লাফিয়ে এদিকে ওদিকে যাচ্ছে। ব্রজের মেয়েরা কেমন সুন্দর আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে বলছে—

'তোমার হাতে দিব প্রেমের দড়ি
পায়ে দিব প্রেমের বেড়ি
বুকে দিব প্রেমের পাষাণ
দুষ্টামিটি ঘুচাব।'

নৃত্যপর মানুষগুলো সাধনের চোখের সামনে রঙের ঘূর্ণি ছিটিয়ে যায়। এরই মধ্যে দেখ যমুনা উতরোল। 'গগনে ঘনঘটা দামিনী দমকত ঘোর যমুনা উতরোল রে!'

'ঘোর যমুনা উতরোল রে!
ঘোর যমুনা উতরোল রে!'

মারাঠি ধুনের সুরে এই গান শেষ হতে না হতে স্টেজে এলো রাধা। সোজা হয়ে বসলো সাধন। আহা, নয়ন তার জুড়িয়ে গেলো। এ কি অপরূপ রূপ-মাধুরী! এত রূপ রাধার? রাধাকে যে এতদিন সে দেখেছে, তাকে কি ভালো করে দেখেনি?

কাজলটানা চোখে যেন যমুনার অতল রহস্য, মুখখানি প্রেমে ঢলঢল—মনে হলো পায়ে পায়ে যেন পদ্ম ফুটে উঠবে রাধার। বাঁশী

শঙ্কর। কৃষ্ণলীলার ভূমিকা গাইছে ধেয়ান। কি সুন্দর উঁচু গলায় গান ধরেছে ধেয়ান। 'হীর'-এর সুরে গাইছে ধেয়ান—

'সুনো সুনো রে বতাওঁ কৃষ্ণ প্রভুকে অপারলীলা

যৈসে উধার ভয়ে সন্তাপী—'

স্টেজের সামনে এসেছে ধেয়ান। তার মুখের ঘাম চিক্‌চিক্ করছে দেখা যাচ্ছে। এত সামনে এসে-ও ধেয়ান সাধনকে দেখতে পেলোনা। ঈষৎ হেসে নমস্কার করতে করতে পিছু হটে গেলো। কি যেন বলতে চাইলো সাধন। শ্‌শ্‌শ্‌ ক'রে চুপ করতে বললো কারা। আশ্চর্য হয়ে তাকালো সাধন এদিকে ওদিকে। এখানে সে এলো কেমন ক'রে? সে যে শুয়েছিলো ঘরে, ভাবতে চেষ্টা করলো সাধন। টুকরো টুকরো চিন্তাকে জোড়া দিয়ে সম্পূর্ণ করে ধরবার চেষ্টা করলো। কিন্তু তখন স্টেজে ঢুকেছে নগেন, গোপাল, সতীশ। শাদা ধুতিচাদর পরে, সাদা ফুলের মালা গলায় কৃষ্ণবন্দনা মঙ্গলাচরণ গেয়ে যাচ্ছে গম্ভীর সুরে—স্তোত্রের মতো গম্‌গমে উচ্চারণে—

"জয় বৃন্দাবনরাজ নন্দনন্দন জয়তু দেবকীনন্দনম্

জয় ভক্তহৃদয়লাঞ্ছন মাধব জয় জয় রুক্মিণীপতিম্॥"

স্টেজভরা কাঠপুত্‌লারা নীরব নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। গরুবাছুর, ময়ুর, হরিণ, পাখী। ব্রজের গোপ গোপিনীরা দাঁড়িয়ে আছে চিত্রার্পিত। অযোধ্যাপ্রসাদ ঢোল বাজাতে বাজাতে ঢুকলেন। পিছনে যশোদা এলেন শিশুকৃষ্ণকে কোলে নিয়ে। অমনই সবাই আনন্দে নাচতে শুরু করলো। গোপগোপিনীদের নৃত্যছন্দে গরবার তাল,—

"—দেখ আকাশের চাঁদ এসে মাটিতে উদয়,

দেখ দেখ রে!

বৃন্দাবনে নন্দপুরী হলো শোভাময়,

দেখ দেখরে!"

উত্তাল আনন্দের কোলাহল। মনের আনন্দে নন্দ মিষ্টান্ন বিতরণ

করছে সকলকে। নন্দ হয়েছে মনোহর। মনোহর ত' কোনদিন-ও ভালো নাচে না। আজ সে কি চমৎকার নাচছে। চারতাল আটতাল চমৎকার ঘুরেঘুরে আসছে হাততালি দিয়ে। মাথায় লালচাদর বাঁধা, হাতে একখানা ছোট লাঠি—সমৃদ্ধ কোন গোপ গৃহস্থ যেন মনোহর।

বৃন্দাবনের বাল্যলীলায় বীণা হয়েছে বালক কৃষ্ণ। সুন্দর মানিয়েছে বীণাকে। কেমন ক'রে তাকে শাসন করছে কুসুম। হলুদরঙা কাপড়, রূপোর গহনা আর মোরগঝুঁটি খোঁপায় যশোমতীর সাজে সুন্দর দেখাচ্ছে কুসুমকে। ব্রজের গোপিনীরা দেখো তালে তালে এলো নালিশ করতে। হাতে দড়ি বাঁধা কৃষ্ণের। এদিকে আর ওদিকে চাইছে কাতর ভাবে। কাঠপুত্‌লার ঢঙের কাটা কাটা তালে লাফিয়ে লাফিয়ে এদিকে ওদিকে যাচ্ছে। ব্রজের মেয়েরা কেমন সুন্দর আঙুল নাচিয়ে নাচিয়ে বলছে—

'তোমার হাতে দিব প্রেমের দড়ি
পায়ে দিব প্রেমের বেড়ি
বুকে দিব প্রেমের পাষাণ
দুষ্টামিটি ঘুচাব।'

নৃত্যপর মানুষগুলো সাধনের চোখের সামনে রঙের ঘূর্ণি ছিটিয়ে যায়। এরই মধ্যে দেখ যমুনা উতরোল। 'গগনে ঘনঘটা দামিনী দমকত ঘোর যমুনা উতরোল রে!'

'ঘোর যমুনা উতরোল রে!
ঘোর যমুনা উতরোল রে!'

মারাঠি ধুনের সুরে এই গান শেষ হতে না হতে স্টেজে এলো রাধা। সোজা হয়ে বসলো সাধন। আহা, নয়ন তার জুড়িয়ে গেলো। এ কি অপরূপ রূপ-মাধুরী! এত রূপ রাধার? রাধাকে যে এতদিন সে দেখেছে, তাকে কি ভালো করে দেখেনি?

কাজলটানা চোখে যেন যমুনার অতল রহস্য, মুখখানি প্রেমে ঢলঢল—মনে হলো পায়ে পায়ে যেন পদ্ম ফুটে উঠবে রাধার। বাঁশী

শুনে এ কি চমকিত তনু, চকিত নয়ন, আকুল শ্রবণ? সখীরা কতো মিনতি করছে দেখ। কিন্তু রাধার কোন সাড়া নেই। ওড়নী মাথা ছেড়ে পায়ে লুটোল। গাগরী রইল পড়ে। 'কৌন বজায়ে বাঁশুরী?' কি অপরূপ সুর। স্টেজের পিছন দিক থেকে ঈষৎগর্বে হাসলো আয়ার। এই গানে পাঞ্জাবের 'শোহনী' গীতি লাগালে যে সুন্দর হবে, সে কথা সে-ই বলেছিলো।

কে বাজালে বাঁশী? এখন দেখ বাঁশী শুনে রাধা কেমন বেপথু হলো।

"পরাণ চলিতে চায়
চরণ না চলে হায়
বিষম বাঁশীর সুর
কেন বা শুনিনু!
কানু, না বাজায়ো বেণু।"

ঘননীল বসন রাধার, আকাশনীল ওড়নী। ধীরে ধীরে অতি কোমল, অতি মধুর ভঙ্গীতে নত হলো রাধা। সামনে দাঁড়িয়ে কৃষ্ণ। সতেজ, সুন্দর, নয়নাভিরাম নওলকিশোর। মুখে ঈষৎ হাসি। হাতে বাঁশী। কৃষ্ণকে ঘিরে ঘিরে কেমন মিনতি করে নাচছে রাধা। মণিপুরী নাচের কোমল ব্যঞ্জনায়, হাতের ভঙ্গীতে মনের কথা বলছে। বলছে—আকাশে ঘনঘটা, ঘরে আমার অনেক বাধা। আমি আমার নয় কৃষ্ণ। সংসারে শাসনে বাঁধা। এমন ক'রে বাঁশী তুমি বাজিয়ো না।

জারির ঢঙে নাচতে নাচতে এলো গোপ যুবকের দল, গরুর পাল নিয়ে। দেখে রাধা লজ্জায় মুখ ঢাকলো। পালাবার পথ নেই। ব্রজের ছেলেরা দেখো কেমন কৌতুক করছে।

লাল, নীল, সোনালী, সবুজ—এ কি আলোর ফোয়ারা? অনেক রঙে যেন কোলাহল পড়ে গেলো। এই প্রাণবন্ত নাচ কোথায় দেখেছিলো সাধন? সহসা মনে পড়লো তার। সেই অনেকদিন

আগে এক চাঁদিনী রাত। বাঙ্গারা ছেলেমেয়েদের সেই নাচ—কদম কি ছৈঁয়া!

দুইদলে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রুমাল উড়িয়ে স্বল্প হেসে হেসে সেই ফাগুনের বাতাসের মতো পাগল করা নাচের তাল যেন আবার দেখলো সাধন। রুক্মিণীর কালো চোখের সহাস্য কৌতুক আবার যেন ঝিলিক দিলো। সেই বলিষ্ঠ পেশল পায়ের আঘাতে পাথুরে মাটিতে শব্দ হচ্ছে। চাঁদের আলো চিকচিক করছে সীতমের স্বল্প জলে।

সেই তালে তালে হোলি নাচছে শঙ্কর, মনোহর, ধেয়ান, রাজন, সুশীলা, বীণা, শান্তা, কৃষ্ণা, প্যাটেল। টুকটুকে লাল দেহাতী কাপড়, চুনরী ওড়নীতে রাধা যেন যুগযুগান্তের মানসী। আবীর উড়িয়ে কেমন করে মারুতি রাঙিয়ে দিলো রাধার ওড়নী। স্টেজে আবীর গুলাল উড়ছে। লালে লাল হয়ে গেল সব। এখন কেমন ছলনা করে তিরস্কার করলো রাধা। ওড়নীতে মুখ ঢাকল। মারুতি ঠিক তেমনিই নাচছে, যেমনটি আজ সাধন থাকলে নাচতো। সাধনের আর কোন ক্ষোভ রইলো না—বাঃ মারুতি, চমৎকার! ঠিক এমনি করে নাচবার কথা-ই আমার চরণ ভেবেছে। এমনি করে সপ্রেম চাহনি দিয়েই বরণ করতে চেয়েছে রাধাকে। সে কথা ভাবা যায়। কল্পনা করা যায়। সে কথা ত' কারুকে বলা যায় না মারুতি। কেমন করে তুমি বুঝলে? জানলে আমার মনের কথা? এই-ই আমার স্বপ্ন ছিল। নিজেকে খুঁজে পাও তোমরা। আমি যতটুকু পারি সাহায্য করি। তারপর আমার কাজ ফুরিয়ে গেলো। তুমি ত' সেই কথাটি ধরেছ মারুতি। তাই তোমাকে দেখে আমারই বিভ্রম হচ্ছে। ভরা ফাল্গুনের যৌবনোৎসবের আনন্দে বিভোর মারুতি কেমন রাধাকে ঘিরে ঘিরে নাচছে। বাতাসে যেমন পুষ্পিত গাছ দোলে, তেমনই আনন্দ কল্লোলে হিল্লোলিত হয় রাধার সুন্দর দেহটি।

দেখে আমি ধন্য হলাম রাধা। তুমি যাঁর নাম ধরেছ, তাঁর

মনের কথাটি কেমন করে ধরলে ? এই কল্পনা ত' আমি ছুঁতে-ও পারতাম না। স্বল্প বাতাসে হিল্লোলিত পুষ্পিত শাখার মতো দাঁড়িয়ে। দাঁড়িয়ে-ই ছন্দ সঞ্চার করা—এ তো আমি পারতাম না। তোমাকে দেখে আমি ধন্য।

'নব রঙ্গে শ্যামসঙ্গ মাতি
খেলত পিচকারী
গোকুল পিয়ারী—'

এখন আর মঞ্চে কেউ নেই। গোকুল থেকে কৃষ্ণ চলে গিয়েছেন। শূন্য বৃন্দাবন। নন্দপুরচন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার হয়েছে। ফুল দেখে ভ্রমর আসে না, কোকিল কূজন করে না, যমুনার ছলছল কলকল নীরব। কানু মধুপুরে গিয়েছেন। শ্রীরাধিকা এখন যেন ধূলায় লুণ্ঠিত মালতীমালা। বিরহের অধ্যায়ে রাধাকে দেখে দেখে গৌরবে সাধনের ভাঙা বুকখানা ভরে উঠছে। ভরা বাদর মাহ ভাদরে শূন্য মন্দিরে বিরহিণী রাধা। কে বলবে এটা মঞ্চ, আর অভিনয় করছে রাধা ? কি যে বিরহ-বিধুর উদাস মূর্তি রাধার। পদাবলীর সুরে সুরে, মণিপুরী নাচের করুণ কোমল বিস্তারে কেমন সুন্দর মনের কথাটি বলা। হে সখি, জনম জনম ধরে যদি শ্যামরূপ দেখি তাতে-ও ত' আমার নয়ন তৃপ্ত হবে না। লাখলাখ যুগ হৃদয়ে রাখলে-ও হিয়া জুড়োবে না। কালো রং দেখলে আমি সযত্নে পরিহার করি। কানড় কুসুম হাতে করি না। তমাল, মেঘ বা কালিন্দীর দিকে তাকাই না। তবু আমার জ্বালার নিরসন কোথায় ? মঞ্চের সামনে চলে এসেছে রাধা। বিরহ-বেদনাতুর দুই চোখ তুলে দেখছে সামনে। রাধাকে বলতে চেষ্টা করলো সাধন—পারলো না।

ঘন ঘন করতালির ঝড় ওঠে প্রেক্ষাগৃহ থেকে। সাধনের চোখে আনন্দাশ্রু। এখনো ত' দেখনি তোমরা। রাসনৃত্য দেখনি।

এই দেখ কি অপরূপ রাস উৎসবের অঙ্গন। এমন সুন্দর খোলা আঙিনা-ই ত' চেয়েছে সাধন। মাটির আঙিনায় আলপনা।

আলপনা ঘিরে সারি সারি প্রদীপ। রাসছত্রের চারিপাশে ফুলের মালা। সাদা পোশাক, সাদা ফুলের মালায় রাধা যেন মূর্তিমতী পূর্ণিমারজনী। রাসছত্রের সামনে দাঁড়িয়ে তারা হাত ধরাধরি ক'রে। রাধাকৃষ্ণকে ঘিরে সকলের আনন্দ—

—নবরে! নবরে! নব নব নব রে!

সবই যে নবীন আর সুন্দর। যা নবীন, তাকেই ত' বন্দনা করতে হবে। তাই নাচের শেষে হাত জোড় করে প্রণাম নিবেদন করছে শিল্পীরা এই প্রেমিক যুগলের পায়ে।

"কালিন্দী পুলিন বনে কুঞ্জবন সাজে
ভাগ্যবতী শ্রীযমুনা॥
পুলিন বন ঝলমল করে
কি বা ঝলমল ঝলমল ঝলমল করে
ভাগ্যবতী শ্রীযমুনা॥
কি বা নব রে! নবরে! নব নব নব রে!
নব রে নবরে! নব বৃন্দাবন॥"

নব বৃন্দাবনের চিরনবীন রূপ। নবীনের এই নন্দন গীতি পর্দায় পর্দায় বাড়তে লাগলো। মণিপুরী নাচের পোশাকে মেয়েরা দ্রুতলয়ে নাচছে। কাঁচ বসানো ঘাঘরা ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। মসলিনের ওড়নার আড়ালে চোখের ঝিলিক সরে সরে যায়। ফুলের মালাগুলো দুলে গিয়ে শূন্যে বিভ্রম রচনা করে।

পর্দায় পর্দায় বাড়ছে গানের লয়। কি বা নব রে নব রে—কথাগুলো আগুনের ফুলকির মতোই ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। গান যারা গাইছে, তারা কোনো একটা অপূর্ব আনন্দ, নতুন আবেগ অনুভব করছে। গানটা আর গান নেই। ধীরে ধীরে গানটা হয়ে উঠছে কলরোল। যেন সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো নিজের আনন্দে দুলছে গানটা। কথাগুলোকে ফেনার মতো দুলতে দুলতে এসে ছিটিয়ে দিচ্ছে।

নাচ-ও আর নাচ নেই। একটা আশ্চর্য গতি, অদ্ভুত দ্রুত তার লয়। মাটিতে যেন পাগুলো আর পড়ছে না। ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে মাত্র। ঘাঘরাগুলোর প্রান্ত সামান্য চোখে পড়ে কি না পড়ে। যখন সবাই নিচু হয় প্রণামের ভঙ্গীতে তখন চোখে পড়ে রাধা। খোল বোল করতাল মৃদঙ্গের বাজনায় বিভোর হয়ে রাধা কি যে সুন্দর নাচছে। ঈষৎ সুখের হাসিতে নয়ন নিমীলিত-প্রায়। ঘামের বিন্দু মুক্তাফলের মতো ফুটে উঠেছে কপালে।

নাচের এই মহাতরঙ্গের আহ্বান সাধনের রক্তে এসে লাগে। ঐ দেখ গোপ-গোপিনীরা এলো—কাঠপুত্‌লারা এলো সারি সারি। তারা-ও নাচছে এই গানের সঙ্গে।—নব রে! নবরে! এই গানটি কেমন চট্‌ ক'রে ধরে নিয়েছে। নাচের তালটা-ও পায়ে এসে গিয়েছে। এ কি হচ্ছে?

খোলের কোন্‌ বোল শুনতে পায় সাধন? এ বোল যে তার বড়ই চেনা। কার কণ্ঠে এই রাসকীর্তন এমন মরম নিঙড়ে নিঙড়ে উঠছে? ষড়জে সম রেখে তানটি ছেড়ে দিয়ে কোন্‌ কুশলী আবার পরম কৌশলে সুরটি ধরে নিচ্ছে কণ্ঠে?

সহসা যেন সাধনের মুখে চোখে নদীর বুক ধোয়া ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপ্‌টা লাগে। ধানক্ষেতের ওপর রাঙা রোদের আঁচলখানি লুটিয়ে পড়ছে—সন্ধ্যা আসছে নেমে। ঘর ফেরবার মুখে রাখাল ছেলেটা উঁচু গলায় ডাকছে— মাণিক রে! মাণিক রে! শেষ সুরটা ছড়িয়ে যেতে যেতে রিণ্‌রিণ্‌ করে কাঁপছে। এ যে সাধনের দেশের ডাক। যে মাটিতে সে জন্মেছিলো, যাকে ভুলে এই সাঁইত্রিশটা বছর কেটে গেলো, সেই দেশের মাটির জন্যে মনটা তার হা হা ক'রে উঠলো। সে ত' ভোলেনি। সেই ধূলোয় বিষ্টি পড়লে সোঁদা সোঁদা গন্ধ, যুগীপাড়ার মচ্ছবে, মাটিতে লুটিয়ে বাতাসা প্রসাদ কাড়াকাড়ি ক'রে নেওয়া—সে কিছুই ভোলেনি।

এ গানে সেই মাটির ডাক আছে। কেমন ক'রে হলো? সাধনের

সব বিভ্রান্তি দূর হয়ে যায়। বৃদ্ধ বৈষ্ণব সনাতনদাস, তার প্রথম জীবনের গুরু, নিমাইকীর্তন গেয়ে যিনি তার কিশোর হৃদয় এক নিমেষে জয় করেছিলেন, তিনি এসেছেন তাঁর দল নিয়ে। তাঁর দোহারকি অদ্বৈত, খোলন্দাজ মাধব তুই পাশে তুজনে। সনাতন-দাসের পাকা চুল ফুর ফুর করে উড়ছে। এ রাসকীর্তন তিনি জানলেন কোথা থেকে? এ কি বলছেন তিনি?

—প্রেমের এই মহামিলন অঙ্গনে এসে চিত্ত আমার কৃতকৃতার্থ হলো। গাও হে, মহা আনন্দে গাও—নব রে! নব নব রে! নব নব নবরে! নব রে! নব রে! নব বৃন্দাবন রে! কালিন্দী পুলিন বনে!'

তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সেই ছেলেগুলো-ও এসে পড়েছে। যাত্রাগানে যারা কৃষ্ণ, সুবল, শ্রীদাম সেজেছিলো! তারা এখন আর সাধনকে চিনতে পারছে না। হাত জোড় ক'রে পরম ভক্তিতে তারা গান গাইছে। ওদিকে ঝমর ঝমর তালে সড়কির আর পায়ের ঘুঙুরের গোছা বাজিয়ে এলো জারিগানের দল। বাবুরালির কালো গায়ে নারকেল তেল চক্ চক্ করছে, চেরাসিঁথির তুই পাশে নাচছে চুল-গুলো নাচের তালে তালে। ভরার নৌকোর সেই যে সুন্দর মেয়ে, যার নাম খইমালা, যে তাকে গান শুনিয়ে মুগ্ধ করেছিলো—তার তুটি হাত ধ'রে বলেছিলো,—

—ভরার মেয়ের জীবনে কোন মতো সুখ নাই। আমারে নিয়া চল তোমাদিগের ঘরে। আমি ছড়াগোবর দিমু, জ্বালপাতা কুড়াইয়া সুখের অন্ন খামু।

সে মেয়েকে জোর করে নিয়ে গিয়েছিলো তার মা। এখন সেই মেয়ে-ও এসেছে। গাঢ়নীল জোলার ঘরের শাড়ী পরেছে, গলায় দিয়েছে রূপোর মুড়কী। তেল দিয়ে চুল পাটি পেতে বেঁধে পানের রসে ঠোঁট রাঙিয়েছে। সতেজ সুস্বর কণ্ঠে সে-ও গাইছে—

—নব রে! নব রে! নবনব নব রে!

এতজন এসেছেন তার কৃষ্ণলীলাকে সার্থক করতে? কৃতকৃতার্থ সাধন নিজেই। বড় ভাগ্য তার। অনেক তার পুণ্য। শুধু বলবার ভাষা নেই। কথা কইবার ক্ষমতা নেই। রাস ত' এমনি করেই হবে। এমনি করে অনেক জনের আনন্দে, বহুজনের সহযোগিতায়। যুগল হৃদয়ের মিলনানন্দ সঞ্চারিত হবে সকলের মধ্যে, তবে না সম্পূর্ণ রাস? সকলেই তার রাধাকে ঘিরে ঘিরে নাচছে, দেখে-ও যে পরম সুখী সাধন। এত সুখ, এত আনন্দ সে কোথায় রাখে?

'নব রে! নব রে!' এই দেখ, কোন খেদই আর রইলো না। কণ্ঠমণি মহারাজ স্বয়ং এসেছেন। কণ্ঠে মালা দুলছে, কপালে চন্দন আঁকা। হাতে খঞ্জনী নিয়ে নিজে নাচতে নাচতে এসেছেন। বিনোদিনী, সুনলিনী, শচীকে এনেছেন। নীলমণি-ও কণ্ঠমণির পাশে। হাসছেন কণ্ঠমণি মহা আনন্দে। হাত নেড়ে উৎসাহ দিচ্ছেন রাধাকে।

কে বলে কণ্ঠমণি বৃদ্ধ? এই তো চমৎকার ললিত ভঙ্গীতে নাচছেন তিনি। সুঠাম দেহ যুবাদের লজ্জা দিয়ে কেমন কখনো নুয়ে, কখনো হেলে, গানের মতো সুন্দর হয়ে নাচছে। কি বলছেন কণ্ঠমণি?—

—প্রেম ত' সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে গো! সেটিকে খুঁজে এনে হৃদয়ে উপলব্ধি করাই যে প্রকৃত বৈষ্ণবের কাজ! বুঝ জন, যে জানো সন্ধান! এই কথাটি যে শেষ কথা। নব নব নব সবই! সবই নবীন! যে দেখে সে জানে।

একটি গানের সুরে, একটি নাচের ছন্দে, এতগুলো মানুষ উঠছে, বসছে, ঘুরছে, ফিরছে, দেখে দেখে চোখে বিভ্রম লাগে। ওদিকে পায়ে পায়ে ঝড় তুলে এলো বাঞ্জারা ছেলেমেয়েরা! রুক্মিণী, রূপা, লখিয়া, হসরৎ—তাদের বলিষ্ঠ তামাটে পা থেকে ঘাঘরা উড়ে উড়ে যাচ্ছে—তারা উত্তাল হয়ে নাচছে। তাদের পুরুষদের হাতে বাজু বাঁধা লাঠি। তারাও নাচছে। রোদে পোড়া মুখগুলো ঘামে চক্‌চক্

করছে। ঘন ভুরুর নিচে কালো চোখগুলো জ্বল্‌জ্বল্ করছে। ঝক্‌ঝকে সাদা দাঁতগুলো একটু ঝিলিক দিচ্ছে, হাসিতে যখন ঠোঁট ফাঁক হচ্ছে, তখন। সাধন ত' জানতো রুক্মিণী বড় ভালো মেয়ে। মনটা তার মাঠ ঘাট মাটি পাথরের মতো খাঁটি, ছলনাহীন। এখন দেখো, গানের মাধুরী তাকে-ও স্পর্শ করেছে। বাঁচবার আনন্দে যেমন পাগল হয়ে বেড়ায় জীবজন্তু, তেমনই আদিম একটা আনন্দ সঞ্চারিত হচ্ছে রুক্মিণীর নাচবার ভঙ্গী থেকে। তার ধূলো মাখা বেণী, মেটে লাল রঙের ঘাঘরা দুলছে, ফুলছে, ঝাপটাচ্ছে। হাসছে রুক্মিণী।

খটাখট্ করতে করতে কাঠের পা ফেলে, কাগজ আর রঙীন চটের পোশাক পরা কাঠপুত্‌লারা আসছে। মুখোস-মুখগুলোতে হাসি ফেটে পড়ছে। রঙে আঁকা চোখগুলো কৌতুকে জ্বলজ্বল করছে। কাঠের খাঁচায় কাপড় দিয়ে মোড়ানো হাত তুলে তারা হাসতে হাসতে আসছে। দলে দলে এসে ভরে ফেলেছে স্টেজটা। কি বলছে তারা?

—"নাচ রহো কাঠপুতলোঁ সমান
কাঠপুতলোঁ সমান কাঠপুতলোঁ সমান"।

এই কথা বলছে তারা? সামনে এসে তারা হাসির ঢেউয়ে ভেঙ্গে পড়ে। না, সে কথা তারা বলেনি। তারা বলছে,—

—আমাদের-ও আনন্দ হয়েছে। কি বা
নব রে, নব রে, নব নব নব রে!

তারাও গাইছে। তারা-ও নাচছে।

আলোর ঝলকের মতো কে ছুটে এলো অপূর্ব রঙের আবর্ত সৃষ্টি করে? সুঠাম গৌর দেহে ঘন সবুজ শাড়ী কেমন কাছা দিয়ে পরা দক্ষিণী ঢঙে। টুকটুকে লাল জামা। উঁচু করে বাঁধা খোঁপা ঘিরে ফুলের মালা। বৃন্দাবন গীতিকে বন্দনা ক'রে কে সকলকে প্রণাম করে এলো? কে অপূর্ব ভঙ্গীতে নাচছে—সবই নব রে! নব বৃন্দাবন?

বৃন্দা! বৃন্দা! চীৎকার করে ডাকে সাধন। বৃন্দা শুনতে পায় না। এত জনের একজন হয়ে সে-ও নাচতে এসেছে। এখন কেমন করে সে সাধনের ডাক শুনবে? আনন্দে কৃতজ্ঞতায় উদ্বেল-হৃদয় সাধন। চোখ দিয়ে অজস্র ধারে জল পড়ে ঝরঝর ক'রে। বৃন্দা, তুমি যে এলে, বড় আনন্দ হলো আমার। আমি জানতাম তুমি আসবেই একদিন না একদিন। তোমার মধ্যে আমি যে আর্টিস্টকে দেখেছিলাম বৃন্দা। কতদিন বলো তুমি আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকবে? দেখ বৃন্দা, রাধাকে দেখ। আমি দেখছি—দেখে দেখে চোখ আমার ভরে গেলো বৃন্দা। রাধাকে তুমি-ও দেখেছিলে, আমি ত' দেখছি-ই। কিন্তু তবু কি রাধাকে ভালো ক'রে দেখা ফুরিয়েছে? রাধা যেন আর রাধা নেই বৃন্দা, দেখ কত তার রূপ, কত তার লাবণ্য। কি অমৃতছন্দে নাচছে রাধা, দেখে দেখে আমার ভেতরটা যেন ধুয়ে গেলো। যত খেদ ছিলো, এই অক্ষমতা, পঙ্গুতার জন্যে, যতো গ্লানি ছিলো, যতো পরাজয় ছিলো, আজ এখন, রাধাকে দেখতে দেখতে সব চলে গেলো কোথায়। তুমি চলে গেলে পরে ভেবেছিলাম, কতকগুলো স্নায়ু বুঝি মরে গেলো আমার। আমার সব ধারণাই ভেঙে দিলো রাধা। এখন রাধাকে দেখতে দেখতে আমার ভেতরটা যেন ভরে উঠছে। রাধা নাচছে, আত্মগত হয়ে, সব ভুলে। দেখে দেখে মনে হচ্ছে আমার ভেতরটায় যেন নতুন বাতাস লাগলো, আমি ভরে উঠলাম নব পত্র পুষ্প ফলে। আমি যে জীর্ণ, রুগ্ন, অক্ষম—আবার সে-ই আমি-ই যেন সুন্দর হচ্ছি, নতুন হচ্ছি। রাধা আমাকে এত দিলো। বলো বৃন্দা, রাধার তুলনা কোথায়?

সাধনের একটা কথাও বৃন্দা শোনে না। উত্তাল থেকে আরো উত্তাল হয় গানের ধ্বনি। এ যেন সত্যিই এক মহান্ সঙ্গীত সমুদ্রের কল্লোল শোনা যায়। গম্‌গম্ করে গান উঠছে, সে কি শুধু মানুষের কণ্ঠে? এই যে উত্তাল নৃত্যের তরঙ্গ, সে কি শুধু এই সব মানুষের-ই পায়ে পায়ে? কোথা থেকে আসছে নৃত্য?

ঘরটা আর ঘর নেই। এক বিশাল অঙ্গন এই নাটমঞ্চ। তার সীমা নেই। চোখে পড়ে না তার শুরু কোথায়, শেষ-ই বা কোথায়। প্রাচীর দিয়ে এই ঘরের সীমা বেঁধেছিলো কোন মূর্খ? এখন দেখো, সব প্রাচীর কোথায় চলে গেলো। গুঁড়িয়ে মিথ্যে হয়ে গেলো। দেখো কি প্রশস্ত মাটির অঙ্গন এদের পায়ের তলায়। মাথার ওপরে দেখো, সুনীল আকাশ। দেখো, এদের পায়ে পায়ে উত্থিত হচ্ছে রামধনু। মেঘ কেমন শীতল স্পর্শে জুড়িয়ে দিচ্ছে এদের ক্লান্ত স্বেদসিক্ত ললাট, কপোল, দেহ।

আরো কত মানুষ এসেছে। কত কত জন যে এসেছে, আর ত' চোখে পড়েনা তাদের সীমা সংখ্যা কতো। কত কত কৃষ্ণ, কত কত রাধা! কত দেশের, বেশের, ভাষার! এদের ত' সে চেনে না। এই দেখছে সাধন, সবাই এসে মিলে গেলো রাধার মধ্যে। আর কেউ নেই। রাধা একলা দাঁড়িয়ে। দুটি হাত বাড়িয়ে ডাকলো সাধনকে। বললো,—

—সমুদ্র যেমন নদীকে নেয়, তেমনি সকলকে আমি আমার মধ্যে নিলাম, তুমি এসো!

সে আহ্বান-মন্ত্র মন্ত্রিত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে না পড়তে আবার পুঞ্জে পুঞ্জে গান শোনা গেলো। বর্ষার মেঘ যেমন পর্বতসানু বেয়ে উঠে আসে, তেমনই পুঞ্জে পুঞ্জে উঠে এলো গানের ঢেউ। এক আবার বহু হলো। আবার সেই শত শত লক্ষ লক্ষ মানুষ। তাদের পায়ের তালে তালে উদ্দাম নৃত্য। এ নৃত্য জন্ম নিয়েছিলো নটরাজের প্রলয় তাণ্ডবের পদাঘাতে। এ নৃত্য কোনো অমরালোকে বাস করে না। মানুষের জীবনের অণুপরমাণুতে ছড়িয়ে আছে এই নৃত্য।

হাসতে হাসতে এগিয়ে এলেন কণ্ঠমণি। বললেন,—

—কি বলেছিলাম আমি সাধন? ন তুয়া আদি অবসানা—সাগর-লহরী সমানা—ন তুয়া আদি অবসানা? আমি বলিনি তোমায়, এর আদি নেই, অন্ত নেই—এ এক মহা আনন্দের প্রবাহ?

তুমি এসো সাধন। এসো, উঠে এসো—কেন এখনো বসে আছ? কি কথা হয়েছিল তোমার সঙ্গে আমার? বলিনি আমি—

"কত চতুরানন মরিমরি জাওত
ন তুয়া আদি অবসানা
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগর লহরী সমানা॥"

এই লক্ষ লক্ষ মানুষ ডাকে সাধনকে—এসো! এসো! এসো!

যন্ত্রণায় মরে যায় সাধন।

—তোমরা ডেক না আমায়। আমি পারি না। আমি অক্ষম অশক্ত!

কণ্ঠমণি, সনাতন দাস, সবাই হাসেন। বলেন—

—এ বড়ো উপহাসের কথা সাধন! এ কথা কি কেউ বলে? ছি ছি সাধন। অক্ষমতার কথা কি কেউ বলে? এ কি পরাজয় তোমার সাধন?

সেই অগণিত কণ্ঠ এখন উত্তাল হয়ে উঠলো—

ন তুয়া আদি অবসানা
সাগর লহরী সমানা!

—তুমি এসো সাধন, আর দেরী কোরোনা। রাধা ডাকে, বৃন্দা ডাকে, লক্ষ লক্ষ হাত অগণিত ঢেউয়ের মতো ডাকে সাধনকে—এসো, এসো, এসো!

অস্থির সাধন—কি বলছ কি তোমরা? আমাকে এমন ক'রে যন্ত্রণা দিয়োনা। আমি কত অক্ষম, তা যদি জানতে!

তার অক্ষমতার জন্যে বসে থাকবে কেউ? এবার খোলবোল করতাল মৃদঙ্গ ঝম্‌ঝমা তুলে নাচতে লাগলো সবাই—

'ন তুয়া আদি অবসানা
সাগর লহরী সমানা॥'

আদি নেই, অন্ত নেই, এই অনাদি অনন্ত নৃত্যোৎসবের সামনে দাঁড়িয়ে কেমন ক'রে চুপ ক'রে থাকে সাধন? সে অশক্ত? সে

অক্ষমতার কথা কে মনে রাখবে ? এই যে সবাই এমনি ক'রে আত্মহারা হয়ে বিভোর হয়ে নাচছে তালে তালে, সাধন কি দেখতে পাচ্ছেনা সেই নৃত্যের তাল সঞ্চারিত এই বিশাল বিশ্বের সর্বত্র ? সূর্যকে ঘিরে আবর্তন করছে গ্রহনক্ষত্র, সে-ও কি এই নৃত্যের ছন্দে নয় ? আবার শত শত সৌরজগৎ যেখানে ধূলিকণার মতো তুচ্ছ, সেই নীহারিকা-লোকেও কি এই রকমই ছন্দ নেই তাল নেই ?

এ যে এক বিশাল মুক্তির আহ্বান—এ যে এক অমোঘ আকর্ষণ ! সহসা বাতাস কমে এলো। ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো সাধনের তুনিয়া। নিশ্বাসে বাতাস নেই। পাষাণের গুরুভার বুকে। অসহ্য যন্ত্রণায় আর্তনাদ করতে চাইলো সাধন, মুখে তার ভাষা নেই।

এমন করে দরজার কাছে এসে ফিরে যাবে সাধন ? প্রাণপণ চেষ্টায় এই যন্ত্রণার বেড়াপাকটা ছিঁড়ে ফেললো সাধন। অদ্ভুত, অনাস্বাদিত একটা মুক্তির বোধ ! সঙ্গে সঙ্গে তাকে টেনে নিলো সেই উত্তাল নৃত্যপর মানুষের জীবন্ত সমুদ্র। তাদের সঙ্গে এক হয়ে গেলো সাধন। এই চরম আত্মসমর্পণের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রামের শিথিলতায় এলিয়ে পড়লো দেহ। সেই প্রশান্তির সমুদ্রে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাচ্ছে সাধন। আর ত' কোন বাধা নেই। আর ত' সাধন দেরী করবে না। এবার তোমরাই নাও তাকে—টেনে নাও, বিশ্রাম দাও, শান্তি দাও।

পরিপূর্ণতার বোধটাই ধীরে ধীরে ছড়িয়ে গেলো সাধনের মুখে, চোখে, সর্বত্র।

বাতাসে কপালের চুলগুলি উড়ছে মৃদুমৃদু। দেয়ালে একটা ক্যালেণ্ডারের পাতার খস্‌খস্ শব্দ। আর কোনো শব্দ নেই। অতি ক্ষীণ একটা লাল ধারা বালিশে গড়িয়ে পড়ে ছোট্ট একটা দাগ রচনা করে থেমে গেলো।

দূরে কাঁকরের পথে গাড়ী থামবার শব্দ হলো। গেট খোলবার শব্দ হলো ক্যাঁচ ক'রে।

২৩

অজস্র ফুল, ফুলের তোড়া, ফুলের মালা, ফুলের ঝুড়ি। কৃষ্ণলীলা দর্শকদের মন জয় করেছে, তারই স্মারক চিহ্ন এতো এতো ফুল।

ক্যামেরার ফ্লাস আর হাততালির ঝড় যেন ফুরোতে চায় না। সাধনকে দেখতে চায় সবাই। কোথায় সাধন? কোথায় সেই আশ্চর্য মানুষ? অসম্ভবকে সম্ভব করলো যে?

সাধনের হয়ে জয়মাল্য নিতে কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ভিজে গেলো রাধার চোখ। বারবার বললো,—

—আমি কৃতজ্ঞ, পরম কৃতজ্ঞ, আমার ভাষা নেই। আপনাদের এই স্বীকৃতির আমরা এতটুকু অমর্যাদা করবো না। আমাদের ট্রুপ সর্বদাই আপনাদের আনন্দ বিধান করতে চেষ্টা করবে।

সমস্ত ফুল আর মালা নিয়ে বাড়ী চললো তারা। এ সব সাধনের প্রাপ্য। ছেলেমেয়েরা নাচের পোশাক খুললো না পর্যন্ত। সাধনের কাছে গিয়ে দেখাবে।

বারান্দায় একটি ছোট বাতি জ্বলছে। শান্ত, নীরব পরিবেশ। দরজার কাছে মাদুরটি পেতে নতজানু হয়ে বসে আছে প্রসাদ।

—সাধনদা? কি করছে সাধনদা প্রসাদ?

—নিদ্ রহে হ্যায়। বড়ে শান্তি সে।

দরজাটা খুলে পর্দা সরিয়ে দিলো রাধা। পা টিপে টিপে ঢুকলো ঘরে। দুইহাতে ভরা রাশি রাশি লালগোলাপ। সেগুলি নামিয়ে রাখবে পাশে। ঘুম ভেঙে ভোরে উঠে দেখবে সাধন। আজ নাই বা দেখল। তাতে ত' কোন ক্ষতি নেই। এখন থেকে ভবিষ্যতের সবগুলো দিনই ত' তাদেরই রইল।

সামনে এসে ঝুঁকে সাধনের মুখ দেখলো রাধা। বড় গভীর ঘুম। নিঃশ্বাসের শব্দটুকুও কানে আসে না। এত ঘুমোচ্ছে সাধন যে, মাথাটা বালিশ ছেড়ে ঝুলে নেমে গিয়েছে, সে খেয়াল-ও নেই। ফুলগুলোত হাত ভরা। তাই নিয়ে-ই নিচু হলো রাধা। নিচু হতে গিয়েই কি যেন বুঝলো।

রাধার অস্ফুট আওয়াজ শুনে এগিয়ে এলো শঙ্কর। সেই আলো-আঁধারিতেই কি যে দেখলো সে, আলোটা জ্বাললো চট ক'রে।

তখন ধীরে, অতি ধীরে, নিচু হয়ে পড়লো রাধা। নতজানু হয়ে বসবার আগেই হাত থেকে পড়ে গেল গোলাপগুলো। রাশি রাশি লাল গোলাপ ছড়িয়ে পড়ে ঢেকে দিলো সাধনকে।

'বৃন্দা, তোমার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। তুমি ফিরে আসছো জেনে সুখী হলাম।

নিউট্রুপ অনেক বাধা বিপত্তির ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে।

সাধনের মৃত্যুর সঙ্গে ট্রুপ বন্ধ হয়ে যাবার সত্যিই কোন কারণ নেই, এ কথা যে তুমি বুঝেছো তাতে আমার ভাল লাগলো। এ কথা সকলকে বোঝাতে পারি না।

সাধন তার কাজ করে গিয়েছে। আমাকে নিজের স্বরূপ জানতে শিখিয়েছে। এই পন্থা ছাড়া আমার অন্য পথে যুক্তি নেই। এ পথে সে-ই আমাকে রাহী করে রেখে গেলো। ট্রুপের জন্য যা করবার সে করে গিয়েছে। এখন এ ট্রুপ রাখবার দায়িত্ব একান্ত ক'রেই আমাদের। সচেতন ভাবে বুঝে শুনে আমরা চলবার চেষ্টা করি। আমাদের প্রত্যেকেরই ভুল ত্রুটি স্খলন হয়। অস্বীকার করবো না। সেই সমস্ত নিয়েই চলতে শিখিয়েছে সাধন। রক্ত মাংসের মানুষ নিয়ে কারবার। ভুল ত্রুটি মানুষের-ই হয়। তাতে ত' কোন দোষ নেই।

তুমি জানতে চেয়েছ আমার কথা। সত্যি বলতে কি, শোক আমি করি না। শোক আমার হয়নি। সাধন নেই, সে কথা আমার তেমন করে মনে হয় না। মনে হয় সে আছে। এইসব নাচ, যা তার নিজের কম্পোজিশান, এর মধ্যেই সাধন আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে। সে থাকলে আরো নতুন কি করতে পারতো না পারতো, সে কথা আমার কাছে অবান্তর হয়ে গিয়েছে। যা হলো না তা নিয়ে দুঃখ করি না।

নিউট্রুপের শিল্পীরা আরো নতুন নতুন কম্পোজিশান করেছে। এলে দেখতে পাবে।

আরো একটা কথা। শোক করাটা সাধন বুঝতো না। শোক বা অনুশোচনায় বিশ্বাস করতো না সাধন। তার জন্য শোক করে তার আমি অবমাননা করতে পারি না। বাধে।

সে, তুমি, আমি নৃত্যশিল্পী। একজন চলে গেলো বলে আর একজন অনুশোচনা করবে কেন? আমি বুঝতে পারি না।

তুমি-ও সে কথা ভেবনা বৃন্দা। সাধন জানলে বিস্মিত হতো। যে নেই তার জন্যে শোক করবো? তাহলে নিজে কাজ করবো কখন? যে যার কাজের মাধ্যমেই শ্রদ্ধা জানাবো, এই কি শ্রেষ্ঠ পন্থা নয়? সাধন থাকলে এই কথাই বলতো।

সাধনের একথা আমি-ও মানি।

আমাদের মুক্তি এতেই। এর মধ্যেই আমরা সাধনকে পেয়েছি।

আমাদের সকলের বিশ্বাস সে বেঁচে আছে। সাধন মরেনি। মরতে পারে না।

সাধনরা কখনো মরেনা, বৃন্দা।'

॥ রাধা ॥